নজরুল

বিশ্বনাথ দে

সম্পাদিত

পরিবেশক

অনির্বাণ প্রকাশনী

৩এ গঙ্গাধরবাবু লেন

কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ
১৯৫৭

প্রকাশক
নির্মলকুমার সাহা
১৮ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর
শ্রীঅজিতকুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

কবি-শ্বশ্রূমাতা গিরিবালা দেবীর
স্মৃতির উদ্দেশে

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত

'স্মৃতি, পর্যায়ে আমাদের অন্যান্য বই .

ভূমিকা

খুব ছোটো বয়সে 'ভোর হোলো দোর খোলো' কবিতা পড়ে আমাদের বাঙালি ছেলে-মেয়েদের নজরুলের কবিতার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর 'কাঠবেড়ালি' কি 'দেখবো এবার জগৎটাকে' পড়ার বয়স পেরিয়ে এসে একদিন পরিচিত হয় কবির সেই বিখ্যাত কবিতা 'বলো বীর চির উন্নত মম শির'-এর সঙ্গে। জানতে পারে এই কবি নজরুল কবিতা লিখে, কাগজ বার করে একসময় জেল খেটে এসেছেন, ভোগ করে এসেছেন বিদেশী বৃটিশ সরকারের অকথ্য ঘৃণ্য নির্যাতন। আরো জানতে পারে, অনেক জ্বালাময়ী কবিতা ও গান লেখার জন্য এই কবি নজরুলকে বলা হয় 'বিদ্রোহী কবি'।

কিন্তু একজন পুরো মানুষকে জানার পক্ষে এইটুকুই কি সব?

না, তা নয়।

আর তা নয় বলেই আমাদের কিশোর বয়স্ক ছেলে-মেয়েদের সামনে কবি নজরুল মানুষটিকে যথাযথভাবে তুলে ধরার জন্য এই 'নজরুল-স্মৃতি' সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো।

পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু মানুষ আসেন যাঁরা খুব ছোটোবেলা থেকেই মনের মধ্যে একটি গেরুয়া-পরা মানুষকে লালন করে রাখেন। পরে সময় হলে, সেই মনের আড়ালের গেরুয়া-পরা মনটিই তাঁকে যোগী করে তোলে, দেশের মানুষ যাঁর অমৃত-নির্ঝর বাণী শুনবে, এমনি কণ্ঠস্বর আর ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে।

সে মানুষরা অনেক আলোর সামনে থেকেও অন্ধকারকে ভোলেন না। অফুরন্ত হাসি-আনন্দের মধ্যেও থাকে তাঁদের দুঃখের অনুভূতি। আর অযুত জনারণ্যের মাঝখানেও হারান না মনের গভীর নিঃসঙ্গতা।

নজরুলও এমনিই একটি মানুষ। অনেক আলোর মাঝখানে থেকেও যিনি অনেকের আঁধারের সঙ্গী হয়েছেন, শত আনন্দের মধ্যেও

দুঃখকে কোনোদিন ভোলেননি, আর বহু মানুষের ভিড়ের মধ্যেও যিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, একা, নির্লিপ্ত।

আপাতদৃষ্টিতে যোগী অবশ্য তিনি হননি, কোনো ধর্মপ্রচারকের ভূমিকাও তাঁকে নিতে দেখা যায়নি কোনোদিন। তিনি মন্দিরের নন, মসজিদও তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি কখনো। বরং বলা যায়, মন্দির আর মসজিদের দুটি পৃথক অবয়ব তাঁর চোখে এক হয়ে, একাকার হয়ে দেখা দিয়েছিলো। তাই তাঁর মধ্যে পেয়েছি আমরা নতুন যুগের নতুন যোগী, নতুনতর ধর্মপ্রচারকের আকৃতি। শুনেছি তাঁর ভেদাভেদ দূর করা একতার বেদমন্ত্র, সাম্যের সামগান।

নজরুলের নিকট-সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছেন, তাঁরা কোনোদিনই ভুলবেন না তাঁর জ্যোতির্ময় মূর্তি, ভাস্বর-ভানুত্ব। কবির সেই হিমালয় নির্ঝর গুরু-গুরু কণ্ঠস্বর আজো তাঁদের কানে বাজে। মনে পড়ে ঘরোয়া মানুষ দরদী কবি নজরুলের নিত্যদিনের কতো ঘটনার স্মৃতি-চিত্র।

এমনি অনেক লেখাই 'নজরুল-স্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে কবিকে কাছে থেকে দেখে যাঁরা নিজেদের স্মৃতিকথায় সে ছবি এঁকেছেন, এমন লেখাগুলি দেওয়া হয়েছে 'স্মৃতি-কথা' পর্যায়ে। এ পর্যায়ে যাঁদের লেখা সংকলিত হয়েছে তাঁরা অনেকেই ছিলেন কবি নজরুলের সুখ-দুঃখের সাথী, আবাল্যের সুহৃদ আর যৌবনের সহযাত্রী।

এ ছাড়া আরো তিনটি বিভাগে এই সংকলনের লেখাগুলিকে পৃথক করা হয়েছে। 'জীবন-কথা' পর্যায়ে দেওয়া হয়েছে কবির জীবনী বিষয়ক রচনাগুলি। এ পর্যায়ের লেখাগুলির মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা যাবে কবি-জীবনের নানা বিচিত্র ঘটনাবলীর সহজ সরল ছবি, যা পড়ে কখনো মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, আবার কখনো বা কবির ঘরোয়া-জীবনের গল্পে, খেয়াল-খুশির ঘটনায় পাঠক-মন হেসে উঠবে নির্মল অনাবিল আনন্দে।

কবি নজরুলের সৃজন-বিষয়ক লেখাগুলি দেওয়া হয়েছে 'সৃজন-

কথা' পর্যায়ে। কবি-গান-উপন্যাস-ছোটোগল্প-শিশু সাহিত্য—সর্ব বিষয়ে অবাধ পদসঞ্চারী নজরুলের পরিচিতি বহন করেছে এই পর্যায়ের রচনাগুলি। আর 'কল্প-কথা'য় মাত্র একটি রচনা দেওয়া হয়েছে। কবি আজ স্তব্ধ, নির্বাক। যদি নীরব কবির বোধ ফিরে আসে, আর যদি সেই দিন সেই ক্ষণে এই রচনার রচনাকার তাঁর সামনে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেন, তারই একটি চমৎকার কাল্পনিক ছবি এই রচনাটিতে পাওয়া যাবে। কবির জীবিত কালে তাঁকে হারানোর নির্মম দুঃখের মধ্যেও একটি আশার আলো যেন এ লেখায় জ্বলে উঠেছে। সেই কারণে এই রচনাটি 'নজরুল-স্মৃতি' সংকলন-গ্রন্থে সংযোজন করার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে কষ্টকর হলো।

কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে এই সংকলনের কিছু কিছু লেখা মূল রচনা থেকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে সংক্ষেপিত করে নিতে হয়েছে। লেখাগুলি সাজানোর সময় বিশেষ কোনো নিয়ম মেনে চলা হয়নি, যেভাবে সংগৃহীত হয়েছে সেইভাবেই পর পর ছাপা হলো।

'নজরুল-স্মৃতি' সম্পাদনার কাজে বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন কবি-পুত্রদ্বয় কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ। কবির হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপিগুলিও প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছেন তাঁরাই, এবং এই সংকলনের কিছু কিছু লেখাও তাঁদের সৌজন্যে আমি পেয়েছি। সেজন্য এঁদের কাছে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

আমাদের ছড়াকার-কবি অন্নদাশঙ্কর রায় বলেছেন :

'ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।'

সেই ভাগ-না-হওয়া কবি নজরুল সম্পর্কে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার একশত একজন কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সমাজসংস্কারক-বিপ্লবী নেতার

লেখা নিয়ে 'নজরুল-স্মৃতি' প্রকাশিত হলো। প্রায় দশ বছর আগে প্রখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ও সাহিত্য-প্রেমী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র ভাওয়াল মহাশয়ের প্রচেষ্টায়, তাঁর প্রতিষ্ঠান 'ক্যালকাটা বুক হাউস' থেকে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' নাম দিয়ে এ ধরনের একটি সংকলন-গ্রন্থ কবিগুরুর জন্ম-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়ে সমাদর লাভ করেছিলো। 'নজরুল-স্মৃতি'-ও যদি সেইরূপ সমাদৃত হয়, তবেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দবকার যে, কবি নজরুল সম্পর্কিত এই সংকলনের লেখাগুলি মূলত কিশোর বয়স্ক পাঠক-পাঠিকাদের কথা মনে রেখে গ্রথিত হলেও, কবি নজরুল ইসলামকে জানতে এবং বুঝতে ইচ্ছুক এমন প্রতিটি বাঙালি পাঠক-পাঠিকাই যাতে এই গ্রন্থখানি পাঠ করে তৃপ্ত হন, সে চেষ্টা আমি কবেছি।

পরিশেষে আর একটি কথা, এই দুর্মূল্যেব দিনে এমন একটি বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থের এতো অল্প মূল্য ধার্য করার জন্য 'সাহিত্যম্'-এব কর্ণধাব শ্রীনির্মলকুমাব সাহা মহাশয়কে শুধু আমি নয়, নজরুল-অনুরাগী সমস্ত বাঙালি পাঠক পাঠিকাও যে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।

তিলং — দাদ্রা কাওয়ালী

অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা সম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে!
সঙ্গীতে সঙ্গীতে ॥
তোমার দেবালয়ে
কি সুখে কি জানি
দুলে দুলে ওঠে আমার দেহখানি
আরতি-নৃত্যের ভঙ্গীতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে ॥
পুলকে বিকশিল প্রেমের শতদল
গন্ধে রূপে রসে টলিছে টলমল।
তোমার মুখে চাহি আমার বাণী যত
লুটাইয়া পড়ে ঝরা ফুলের মত।
তোমার পদতল রঙ্গিতে।
সঙ্গীতে সঙ্গীতে ॥

নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বন্ধনের শোষণের শাণিত কুঠার
কে সে যোদ্ধা দ্রোহ-দৃপ্ত চঞ্চল দুর্বার ?
পরিশেষে স্থির হয়ে বসে যোগাসনে
জীবনের গভীরের প্রাণনে মননে
বিদ্রোহেরে করে ভালো প্রগাঢ় প্রণাম
কে সে যোগী ? জানো তার নাম ?
নজরুল ইসলাম ॥

সূচীপত্র

শুভেচ্ছা-অভিভাষণ-চিঠিপত্র ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু। ১

বিপিনচন্দ্র পাল—বীণার ঝঙ্কারে। ৩

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—বাঙালীর কবি নজরুল। ৪

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৪

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৫

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—ধূমকেতুকে শুভেচ্ছা। ৫

সুভাষচন্দ্র বসু—কবি নজরুল। ২

স্মৃতি-কথা ঃ

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—আমাদের ছাত্র নজরুল। ২৩৪

হেমেন্দ্রকুমার রায়—স্মৃতির গ্রামোফোনে···। ১১৫

দিলীপকুমার রায়—কাজী নজরুল ইসলাম। ১৭

নলিনীকান্ত সরকার—দু'টি ছোট গল্প। ৪৫

বিনয়কুমার সরকার—গানের কবি নজরুল। ৭৩

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়—ধূমকেতুর কবি নজরুল। ৬

মুজফ্‌ফর আহমদ—সুরের রাজ্যে নজরুল। ৩০

আবদুল হালিম—নজরুলের ধূমকেতু। ২৪৩

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—মানুষ নজরুল। ৪৭

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—একটি স্মরণীয় দিন। ৩৬

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়—নজরুল। ৩৫

ইন্দুবালা দেবী—সুরের রাজা। ১৪৩

আঙুরবালা দেবী—একটি করুণ কাহিনী। ১৫১

আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ—কাজীদা'-র কথা। ১৪৫

ইব্রাহিম খাঁ—আমার জীবনে নজরুল। ১৭৬

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রথম আলাপে। ৮২

মন্মথ রায়—উদার নজরুল। ৬৯

সুফী জুলফিকার হায়দার—স্মৃতি-রঙ্গ। ১০৮
শচীনদেব বর্মণ—কাজীদা। ১৫৩
মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার—কাজী সাহেব। ১১৭
বুদ্ধদেব বসু—নজরুল ইসলাম। ৮৮
ভবানী মুখোপাধ্যায়—নজরুল-কথা। ৬৩
জসীমউদ্দিন—কবি নজরুল প্রসঙ্গে। ৯৪
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়—একদিনের ঘটনা। ৭৮
আবুলকালাম শামসুদ্দীন—নজরুলের সঙ্গে। ৫৮
জগৎ ঘটক—কবি নজরুল। ১৫৫
বেগম শামসুন্‌নাহার মাহমুদ—নজরুলকে যেমন দেখেছি। ১৬২
বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র—মধুমালার গোড়ার কথা। ১৭৩
আয়নুল হক খাঁ—নজরুলের চরিত্রের তু'একটি দিক। ২৫০
পঞ্চানন ঘোষাল—নজরুল-স্মৃতি। ৩২৮
প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—নজরুলের গান। ১৬০
সারদা গুপ্ত – আমাদের কাজীদা। ২৪০
বরদা গুপ্ত—'কাজীদা'র গান শেখানো। ২৫৩
বেগম সুফিয়া কামাল—আমার জীবনে নজরুল। ১৮৯
অখিল নিয়োগী—কল্পতরু কাজিদা। ১২৮
আবুল মনসুর আহ্‌মদ—নজরুল-সান্নিধ্যে। ২৭৮
সরযূবালা দেবী—কাজীদার স্মৃতিকথা। ২২৬
দেবনারায়ণ গুপ্ত—আজও মনে আছে। ২৮২
বিমল মিত্র—উন্নত শির। ৬৫
যূথিকা রায়—কাজী সাহেবের কথা। ২৩২
দক্ষিণারঞ্জন বসু—ঐক্যের প্রতীক। ২৯০
আজহারউদ্দীন খান—জীবন-সায়াহ্নে কবি নজরুল। ৩০৩
অচ্যুত চট্টোপাধ্যায়—হিমালয়ে নটরাজ। ১৭১
কাজী সব্যসাচী—বাল্যস্মৃতির একপাতা। ২৪২

কল্যাণী কাজী—আমাদের মা। ২৫৫
ডাঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়—কবিকে যেমন দেখেছি। ৩০৬
মজহারুল ইসলাম—কবি নজরুল প্রসঙ্গে। ৩১৫

জীবন-কথা ঃ

পরিমল গোস্বামী—আজ যাঁকে বেশী প্রয়োজন ছিলো। ২৩৫
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়—কাল বৈশাখী। ১২১
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—যোগাসীন নজরুল। ৭৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র—ঝড়। ৮৩
কাজী মোতাহার হোসেন—মানুষের কবি নজরুল। ২২১
প্রবোধকুমার সান্যাল—নজরুল। ৮৫
মৈত্রেয়ী দেবী—গিরিবালা। ১৩৬
মুকুর সর্বাধিকারী—সাংবাদিক নজরুল। ২৮
হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—রাজ-ভিখারী নজরুল। ৩১৩
মঈনুদ্দিন—নজরুলের ছেলেবেলা। ২৬১
গোপাল ভৌমিক—কবি-কথা। ২৪৫
গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—সাধক নজরুল। ১৮৪
প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়—কারাজীবনে কবি নজরুল। ২৬৮
গোলাম কুদ্দুস—নজরুল ইসলাম ও কে. মল্লিক। ১০৩
কল্পতরু সেনগুপ্ত—নজরুল ও মুজফ্ফর আহ্মদ। ২১৮
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়—টুকরো কথা। ২৬০
এম. আবদুর রহমান—'আমি চির দুরন্ত, দুর্দম'। ১৮০
চিত্তরঞ্জন দেব—মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই। ২৯৮
সুভাষচন্দ্র চন্দ্র—বেতারে কবি নজরুল। ১৯৬
ইন্দ্রজিৎ রায়—কিশোর আচার্য নজরুল। ৩১৯
সরল দে—ফুলের ঘ্রাণ ঝড়ের গর্জন। ২০৫
রমেন দাস—নজরুলের খেয়ালখুশি। ২৯৩
বিশ্বনাথ দে—ফুলের জলসায়। ৩০০

স্বজন-কথা :

মোহিতলাল মজুমদার—কাজী সাহেবের কবিতা। ৭৫
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—নজরুল-সাহিত্যে নূতন ভাবধারা। ৬৮
স্বর্ণলতা রাও—'প্রভাতী' কবি নজরুল। ১২৬
কাজী আবদুল ওদুদ—নজরুল ইসলাম। ১২৩
গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়—শাক্তপদাবলির কবি নজরুল। ৭৯
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়—কবি-বিপ্লবী নজরুল। ২৪
সৈয়দ মুজতবা আলী—নজরুলের অনুবাদ-চর্চা। ২৮৭
প্রমথনাথ বিশী—নজরুল কাব্যের মূল্যবিচার। ১৩১
সঞ্জয় ভট্টাচার্য—বাংলার শেষ চারণ-কবি। ১৬৫
ফররুখ আহ্‌মদ—নজরুল সাহিত্যের পটভূমি। ২১৪
নারায়ণ চৌধুরী—নজরুলের গান। ১৪০
মুহম্মদ এনামুল হক—মহাবিদ্রোহী নজরুল। ২৬৫
রমা চৌধুরী—সাধক কবি নজরুল। ২৪৮
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—কাজী নজরুল। ২১৬
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—বিদ্রোহী প্রেমিক। ১৩৪
মুহম্মদ আবদুল হাই—উপন্যাস রচনায় নজরুল। ১৬৮
গুরুদাস ভট্টাচার্য—ভাঙা-গড়ার কবি। ২২৯
সুশীলকুমার গুপ্ত—যৌবনের কবি নজরুল। ৯৯
রামেন্দ্র দেশমুখ্য—নজরুলের কিশোর-মন। ২০২
সলিল চৌধুরী—নজরুলের হাসির গান। ২১১
কাজী অনিরুদ্ধ—নজরুল-গীতি। ১৫৭
আবদুল আজীজ আল-আমান—বিজ্ঞাপন রচয়িতা নজরুল। ২৩৮
মিহির সেন—ছোটো-গল্পে নজরুল। ১৯২

কল্প-কথা :

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—যদি নীরব কবির বোধ ফিরে আসে। ৩০৯

বিশ্বনাথ দে—কবিগৃহে একদিন [একটি জন্মদিনের বিবরণ] ৩৩৫
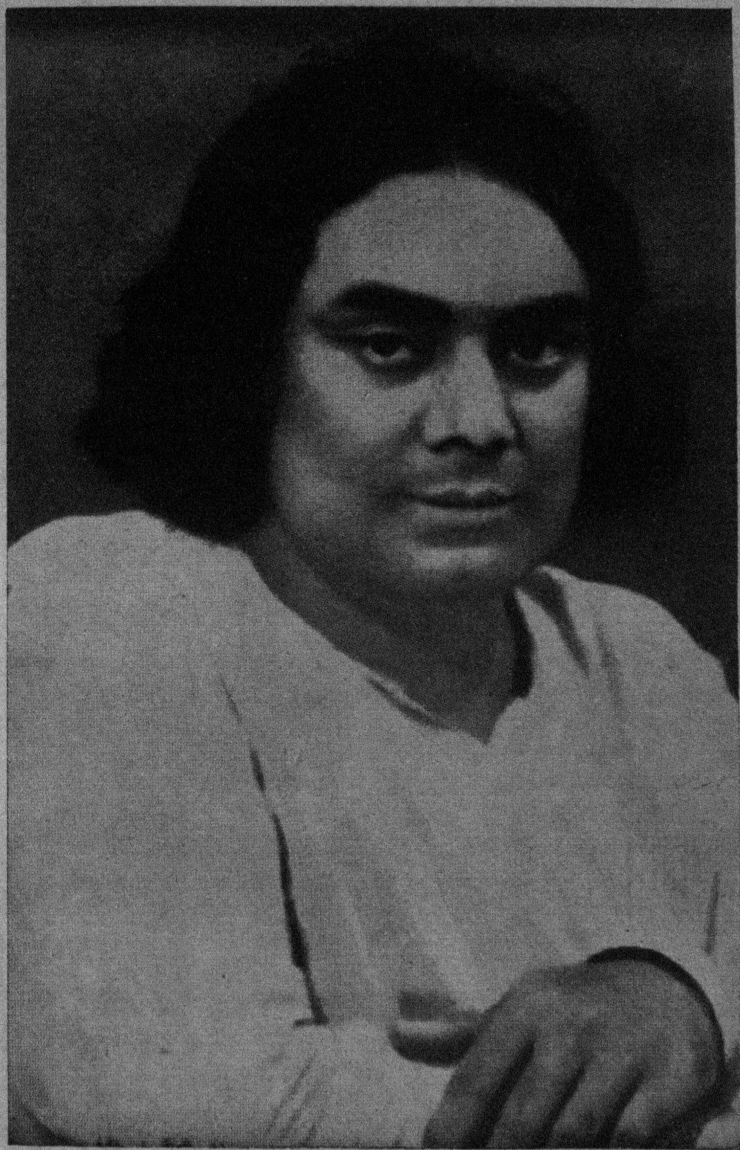
বল বীর—বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
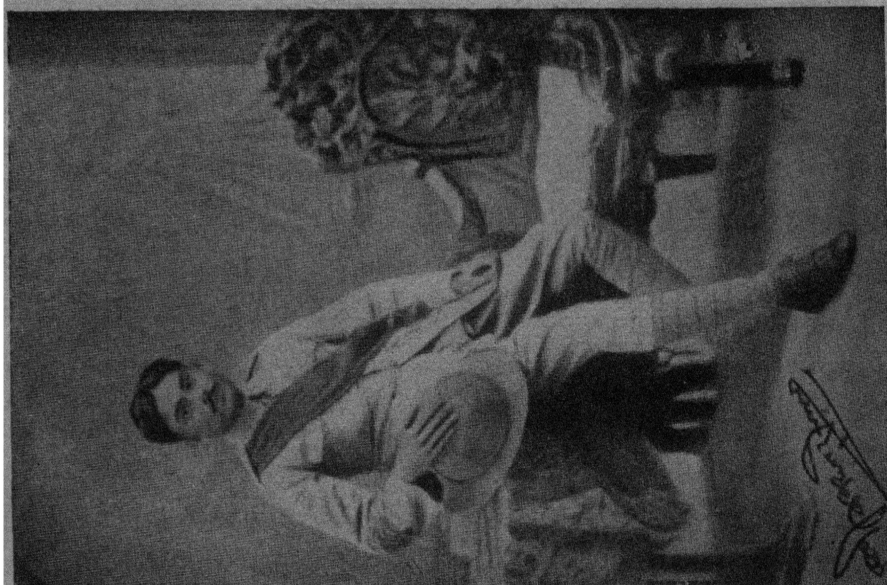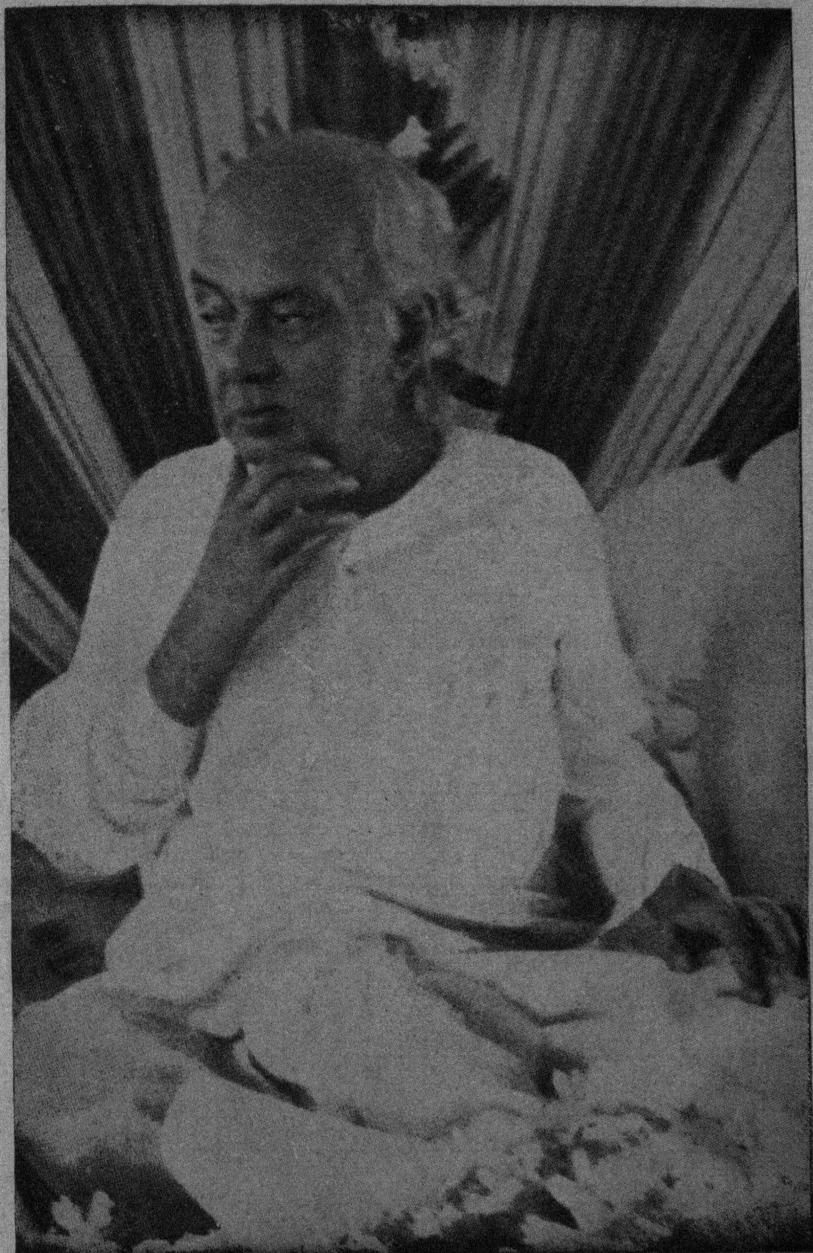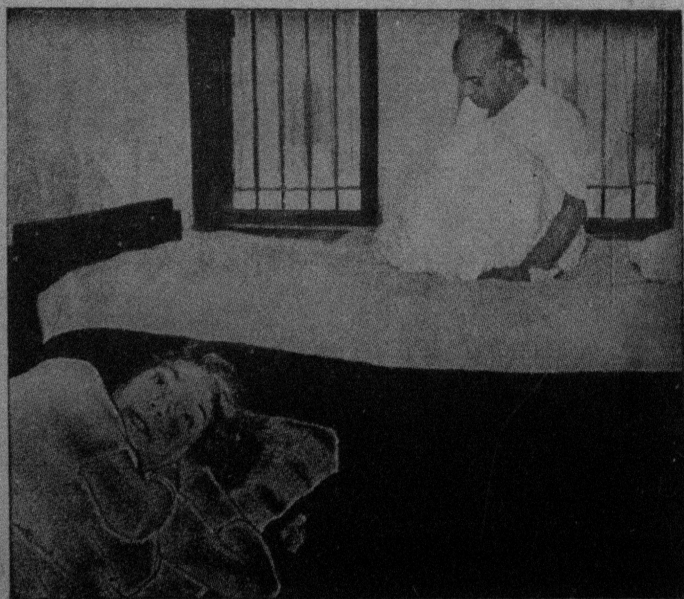
বিষ্ণুপুর।
রাখী-বন্ধন

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি

কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুল ইসলাম

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কল্যাণীয়েষু

আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দ্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে'
আছে যারা অর্দ্ধচেতন!

২৪ শ্রাবণ
১৩২৯

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে।

আমাদের দেশে তা নেই।…নজরুলকে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানাদিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করবো। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধ করেছিলেন, কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন তিনি। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা খুব কম,…অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে, নজরুল একটা জীয়ন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল-জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটি জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মতো বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গাইবার ইচ্ছা হতো। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা স্পষ্টই বুঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাবো —তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাবো, তখনও তাঁর গান গাইবো।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মতো প্রাণমাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে-স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়,—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।

[১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৯]

বীণার ঝঙ্কারে

বিপিনচন্দ্র পাল

...তাঁহার (কাজী নজরুল ইসলামের) কবিতার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিলাম—এ তো কম নয়। এ খাঁটি মাটি হইতে উঠিয়াছে। আগেকার কবি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা দোতলা প্রাসাদে থাকিয়া কবিতা লিখিতেন।

...নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মিয়াছেন জানি না; কিন্তু তাঁহার কবিতায় গ্রামের ছন্দ, মাটির গন্ধ পাই। দেশের যে নূতন ভাব জন্মিয়াছে তাহার সুর পাই। তাহাতে পালিশ নাই; আছে লাঙ্গলের গান, কৃষকের গান।...মানুষে মানুষে একাত্মসাধন এ অতি অল্প লোকেই করিয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম নূতন যুগের কবি।...হাততালি দিয়ে নজরুলকে নষ্ট করিবেন না—তাঁহাকে অগ্রসর হইতে দিন।

সমবয়স্ক যাঁহারা তাঁহারা তাঁকে সহায়তা করুন, কনিষ্ঠ যাঁহারা তাঁহারা নমস্কার করুন।...

দেখিয়া দুঃখ হয়—শরৎবাবু ও নজরুল ইসলাম ছাড়া গত দশ বৎসরের মধ্যে কোন ভাবুক লেখকের উদয় হয় নাই।...

জাতির প্রাণে লাঙ্গল আসিয়াছে নূতন ডিমোক্র্যাট নজরুলের বীণার ঝঙ্কারে তাই পাই।

[১৯২৮]

বাঙালীর কবি নজরুল

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল।

নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন।

আজ আমি এই ভেবে আনন্দ লাভ করছি যে, নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমান কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীস্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালীরূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইসলামকেও জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণত কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা নন। কারাগারে শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।

[১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯]

২৪শে শ্রাবণ

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

তোমার কাগজের দীর্ঘজীবন কামনা করিয়া একটি মাত্র আশীর্বাদ করি, যেন শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নির্ভয়ে সত্য কথা বলিতে পার। তার পরে ভগবান তোমার কাগজের ভার আপনি বহন করিবেন।

তোমাদের

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাই পাগল,

…আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যাঁরা মেকী, তাঁদের গোঁফ ও দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিক; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' দেশের যাঁরা সাচ্চা সোনা তাদের খাদ পুড়িয়ে উজ্জ্বল করে তুলুক; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' বাঙালী মেয়ের মুখে জহরব্রত৷ রাজপুতানীর সতী স্ত্রী দেবী-গর্ব ফিরিয়ে আনুক; আশীর্বাদ করি তোমার 'ধূমকেতু' জতুগৃহ জ্বালিয়ে দিক্, স্থির মণি হয়ে বঙ্গমাতার স্বর্ণ সিংহাসন সাজিয়ে নিক্, ভগ্নধ্যান শিবের চক্ষু বেরিয়ে এসে এ কামুক জাতির কাম-দেবতাকে পুড়িয়ে ফেলুক আর কামিনী উহাকে করুক শান্ত-জ্যোতি তাপসী।

ইতি—

বারীন ঘোষ

কাজী ভায়া,

…রুদ্ররূপ ধরে ধূমকেতুতে চড়ে তুমি দেখা দিয়েছ— ভালই হ.য়ছে। আমি প্রাণ ভরে বলছি—স্বাগত।…

…সৃষ্টি যারা করবার তারা কোরবে; তুমি মহাকালের প্রলয় বিষাণ এবার বাজাও। অতীতকে আজ ডোবাও, ভয়কে আজ ভাঙ্গ, মৃত্যু আজ মরণের ভয়ে কেঁপে উঠুক।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

'বিদ্রোহী' কবিতাটি এক সঙ্গে 'মোসলেম ভারত' ও 'বিজলী'তে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই নজরুলের খ্যাতিতে বাঙালীসমাজ একেবারে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটে উঠল। তরুণসমাজ তো বিদ্রোহীর ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। সকলের মধ্যে সেই মনোভাব—'আপনারে ছাড়া কাহারে করি না কুর্নিস।'

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের আড্ডা আরও সরগরম হয়ে ওঠে। আমরা যারা আগে থেকে ছিলাম, তাদের সঙ্গে আরো এসে জুটল খান মঈনুদ্দীন, গোলাম মোস্তাফা, মঈনুদ্দীন হোসেন, তরুণ রেজাউল করিম। তা ছাড়া কত পরিচিত-অপরিচিত যুবক আসছে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই।

কে যে নজরুলের মাথায় ঢুকিয়ে দিল—পত্রিকা বার করতে হবে। মতলবটা নজরুলের মাথায় চেপে বসতেই তাতে তালিম দিয়ে উঠল আর সবাই।

নজরুল তখন মূর্ত বিদ্রোহ, আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে নতুন চেতনায় মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বাণী তার কণ্ঠে। গতানুগতিক ব্যবস্থায় যারা নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাচ্ছে তাদের অকল্যাণ ঘোষণা করে তাই 'ধূমকেতু'র উদয় হল।

এক পয়সা দামে ফুলস্কেপ চারপাতা সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুবে 'ধূমকেতু'। কিন্তু পয়সা কোথায়? সবারই পকেট ঢু-ঢু, তবু মনে সংশয় নেই; স্থির বিশ্বাস, কাগজ বেরুবেই! প্রস্তুতির প্রথম পর্ব হল কবিগুরুর আশীর্বাণী চেয়ে তার করা।

কয় রিম কাগজ বাকীতে সংগ্রহ করা গেল, মেটকাফ প্রেসের মালিক মণি ঘোষ 'ধূমকেতু' ছাপার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন।

কাগজ একপিঠ ছাপা হয়ে গেছে, এমন সময় এল কবিগুরুর আশীর্বাণী। পয়লা পৃষ্ঠায় তা বসিয়ে দেওয়া হল।

নজরুলের অগ্নিঝরা প্রবন্ধ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ওরফে ত্রিশূলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা ও মনুষ্যধর্মের পাঞ্চজন্য ধ্বনিত করে 'ধূমকেতু' যেদিন প্রথম আত্মপ্রকাশ করল, সেদিন সারা শহর উদ্বেল হয়ে পড়ল। প্রথম পৃষ্ঠায়ই রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী ঃ

'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ্ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন !
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক্ মেরে',
আছে যারা অর্ধচেতন !'

ঘণ্টা দু'যেব মধ্যে দু'হাজার কাগজ উবে গেল। হকারের দল এসে হাজির হল ছাপাখানায়, বত্রিশ নম্বরে—আরো কাগজ চাই। চার পাঁচ হাজার ছেপে দিলেও তারা তখনই তা নিয়ে নিতে রাজী।

দে গরুর গা ধুইয়ে। সাপ্তাহিক পত্রিকার দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় না। সংখ্যার পর সংখ্যা বেরিয়ে যেতে লাগল। আফজলের আড্ডা থেকে কার্যালয় বদলী করা হল সাত নম্বর প্রতাপ চাটুয্যের লেনে। ম্যানেজারির ভার পড়ল তরুণ শ্রীমান শান্তিপদ সিংহের উপর। কবিগুরুর আশীর্বাণীটি প্রতি সংখ্যায় ছাপবার জন্য কবির হাতের লেখা ব্লক করে নেওয়া হল, তার স্থান হল মূল সম্পাদকীয়ের ঠিক উপরে। বিক্রীর সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলে, কাগজ বেরুবার আগেই হকার আগাম দাম দিয়ে যায়। কাগজ বেরুবার ক্ষণটুকু মোড়ে মোড়ে তরুণের দল জটলা করে দাঁড়িয়ে থাকে—হকার কতক্ষণে নিয়ে আসে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল। তারপর হুড়োহুড়ি

কাড়াকাড়িতে কয়েক মিনিটের মধ্যে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এক কপি কাগজ নিয়ে চায়ের দোকানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গরম গরম বক্তৃতা চলে। ছাত্র হোস্টেলে, বোয়াকে, বৈঠকখানায় তার পরদিন পর্যন্ত একমাত্র আলোচ্য বিষয় থাকে—'ধূমকেতু'। জাতির অচলায়তন মনকে অহর্নিশি এমন করে ধাক্কা মেবে চলে 'ধূমকেতু' যে, রাজশক্তি প্রমাদ গণে।

'ধূমকেতু'ব আড্ডায় সারা দিন লোকেব পর লোক আসে, কেউ পরিচিত হতে, কেউ লেখা দিতে, কেউ আদর্শের ঐক্য জ্ঞাপন করতে, কেউ-বা প্রেরণা লাভ কবতে। মাটিব ভাঁড়ে করে চা সবার জন্য তৈরী। একদিন এল সদ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ একটি কিশোর। ফরিদপুর থেকে এসেছে, নাম হুমায়ুন কবীর।

অনেক প্রশ্নের মধ্যে ছেলেটি জিজ্ঞাসা কবল, 'আচ্ছা আপনারা মাটির ভাঁড়ে করে চা খান কেন?'

জবাবে বললাম, 'একটু বসে থাকলে নিজেই এব জবাব পেয়ে যাবে।'

একটু পবেই নলিনীদা [নলিনীকান্ত সবকাব] এসে ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গেই নজরুল আধ-ভবতি চাযেব ভাঁড় শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল—দে গরুব গা ধুইযে! চা ছিটকে পড়ল মেঝেতে 'মাদুবে' বইযে-কাগজে—সবার গায়ে। ভাঁড়টা মাটিতে পড়ে টুকবো টুকরো হযে গেল।

কবীবেব দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এখন বুঝতে পাবছ এখানে ভাঁড়ে চা খাওয়াব বেওয়াজ কেন? গরুব গা ধুইয়ে দিতে প্রথম তিন দিনেই দু'ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। কাপভাঙা মিঠে আওয়াজ শোনবাব জন্য নিত্য কাপ কেনা হবে, এমন কাপ্তেন আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

একদিন এল একটি অপরিচিত তরুণ, বয়স আঠার কি বিশ। মেঝের এক কোণে চুপ করে বসে ছিল। চায়ের ভাঁড় এগিয়ে দেওয়ায়

বললে, 'চা খাই না।' আত্মপরিচয়ে যুবকটি জানালে তার নাম গোপীনাথ সাহা। সে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে চায়, পথের নির্দেশ ও প্রেরণা লাভের জন্যই সে 'ধূমকেতু'র আখড়ায় এসেছে।

পথ-নির্দেশ বা প্রেরণা লাভের আখড়া এটা নয়, প্রাণের প্রাচুর্য ঘোষণা করার এবং অন্যায় অত্যাচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেওয়াই 'ধূমকেতু'র ব্রত। আর তার ব্রত ভাঙনের জয়গান গাওয়া।

প্রাণের প্রাচুর্য প্রকাশ ও ভাঙনের জয়গান সেখানে যে হৈ-হুল্লোড় পরিবেশন সৃষ্টি করে গোপীনাথ তার দিকে বিস্মৃত চোখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে। তারপর এক সময় হঠাৎ প্রশ্ন করে বসে, 'আপনাদের মনে এত আনন্দ জাগে কোথা থেকে?'

একি অদ্ভুত প্রশ্ন! সবাই তাজ্জব ব'নে যায়।

'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে নজরুল জবাব করে, 'আনন্দ কোত্থেকে জাগে তার উত্তর নেই, কিন্তু নিরানন্দ কেন হবে, তাই শুনতে চাই তোমার কাছে।'

মনে আছে, অত্যন্ত দৃঢ় ভঙ্গীতেই গোপীনাথ জবাব করেছিল, 'দেশ পরাধীন, সাহেবদের অত্যাচার-জুলুম দিন দিন বেড়ে উঠছে। সেই জ্বালার মধ্যে আনন্দ জাগে কি করে? প্রত্যেকটি ইংরেজ আমাদের শত্রু। তারা বুক ফুলিয়ে আমাদের চারপাশে বিচরণ করবে, আর আমরা আনন্দে হাসব গাইব!'

'প্রত্যেকটি ইংরেজ নয়', বললে নজরুল, 'সমগ্র ইংরেজ-সমাজ আমাদের শত্রু। তাদের ভাসিয়ে দিতে হলে চাই প্রাণবন্যা; তারই আবাদ করছি আমরা এখানে।'

এ প্রশ্নের কোন জবাব করেনি গোপীনাথ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে উঠে চলে গেছে।

কিছুদিন বাদেই সারা শহরে হকচকিয়ে খবর বেরুল, সকাল বেলা চৌরঙ্গীর মোড়ে বাঙ্গালী যুবকের পিস্তলের ঘায়ে খুন হয়ে

ডে সাহেব। হাতেনাতে ধরা পড়েছে আসামী। দেশ-শত্রু পুলিশ কমিশার স্যার চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে ডে সাহেবকে হত্যা করার ব্যর্থতায় আফসোস প্রকাশ করেছেন গোপীনাথ সাহা।

দিকে দিকে সন্ত্রাসবাদ বিভীষিকার কালো ছায়া বিস্তার করেছে। অসুরনাশিনী খড়গধারিণী নৃমুণ্ডমালিনী সংহারকর্ত্রী মহাকালীকে বোধন করে 'ধূমকেতু' সেই সন্ত্রাসবাদের প্রেরণা যোগাচ্ছে—এই অপরাধে পুলিশ কর্তৃপক্ষ 'ধূমকেতু'কে দমন করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠল।

পূজা সংখ্যার 'ধূমকেতু'তে কবিতা বেরুল ঃ

'আর কতকাল থাকবি বেটী
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল।'

মাস দুই যেতে না যেতেই পুলিশ এসে হানা দিল 'ধূমকেতু' অফিসে, ছাপাখানাকেও রেহাই দিল না। সম্পাদক-মুদ্রাকর-প্রকাশক নজরুল, ফেরার হয়ে গেল। শান্তিপদকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দিল পুলিশ, ধাওয়া করল নজরুলের পিছনে। কুমিল্লা থেকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে এল নজরুলকে।

'ধূমকেতু'র মামলায় পুলিশ কোর্টে যে চাঞ্চল্য জাগল তা অবর্ণনীয়। বহু উকিল স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন বিনা পারিশ্রমিকে নজরুল তথা 'ধূমকেতু'র পক্ষ সমর্থনের জন্য। শ্রীযুক্ত মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকিল। সাক্ষী-সাবুদের শেষে নজরুল এক ধূমকেতুমার্কা লিখিত জবানবন্দী দাখিল করল। তাতে বলল ঃ

'সত্য স্বয়ংপ্রকাশ। তাকে কোন রক্ত আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না···দোষ আমারও নয়, আমার বীণারও নয়। দোষ তাঁর—যিনি আমার কণ্ঠে তাঁর বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মত রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নেই।···আমি সত্য রক্ষার ন্যায় উদ্ধারে বিশ্ব প্রলয়বাহিনীর

লাল সৈনিক বাঙলার শ্যাম শ্মশানের মায়ানিদ্রিত ভূমিতে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিল, তাঁর আদেশ পালন করেছি।

'বিচারক জানে, আমি যা বলেছি, যা লিখেছি তা ভগবানের চোখে অন্যায় নয়। ন্যায়ের এজলাসে মিথ্যা নয়। কিন্তু তবু হয়তো সে শাস্তি দেবে। কেন না, সে সত্যের নয়, সে রাজার। সে ন্যায়ের নয়, সে আইনের। সে স্বাধীন নয়, সে রাজভৃত্য।—'

১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে চিফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহো নজরুলকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

নজরুলের জেল হওয়ার পর দু'সপ্তাহ কাগজ বন্ধ থাকে, তারপর বীরেন সেনগুপ্তের সম্পাদনায় পাক্ষিক হিসাবে দুটো সংখ্যা বেরিয়ে 'ধূমকেতু' বন্ধ হয়ে যায়।

আদালত থেকে যখন ওকে কয়েদী গাড়ীতে তোলা হয় তখন বিমর্ষ বন্ধুবান্ধবদের সান্ত্বনা দিয়ে নজরুল বললে, 'দুঃখ করিসনে ভাই, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হয়তো এই কারাবাসের আমার দরকার ছিল। বিধাতার অমোঘ বিধান খণ্ডাবে কে! এর পিছনে আমি মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্তই দেখতে পাচ্ছি।'

কারাবাসের প্রথম কিছুদিন নজরুলকে আলিপুর সেনট্রাল জেলে রাখা হয়। কবিগুরু তাঁর 'বসন্ত' নাটিকা নজরুলকে উৎসর্গ করলে জেলে ওঁর কাছে বই পৌঁছে দেবার ভার আমার উপর পড়ল। একটা সাধারণ 'কনভিক্ট'কে 'পোয়েট টেগোর' বই 'ডেডিকেট' করেছেন, একথা শুনে তাজ্জব ব'নে গেল জেলর সাহেব, ফিরিঙ্গি অফিসার ও পাহারাদার মহল। সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল: 'ইজ হি রীয়েলী সো গ্রেট এ ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেন্স!'

আলিপুর থেকে নজরুলকে বদলি করা হল হুগলি জেলে। জেল থেকে নজরুলের খবরাখবর সংগ্রহ করে নিয়মিত আমাদের জানাবার

ভার নিল হামিদ আর সিরাজ, তাদের সঙ্গে হুগলির আরো অনেক তরুণ যোগ দিল।

কলকাতায় একদিন খবর পেলাম, জেলের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং উৎপীড়ন নিপীড়নের প্রতিবাদে কাজী অনশন শুরু করেছে। খবর পেয়েই আমি চলে গেলাম হুগলিতে। ইতিপূর্বে জেলে একাধিকবার আমি দেখা করেছি কিন্তু এবার কর্তৃপক্ষ সাক্ষাতে বাধা দিল আশ্বাস দিলাম দেখা করতে পারলে নজরুলের অনশন ভঙ্গ করিয়ে দিতে পারব, কিন্তু সে আশ্বাসও কর্তৃপক্ষ গ্রাহ্য করলে না।

দিনের পর দিন যায়, খবর আসে নজরুল নাছোড়বান্দা, এসপার-ওসপার লড়ে দেখবে সে। জেল কর্তৃপক্ষ নানা শাস্তির ব্যবস্থা করলঃ ডাণ্ডাবেড়ি, হ্যাণ্ডকাপ, নির্জন কুঠুরিতে কয়েদ—কিছুতেই কিছু হল না। তারপর শুরু করল ফরস্‌ড্ ফীডিং। সেটা নাকি আরো যন্ত্রণাদায়ক! দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছে শুধু।

বে-পরোয়া হয়ে নলিনীদাকে সঙ্গে করে আবার গেলাম হুগলিতে। এবারও জেল কর্তৃপক্ষ যথারীতি আমাদের প্রত্যাখ্যান করলে, কোন আশ্বাস কোন প্রতিশ্রুতিই কানে তুলল না। প্রমাদ গণলাম আমরা। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম জেলের ফটক থেকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ধীরে ধীরে পথ হাঁটছি। জেল প্রাচীরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নলিনীদা বললেন, 'এই একটা পাঁচিল যা ফারাক, হয়তো ওপারের উঠানেই কাজী ঘোরাফেরা করছে। একবার চোখের দেখা পেলেও কাজ হত।'

আমি বললাম, এই 'মাছি-পেছলানো বিরাট উঁচু পাঁচিল, এর উপরে উঠে যে নজরুলের দেখা পাওয়ার চেষ্টা করব তাও সম্ভব নয়।'

এক মিনিট চোখ বুজে কি ভাবলেন নলিনীদা, তারপর বললেন, 'পাগলাকে সাঁকো নাড়ার কথা মনে করিয়ে দিয়েছো পবিত্র, পাঁচিলে ওঠার চেষ্টা করলে হয় না কি?'

'বলেন কি নলিনদা!' আমি বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকালাম, 'তারপর আমাদেরও শ্রীঘর বাস করতে হবে।'

'মন্দ কি', নলিনীদা জবাব করলেন, 'আমি আর কাজী যে যার সেল থেকে গলা মিলিয়ে ডুয়েট গাইব, আর তোমার সেল থেকে তুমি দেবে তুড়ি। কাজীর অনশন কোথায় ভেসে যাবে।'

'কিন্তু উঠবেন কি করে? সেটাই তো সমস্যা।'

নলিনীদা প্রস্তাব করলেন, আমি উবু হয়ে বসলে তিনি আমার কাঁধে উঠবেন, তারপর আমি দেয়াল ধরে কোন মতে দাঁড়াতে পারলে তিনি উঠে পড়বেন পাঁচিলে। স্টেশনের দিকের পাঁচিলটা অপেক্ষাকৃত নিচু আমায় বললেন, 'তোমার কাঁধ থেকে যে মুহূর্তে আমি পা তুলে নেবো, তুমি একেবারে চম্পট দেবে। স্টেশনের ভিড়ে মিশে থাকবে।'

যে কথা সে-ই কাজ। কাঁধের বোঝা যে মুমূর্তে হাল্‌কা হয়ে গেল, সোজা চলে এসে স্টেশনের ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। বেশী দূর নয়, কয়েক গজ মাত্র ব্যবধান। পাঁচিলের উপর ঘোড়-সোয়ারের মত দু'পাশে দু'ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে নলিনীদা জেলখানার দিকে তাকিয়ে হাত-মুখ নাড়ছেন। একটু পরেই একজন পাহারা-ওয়ালা সেখানে এসে হাজির হল। নলিনীদার মুখ কাচুমাচু। পাহারাওয়ালাই নলিনীদাকে নামালেন পাঁচিল থেকে। দেখতে দেখতে বলা নেই কওয়া নেই হু-হু করে এক জনতা জমে উঠল সেখানে। পুলিশ নলিনীদার শার্টের কলার ধরে আছে, আর নলিনীদা তাকে সাহুনয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। ভিড়ের সঙ্গে দেখলাম হামিদ, সিরাজ, মনোতোষ, শৈলেশ—আমাদের সকলেই প্রায় হাজির। তারাও বোঝাবার চেষ্টা করছে। আমিও ভিড়ের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। নলিনীদা বোঝান, 'আমরা সরকারের দুশমন নই—দোস্ত। আমাদেরই এক দোস্ত—বহুৎ বড়া আদমী, সে অনশন করছে। সে যাতে খাওয়া-দাওয়া করে, জেলের নিয়ম মেনে চলে —তাই বলতে এসেছিলাম তাকে।'

সব হৈ-হল্লার মাঝে কি ভেবে সিপাই বললে, 'জলদি ভাগো বাবু, নেই ত হামারা নোকরি জায়েগা।'

গা ঝাড়া দিয়ে নলিনীদা বেরিয়ে এলেন। বললাম, 'হল তো!'

'আরে কে জানে ভাই, পাঁচিলের ওপাশে বার হাত লম্বা জল ভরা ডোবা, আর তুমি তো পাঁচিলে তুলে দিয়ে কাঁধ সরিয়ে নিয়ে পালিয়েছো। আমি না-পারি এদিকে আসতে, না-পারি ওদিকে যেতে। তবু শেষ পর্যন্ত ছেলের দল এসে পড়েছিল, তাই রক্ষে, তাদের হৈ-হল্লায় ব্যাটা সেপাইকে ভালমানুষী করতে হল!'

'আসল যে কথা, কাজীকে পেলেন?'

'পেলাম, কিন্তু কাজ হল না। আমি যত মুখ-হাত দিয়ে খাবার ইসারা করি, ও তত হাত-মুখ নেড়ে অস্বীকার জানায়। খুবই দুর্বল হয়ে গেছে এ ক'দিনে। কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছি না।'

আমি বললাম, 'চলুন কলকাতায়, সেখানে গিয়ে শলাপরামর্শ করা যাবে।'

স্থির হল, শিলং-এ কবির কাছে চিঠি লেখা হবে, তিনি কাজীকে অনশন ভাঙতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু কবি যা লিখলেন, তাতে আমরা নিজেদের আরো অসহায় বোধ করলাম। তিনি লিখলেন, 'আদর্শবাদীকে আদর্শ ত্যাগ করতে বলা তাকে হত্যা করারই সামিল। অনশনে যদি কাজীর মৃত্যুও ঘটে তাহলেও তার অন্তরের সত্য ও আদর্শ চিরদিন মহিমময় হয়ে থাকবে।'

অনেক দিন পরে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় জেনেছিলাম যে, আমাদের ওই চিঠি লেখার পরই তিনি সেনট্রাল জেলে কাজীকে তার করেছিলেন—'গিভ্ আপ হাঙ্গার স্ট্রাইক আওয়ার লিটারেচার ক্লেম্‌স্ ইউ।' তার ফিরে গিয়েছিল কবির কাছে—'য়্যাড্রেসী নট ফাউণ্ড' বলে।

কিন্তু কবির কাছ থেকেও যখন আমরা কোন আশ্বাস পেলাম না, তখন সবাই মিলে গিয়ে ধরলাম দেশবন্ধুকে—এর জন্য অবিলম্বে কি করা যেতে পারে। নজরুলের দাবী জেল কর্তৃপক্ষকে মেনে নেবার জন্য দেশবন্ধু জনসভা আহ্বান করলেন।

কিন্তু তার ফল তো সময় সাপেক্ষ, হু হু করে চলে যাচ্ছে দিন,

অনশনে ওর দেহ যাচ্ছে শুকিয়ে, আয়ু যাচ্ছে প্রতিদিন ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে।

আমরা স্থির করলাম, বে-সরকারী জেল পরিদর্শক স্যার আবদুল্লা সুরওয়ার্দিকে একবার হুগলিতে যেতে অনুরোধ করা হবে, যদি তাতে কিছু সুরাহা হয়। তিনি রাজীও হলেন সহজেই, সামান্য একটু দাবী জানালেন শুধু। তাঁর হুগলি যাওয়া-আসার জন্য মোটরের ব্যবস্থা করতে হবে।

মোটর কোথায় পাব আমরা, সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামের ভাড়াই যাদের জোটে না। ধরপাকড় করে মোটর গাড়ী যোগাড় করা তাও সময় সাপেক্ষ। আমাদের অক্ষমতা সুরওয়ার্দিকে নিবেদন করাতে তিনি জানালেন, এমন অবস্থায় তিনি ট্যাক্সি করেই না হয় যাবেন, অবশ্য ভাড়ার টাকাটা যোগাড় করে দিতে হবে। যার পকেটে যা ছিল ঝেড়েপুছে ত্রিশটি টাকা দেওয়া হল সুরওয়ার্দি সাহেবকে। তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তা হাত পেতে গ্রহণ করলেন।

সুরওয়ার্দিও গেলেন হুগলি, সেই দিনই গোলদীঘিতে জনসভা। সভাপতি দেশবন্ধু, হেমন্ত সরকার, অতুল সেন, মৃণালকান্তি বসু, কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রভৃতি সকলে দাবী জানালেন—নজরুলকে বাঁচানো বাঙলা দেশ ও সাহিত্যের পক্ষে প্রয়োজন, কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করতে হবে নজরুল যাতে অনশন ভঙ্গ করে।

সভাও শেষ হল বিরাট জয়ধ্বনি ও চাই-চাইর মধ্যে, কিন্তু জন-সভার দাবী আইনসভার সিদ্ধান্ত নয়, আর আইনসভার সিদ্ধান্তও লাল ফিতার দৈর্ঘ্য বেয়ে তামিল হতে অনেক সময় লাগে। ওদিকে আবদুল্লা সুরওয়ার্দিও ফিরে এসেছেন ব্যর্থ হয়ে। দারুণ অবসাদ ও অসহায় ভাব নিয়ে বসে আছি বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে, এমন সময় বন্ধুবর বীরেন সেন জানালেন যে, নজরুলের মাতৃসমা বিরজা-সুন্দরী দেবী তার পাঠিয়েছেন, তিনি ঐদিনই চাটগাঁ মেলে কুমিল্লা থেকে আসছেন। বীরেন তখনই চলেছে স্টেশনে। আমিও তার

সঙ্গে রওনা হয়ে গেলাম এবং পরদিনই সকালে বিরজাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে হুগলি যাত্রা করলাম আমি ও বীরেন

নজরুলের সঙ্গে বিরজাসুন্দরীর দেখা করার দরখাস্ত সহজেই মঞ্জুর হয়ে গেল। আমরা দু'জনে অনুমতি পেলাম না। উনি ভিতরে ঢুকে গেলেন, আমরা বাইরে ঘুর-ঘুর করতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে হাসিমুখে ফিরে এলেন তিনি, বললেন, 'খাইয়েছি পাগলকে। কথা কি শোনে! মড়ার মত নেতিয়ে পড়েছে শরীর, ওর গলা চিঁ চিঁ করছে। কিন্তু কথা কি তবু শোনে! বলে—না, অন্যায় আমি সইব না। শেষ পর্যন্ত আমি হুকুম দিলাম, আমি মা, মায়ের আদেশ সব ন্যায়-অন্যায় বোধের উপরে। চুপ করে গেল সে। তারপর বললে—দাও, কি খেতে দেবে। নিজের হাতে করে নেবুর রস খাইয়ে এসেছি।'

দেখতে পেলাম দু'জন জেলরক্ষীর কাঁধে ভর করে নজরুল ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে গেটের দিকে। ও এসে দাঁড়াল গরাদের ওপাশে। বললে—'তোদের সঙ্গে দেখা না করে পারলাম না। যা —আর ভাবনা করিস না, লক্ষ্মী ছেলের মত থাকব বাকী ক'টা দিন। আর কবিতা লিখব। বলিস সবাইকে—কাজী এবার থেকে অতিবাধ্য কয়েদী।'

কাজী নজরুল ইসলাম

দিলীপকুমার রায়

কাজীকে চিরদিনই আমি স্নেহ ক'রে এসেছি অনুজের মতন। সেও আমাকে বরাবর অগ্রজের মতনই মান দিত, ভালোবাসত। অতি সরল প্রশ্নহীন একমুখী ছিল সে ভালোবাসা। তার স্বভাবের গতিই যে ছিল একমুখী সরল। তার নানা গানই আমি গাইতাম ব'লে সে পরমানন্দে তার 'বুলবুল'-এর উৎসর্গপত্রে আমাকে বরণ করেছিল এই ব'লে :

> আমার শুধু এ-বাণী হে বন্ধু, আমার শুধু এ-গান।
> তুমি তারে দিলে রূপরঙ্গিমা, তুমি তারে দিলে প্রাণ!
> আমার ব্যথায় বেঁধেছিল নীড় যে-গানের বুলবুলি,
> আপনি আসিয়া আদরে তাহারে বক্ষে লইলে তুলি।
> আমার পাখীর কণ্ঠে মিশালে তোমার দরদ ল'য়ে
> আমার বেদনা বাজে আজ তাই সবার বেদনা হ'য়ে।

বেদনা পেয়েছিল সে—কারণ আমি হঠাৎ সংসারের নীড় ও গানের আগুন ছেড়ে বিবাগী হ'য়ে চলে যাই পণ্ডিচেরী। তার আরো ব্যথা ছিল, আমি গানের প্রচার ছেড়ে দিলাম যোগের নীরবতা বরণ ক'রে। অবশ্য নীরব আমি কোনো দিনই হইনি, (বরং আরও প্রকাশ-সমৃদ্ধিই লাভ করেছিলাম) কিন্তু সে ভয় পেয়েছিল ভেবে যে, আমি মৌনী হ'লাম ব'লে। তাই লিখেছিল দুঃখ ক'রে এসব কথা। কারণ এর আগে সে লিখেছিল তার অপরূপ ঢঙে আমাকে সম্বোধন ক'রে :

> পূরবের তরুণ অরুণ পূরবে আসলে ফিরে,
> কাঁদায়ে মহাশ্বেতায় হিমানীর শৈলশিরে।

কুহেলির পর্দা ডারি'
ঘুমাত রূপকুমারী
জাগালে স্বপনচারী তাহারে নয়ননীরে।
তোমার ঐ তরুণ গলার শুনি গান সিন্ধুপারে,
দুলিত মধ্যমণি সুরমার কণ্ঠহারে।
ধেয়ানী দিলে ধরা
হ'ল সুর স্বয়ম্বরা
এলে কি পাগল ঝোরা পাষাণের বক্ষ চিরে ?

এ-গান দুটির উল্লেখ করলাম ভূমিকা হিসাবে—জানাতে সে কেমন উদার ছিল—যাকে বলা চলে সুন্দরের মনের মানুষ নৈলে কি এমন সুরেলা গান তার কণ্ঠে উৎসারিত হ'তে পারত ?...

মনে পড়ে তার দিলদরিয়া প্রাণের কথা। এমন প্রাণ নিয়ে খুব কম মানুষই জন্মায়। মজলিসি সভাসদ, হাসিগল্পের নায়ক, ভাবালু গায়ক, বলিষ্ঠ আবৃত্তিকার, বিশিষ্ট সুরকার, গুণীর গুণগ্রাহী, উদার সরল মানুষ—যে রেখে ঢেকে কথা কইতে জানত না—যখনই আমাদের সভায়-আসরে আসত ছুটে, হেঁটে নয়—অট্টহাস্যে ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে, এসেই জড়িয়ে ধরত 'দিলীপদা' বলে—এমন মানুষ কটাই বা জীবনে দেখেছি ?

এক সময়ে আমি তার নানা গানই গাইতাম, বিশেষ ক'রে প্রেমের গান, যথা, বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল, বসিয়া বিজনে কেন একা মনে, পানিয়া ভরনে চললো গোরী, এত জল ও কাজল চোখে, কেন কাঁদে পরাণ কি বেদনায় কারে কহি, চেও না আর চেও না সুনয়না এ-নয়নপানে, কেন দিলে এ-কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে, কে বিদেশী মন উদাস' বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে, নিশি ভোর হল জাগিয়া পরাণপিয়া, আমাকে চোখ ইসারায় ডাক দিল হায় কে গো দরদী, করুণ যেন অরুণ আঁখি, গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু

প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কয়েকটি কাজী নিজের হাতেই আমার খাতায় লিখে দিয়েছিল—সে-খাতাটি আজো আছে।

তার সঙ্গে আমার আর একটি মস্ত মিল ছিল এইখানে যে, সে তার গান সুরবিহারের স্বাধীনতা আমাকে সানন্দেই দিত যেমন দিতেন আমার পিতৃদেব ও অতুলপ্রসাদ। এ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে আমার মতভেদে কাজী ও অতুলপ্রসাদ বরাবরই ছিলেন আমার দিকে। তাই তো 'বুলবুল'-এর উৎসর্গে কাজী আমাকে লিখেছিল :

যে গান গেয়েছি একাকী নিশীথে কুসুমের কানে কানে,
ওগো গুণী, তুমি জড়ালে তাহারে সব বুকে, সবখানে।
বুকে বুকে আজ পেল আশ্রয় আমার নীড়ের পাখী,
মুক্ত পক্ষ উড়িতে যে চায় কেন তারে বেঁধে রাখি ?

সে গুণী ছিল তাই বুঝত যে মুক্তপক্ষ সুরকে স্বরলিপির কাঠামোতে বেঁধে রাখলে তার গগনবিহার ব্যাহত হয়ই হয়। আজ শুনি একদল অগায়ক ক্রিটিকের মুখে যে এ স্বাধীনতা অক্ষমনীয়। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ও কাজীর অনুমতি পাওয়ার পরে এসব রুক্ষক্রিটিকদের মাথা-নাড়া উপেক্ষা করা চলে। কাজী আমার মুখে তার গানের নানা সুরবিহারে বিশেষ উৎফুল্ল হয়েছিল। সে তার 'বুলবুল' কাব্য গ্রন্থটির প্রথম ভাগ আমাকে উৎসর্গ করে। সে-যুগে আমার বাংলা গানের পাঁচটি ধারা ছিল : পিতৃদেব দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের রজনীকান্তের, কাজীর ও আমার নিজের। পণ্ডিচেরী চলে আসার আগে আমি সবচেয়ে বেশি গাইতাম অতুলপ্রসাদ ও কাজীর গান। মনে পড়ে কত আসরে এ-দুই সুরকারকেই এক সঙ্গে শুনিয়েছি তাঁদেরই রচিত গান। এ-সৌভাগ্য কজন গায়কের হয়েছে জানি না। তবে যাঁদের হয়েছে তাঁদের কাছে এ-স্মৃতি থাকবেই অনপনেয়—বিশেষ ক'রে এই জন্যে যে, অতুলপ্রসাদ ও কাজী শুধু গায়কই ছিলেন না, ছিলেন আদর্শ শ্রোতা তথা সমজদার।

কাজীর গান। সে একটা যুগ গেছে। মনে পড়ে—রামমোহন

লাইব্রেরীতে সুভাষ ও দেশবন্ধুর পদার্পণ। তার পরেই কাজীর আবির্ভাব ও ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে গাওয়া :

এই শিকল পরা ছল মোদের এই শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল।

রামমোহন লাইব্রেরীতে, ওভারটুন হলে ও য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুটে আমি মাঝে মাঝেই 'চ্যারিটি কনসার্ট' দিতাম নানা অর্থার্থীর সাহায্যার্থে। সে-বার ছিল বোধহয় ডেটিনিউদের সাহায্যার্থে—ঠিক মনে নেই। তবে এটুকু তো ভুলতে পারিনি কাজীর এই শিকল পরার গানে দেশবন্ধু বিচলিত হ'য়ে উঠেছিলেন—বিশেষ, যখন সে গাইল :

ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল ঝন্‌ঝনা,
ও যে মুক্তিপথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হানছে লাঞ্ছনা,
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।

দধীচির আত্মোৎসর্গের ফলেই দেবতার রাজ্যরক্ষা হয়েছিল। এই সার্থক উপমার কি তুলনা আছে ? এই উপমা প্রেরণা আনে উপর থেকে—যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর Future Poetry-তে নাম দিয়েছেন শ্রুতি। ঠিক এম্‌নি প্রেরণা নেমে এসেছিল তাঁর বিদ্রোহী মনে বিদ্রোহী-বন্দনায় :

আমি সেই দিন হব শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গকৃপাণ ভীম-রণভূমে রণিবে না !
বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কিন্তু যা বলছিলাম। দেশবন্ধুর চোখে জল চিকচিক ক'রে উঠল, সুভাষের মুখ উঠল দীপ্ত হ'য়ে। এর পরে কাজীর মুখে বিদ্রোহী আবৃত্তি শুনেও সুভাষ মুগ্ধ হ'ত বরাবরই :

বল বীর, বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি' আমার নতশির ঐ শিখর হিমাদ্রির।

বিদ্রোহী হওয়া এ-সংসারে সহজ নয়। মানুষ পারৎপক্ষে কাউকে বলতে চায় না যে, সে অন্যায় করেছে।···কিন্তু কাজী ছিল স্বভাববিদ্রোহী—born rebel: মেলামেশায় দহরম মহরমে তার জুড়ি ছিল না বটে কি ঐ সঙ্গে অসামাজিক কথা বলতেও তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না কেউ, এক মহানুভব দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া অত্যাচার, কপটতা, ভণ্ডামি, ন্যাকামি, গোঁড়ামি এ সবের প্রতি এঁরা দু'জনেই ছিলেন খড়গহস্ত।

কিন্তু কাজীর বিদ্রোহ ছিল যেন আরো অগ্নিময়, ঘরোয়া, তীব্র। যখন সে গাইত তার ঝাঁকড়া বাবরী চুল দুলিয়ে:

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া !
ছুঁলেই তোর জাত যাবে জাত ছেলের হাতের নয়ত মোয়া !
বলতে পারিস বিশ্বপিতা ভগবানের কোন্ সে জাত ?
কোন্ ছেলের তাঁর লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ ?
নারায়ণের জাত যদি নাই
তোদের কেন জাতের বালাই ?
(তোরা) ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া !

তখন আমাদের বুকের মধ্যে কিসের বান ডেকে যেত বলা ভার—দুঃখ, খেদ না ভণ্ডামির প্রতি ক্রোধ, কুসংস্কারের লজ্জা? কেবল একটা কথা বলা যায় যে, আমরা সবাই অভিভূত হ'য়ে পড়তাম তার আশ্চর্য প্রকাশভঙ্গিতে: এ-ধরনের চরণ কি স্বভাব-প্রতিভাধর ছাড়া আর কারুর কলমে এমন স্বত-উৎসারে বইতে পারে? কাজী বিদ্রোহী কবি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভেজাল কবি। তাই বুঝি তার বিদ্রোহে মানুষের মনে ছোঁয়াচ লাগত এত ব্যাপক-ভাবে। কত সভায় এবং চ্যারিটি কনসার্টেই না সে আমাদের গানের

পরে এই ভাবের নানা গান গাইত ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে ভাঙা গলায়, কিন্তু এমন গাইত যে, ভাঙা গলাকেও ভাঙা মনে হত না—আগুন ছুটিয়ে দিত সে। এমন প্রাণোন্মাদী গায়ক কি আর দেখব এ-মনমরা যুগে? সত্যিই আমাদের অবাক লাগত ভাবতে ভাঙা গলায়ও কাজী কোন্ যাদুতে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করত দিনের পর দিন—ভাবের ছলে পাথরের বুকে আলোর ঝর্না বইয়ে।

একটা টুকরো স্মৃতি মনে প'ড়ে গেল : সুভাষ একবার আমাকে বলেছিল : 'ভাই, জেলে যখন ওয়ার্ডারে লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন কী যে আকুলি বিকুলি করে কী বলব। তখন বার বার মনে পড়ে কাজীর ঐ গান :

কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্তজমাট শিকলপূজার পাষাণ-বেদী!

মান্দালয় থেকে একটি পত্রে সে কতকটা আভাষ দিয়েছিল একবার। লিখেছিল (২ মে, ১৯২৫) :

'I do not think that I could have looked upon a convict with the authentic eye of sympathy had I not lived personally as a prisoner. And I have not the least doubt that the productian of our artists and literateurs, generally, would stand to gain in ever so many ways could they win to some new experience of prison-life. We do not perhaps realise the magnitude of the debt owed by Kazi Nazrul Islam's verse to the living experience he had of jails.'

(ভাবার্থ : 'আমি কয়েদীদের দরদী হ'তে পারতাম না যদি না জেলে যেতাম। আমার মনে হয় শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও অনেক কিছু লাভ হবেই হবে যদি তাদের জেল-জীবনের অভিজ্ঞতা থাকে।

কাজীকে জেলে যেতে হয়েছিল—এ অভিজ্ঞতা থেকে তাঁর কাব্য কতখানিক সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে বোধহয় আমরা আজো উপলব্ধি করিনি।')

একথা পুরোপুরি সত্য হোক বা না-হোক একথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে যে, জেলে না গেলে কাজী কখনই লিখতে পারত না এমন প্রাণজাগানিয়া চরণ :

তোমরা ভয় দেখিয়ে করছ শাসন, জয় দেখিয়ে নয়,
সেই ভয়ের টুঁটিই ধরব টিপে, করব তারে লয়,
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি প'রে আনব হাসি মৃত্যুজয়ের ফল।

সেদিনও দিল্লীতে নেতাজী-স্মৃতি সভায় গেয়েছিলাম কাজীর একটি গান, যা সুভাষ অত্যন্ত ভালোবাসত :

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার।

কাজী যখনই এ গানটি গাইত মনে পড়ে সুভাষের মুখ আবেগে রাঙা হ'য়ে উঠত—বিশেষ ক'রে সে শেষ স্তবকের দুটি অমর চরণ ধরতে না ধরতে :

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান,
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন বলিদান ?

ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাওয়ার এ-চরণটি ধরতে না ধরতে মন সম্ভ্রমে উল্লাসে ভ'রে ওঠে। এ-জাতীয় চরণ কলাকৌশলে আসে না, কাব্যসাধনায়ও নয়—আসে কেবল আলোকলোকের প্রেরণার অবতরণে। কাজীর নানা কবিতায়ই পাওয়া যায় এই দিব্য প্রেরণা।

কবি-বিপ্লবী নজরুল — ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়

অশান্ত নজরুলের প্রথম যৌবনে জেগেছিল পৃথিবীর রণক্ষেত্রকে পরখ করার ইচ্ছা। কেউ তাঁকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। বিদ্রোহী বীর বিদ্রোহ করলেন বন্ধু-পরিজনদের নিষেধের বিরুদ্ধে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাঙালী পল্টনের সৈনিক হলেন কবি নজরুল। হাতে তাঁর রণতূর্য।

যুদ্ধ-অন্তে ফিরে এলেন গৃহে। গানে-কাব্যে-আবৃত্তিতে দেশময় একটি বিদ্রোহী-আবহ সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখলেন কবি-সৈনিক। কিন্তু তাঁর জন্য চাই প্রচার। কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ১৯২২ সালে প্রকাশ করলেন তিনি 'সাপ্তাহিক ধূমকেতু'। শৌর্যের বার্তাবহ সে কাজ তরুণ-চিত্তে অপূর্ব আত্মদানের আহ্বান নতুন ক'রে জাগাল। বাংলার বিপ্লবী-মন বিস্ময়ে 'ধূমকেতু'র প্রতিটি অক্ষরে প্রাণের কথা পাঠ করে উৎসাহিত হল।

'ধূমকেতু' বেশিদিন চলল না। এ-ধারার কাগজ চলতেও পারে না বেশিদিন। কারণ, শাসকের রুদ্রদৃষ্টি এদের বাঁচতে দেয় না। নজরুলের তাতে ক্ষতি নেই। আকাশের ধূমকেতুর মতই বঙ্গগগনে তাঁর হঠাৎ প্রকাশ তীব্র দীপ্তি ছড়িয়ে তরুণ-নয়নে চমক লাগিয়েছিল। বাংলার তরুণ তাঁর কণ্ঠের গান কেড়ে নিল। বাংলার তরুণ তাঁর দেওয়া 'মার্চিং সঙ' বা চলার সঙ্গীতের তালে তালে রুট-মার্চ শুরু ক'রে দিল। বাংলা ভাষায় সামরিক পদ্ধতিতে 'চলার' সঙ্গীত ছিল না। নজরুল দিলেন সে সঙ্গীত : অভিযাত্রীর পদছন্দে :

'চল্ চল্ চল্ !
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল'—

বাংলার বিপ্লবীরা তাঁদের দুরন্ত আদর্শের উদ্গাতারূপে তাঁকে একান্ত আপন ক'রে লাভ করলেন। নজরুলের যাত্রা শুরু হল বিপ্লবপন্থার পুরোভাগে, বিপ্লববাদের চারণ-কবির ভূমিকায়। কবির উপলব্ধির মূল তাঁরই অনুভূতির গভীরে। বলেছেন তিনি :

'বন্ধু গো আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে'

আরও বলেছেন :

'রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।'

তারও পরে বলেছেন :

'প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।'

কত গভীর অনুভূতি, কত ব্যাপক ও নিবিড় বেদনা থেকে যে কবির অন্তরে বিপ্লব-সত্তার জন্ম, তার সন্ধান রয়েছে এসব উক্তির মধ্যে।

নজরুল মহাক্ষত্রিয়। নজরুল সত্যের একনিষ্ঠ পূজারী। অন্যায়ের শাসন-নাশনে তিনি পরমোৎসাহী। নজরুলের 'সত্য' মানবকে কেন্দ্র ক'রে। তাঁর কাছেও—

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।'

তাই তিনি বলেছেন :

'গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

নজরুল সত্যের খাঁটি উপাসক। তাই তিনি খাঁটি বাঙালী বা খাঁটি ভারতীয়। তিনি খাঁটি মুসলমান ব'লেই খাঁটি বিপ্লবধর্মী হতে পারলেন। তিনি মানুষের মধ্যে কোন ভেদাভেদ দেখলেন না। কারণ তাঁর কাছে :

'নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্মজাতি,
সব দেশ সব কালে ঘরে-ঘরে তিনি মানুষের জাতি।'

তাই কবি সাম্যের গান গাইতে পারলেন। ভগবান তাঁর কাজে মিথ্যা, যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ভগবানকে খুঁজে বার না করা যায়। কাজেই হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে কায়েমী-স্বার্থের প্ররোচনায় বাঁচিয়ে রাখা এক ষড়যন্ত্র-প্রসূত গ্লানি। বিপ্লবী-কবির কণ্ঠে তাই শুনি :

'খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা ?
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !

বলেছেন কবি দুঃখে :

'মানুষেরে ঘৃণা করি
ও কারা কোরান, বেদ, বাইবেল চুম্বিছে মরি মরি !'

নজরুলের ফাঁকি নেই, ফাঁকি নেই তাঁর চিন্তায় ও কর্মে।

মহাবিপ্লবের পুরোহিত নজরুল। বিপুল তাঁর হৃদয়ের পরিসরে বিশ্বের নির্যাতিতদের বেদনার ছায়া পড়েছে। তাই তিনি বিপ্লবীর কম্বুকণ্ঠে সাম্যের গান গাইলেন সবার তরে। ধরার সকল পাপীর উদ্দেশে জানালেন :

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব মোর ভাই।'

বিপ্লবী নজরুল বিশ্বমানবের প্রেমে অভিষিক্ত হৃদয়ে বাংলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সমাজের ও রাষ্ট্রের নির্যাতিত নরনারীর বেদনার গান আকুল কণ্ঠে গেয়ে গেছেন। বিদ্রোহী কবির উদ্বেল সঙ্গীতনির্ঝর সারা বঙ্গের বিপ্লবী-হৃদয়েই অটুট আত্মবিশ্বাস সঞ্চারিত করেছিল। সেই আত্মবিশ্বাস থেকেই বিপ্লবীর রক্তে জাগে প্রত্যয়লিখা :

'আমরা সৃজিব নতুন জগৎ, আমরা গাহিব নতুন গান।'

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত দেখি বিপ্লবী বাংলার তথা বিপ্লবী ভারতবর্ষের এক অত্যুগ্র গতি—যা ভয়ঙ্কর যা দুঃসাহসে সুন্দর।…চট্টগ্রাম রাইজিং, রাইটার্স প্রাসাদে অলিন্দ যুদ্ধ, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, ঢাকা, কলকাতা, দার্জিলিং তথা সারা বাংলায় দুর্জয়ীদের

দুঃসহ অভিযান থেকে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের প্রচণ্ড বিপ্লব, বিয়াল্লিশের রক্ত-ক্ষরা আন্দোলন, ছেচল্লিশের রোমাঞ্চকর নৌ-বিদ্রোহ প্রভৃতি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে বিপ্লবের কবি নজরুল ইসলামের স্বপ্ন-রূপায়ণ। কবি যাদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

'আমি গাই তারই গান—
দৃপ্ত-দম্ভে যে-যৌবন আজ ধরি' অসি খরসান,
হইল বাহির অসম্ভবের অভিযানে দিকে দিকে'—
সেই বিপ্লবী তরুণদলেরই বিপুল এ কর্মপ্রবাহ।

নজরুল কবি ও দ্রষ্টা। কবির বাণী এবং দ্রষ্টার উক্তি সে-যুগে সফল হয়েছিল। রুদ্রের সাধনায় সিদ্ধ শহীদকুল—সূর্য সেন, প্রীতিলতা, বিনয় বসু, প্রদ্যোৎ, ভবানী, ভগৎ সিং আসফাকউল্লা, উধম সিং, যতীন দাস, মাতঙ্গিনী. কনকলতা এবং সর্বোপরি নেতাজী পরিচালিত আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অগণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর এবং 'কুইট ইণ্ডিয়া'র সংগ্রামী দল এই চারণ-কবির ছন্দোবদ্ধ গানে এই ভারত-ভূমিতে এবং বহির্ভারতে মহাভাঙনের তাণ্ডব রচনা করতে পেরেছিলেন। যার আঘাতে প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ-শাসনের বুনিয়াদ টুকরো টুকরো হয়ে গেল, ভারত রাষ্ট্রীয়-স্বাধীনতা লাভ করল।

সাংবাদিক নজরুল

মুকুর সর্বাধিকারী

কাজী নজরুল ইস্‌লাম কবি ও বিদ্রোহী।

কৈশোরের শেষ প্রান্তে তাঁকে ভাগ্যের সাথে লড়াই শুরু করতে হয়। তাঁর পিতা ফকীর আহ্‌মদ নিঃস্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন। আর নজরুল বাল্য জীবনে ইস্কুলে না গিয়ে হলেন গার্ড সাহেবের বাড়ীর চাকর, আবার কখনো আসানসোলের রুটীর দোকানের বয়্।

কখনো বা লেটোর দলে গান বেঁধে দিন কাটিয়েছেন।

নজরুলের বিশ্বাস ছিলো যে, যুদ্ধে যেতে পারলে এবং তলোয়ার ধরতে শিখলে মুক্তিযুদ্ধ করতে শেখা হবে। না'হলে যে পেলো ডবল প্রমোশন, আর ছিল স্কুলের উজ্জ্বলতম ছাত্র, সেই ছেলে অনায়াসে চলে গেল বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সৈনিক হিসাবে। লড়াই শিখতে হবে লড়াই করার জন্য।

চুরুলিয়া গ্রামের ছেলে আরব সমুদ্র তীরে করাচীর তাঁবুর ভিতর সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যই তলোয়ারে শান দিয়েছিলেন। নাম-গোত্র-হীন মুরার পুত্রের মতো অখ্যাত নজরুল ভেবেছিলেন অস্ত্রের ব্যবহার আর যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত ক'রে বাঁচবেন। কারণ 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?' কিশোর নজরুল তাই বেঙ্গলী ডাবল কোম্পানীতে যোগদান করাকে দেশ-প্রেমের প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে ধরে নিয়ে নিজেকে যুক্ত করলেন তার সাথে।

ইতিমধ্যে মহাযুদ্ধের মহড়া শেষ, ও উনপঞ্চাশী বাঙালী পল্টন উনিশের পরই ভাঙল। নজরুল উঠলেন খাস কলকাতায়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যৌবন টগ্‌বগ্‌ করে। তিনি রাজনীতির চরম ঘটনার সাথে পরিচিত হলেন, সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরলেন নিজের বক্তব্য। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এর শিরোনামা, সম্পাদকীয়

প্রমাণ করলো যে, কাজী নজরুল দাড়ী চাঁচার জন্য তলোয়ার ধরতে যাননি, আর কলম ধরেননি তথাকথিত ভদ্রলোকদের মনোরঞ্জনের জন্য। তবে রাজরোষের অবশ্যম্ভাবী ফল পেতে দেরী হয়নি। আর যারা টাকা দিয়ে সাহায্য করেন তারাই মুরুব্বি হলেন। তাঁদের দু'জনকে শেষ পর্যন্ত কাগজ ছাড়তে হল। অপরজন হলেন ভারতীয় রাজনীতিতে খ্যাতনামা ব্যক্তি মুজফ্ফর আহ্মদ। এঁদের সাথে আর একটি স্মরণীয় নাম—এ. কে. ফজলুল্ হক।

'ধূমকেতু'তে সেই সময় কবি লিখলেন, 'সর্ব প্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার—সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীদের মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না।···আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকু ছাড়তে হবে···'

নিশ্চয়ই নিবারণ ঘটকের ছাত্র এবং শিষ্যের রচনা বিপ্লবী দলকে বপুলভাবে উৎসাহিত করেছিল। 'ধূমকেতু'র মাধ্যমে নজরুলের রচনা প্রভাবিত করেছিল বিপুলভাবে সন্ত্রাসবাদী দুইটি দলের সভ্যদের— 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তরের'। যুগান্তরের সভ্যরা তো মনে করতেন যে, 'ধূমকেতু' তাঁদেরই কাগজ এবং সভ্য না হলেও নজরুল কম বিপ্লবী নন। এই 'ধূমকেতু'কে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এর কয়েক বছর পরে নজরুল আর একটি সাপ্তাহিকের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হন। এই কাগজটির নাম 'লাঙল'। লাঙলের পাতায় বেরুলো 'কৃষকের গান', 'কুলি মজুর', 'মানুষ—পাপ',—যার অতি খ্যাত নাম 'সাম্যবাদী'। কী প্রলয়োচ্ছ্বাস এনেছিলো এ কাব্য! তার রেশ এ কয়েকটি দশকেও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি।

৮/১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে আসার পরে কাজী নজরুল ইসলামের সামনে একটি নূতন দিগন্ত খুলে গেল,—সুর ও সঙ্গীতের দিগন্ত। আমরা যতটা খবর জানতে পেরেছি, কিছুকাল হতেই সে ছিল গানের পাগল। সেই রকম একটি পরিবেশই সে পেয়েছিল। তাদের বাড়ীর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের ভিতরে গানের ও নাচের দল ছিল। সেই সকল দলের প্রভাবে সে পড়েছিল। সে নিজে এই রকম দলে যোগও দিয়েছিল। এইভাবে তার সঙ্গীত-চর্চার আরম্ভ। জীবনে কোনো সময়ে সে এই চর্চা ছেড়ে দেয়নি। এম. আবদুর রহমান সংগৃহীত তথ্য হতে জানা যায় যে, শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলে পড়ার সময়ে নজরুল ইসলাম তার সঙ্গীতের জ্ঞানকে উন্নততর করার সুযোগ পেয়েছিল। এই স্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীসতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল একজন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। নজরুলের সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পেয়ে তিনি তাকে মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। কোনো কোনো সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতেও নজরুলকে এইজন্য ডেকে নিয়ে যেতেন। এই মাস্টার মহাশয়ের নিকট হতে সে সঙ্গীত-বিদ্যায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ জ্ঞানলাভের সুযোগ পেয়েছিল।

জমাদার শম্ভু রায়ের পত্র হতে আমরা জানতে পারি যে, পল্টনের ব্যারাকেও নজরুলের সাহিত্য ও সঙ্গীতের চর্চা কোনোদিন থামেনি। সেখানেও ভালো ভালো বাদ্যযন্ত্র পেয়ে সে বাজানোটাও বিশেষভাবে আয়ত্ত ক'রে নিতে পেরেছিল। সেখানেও সে সাহায্য করার লোক পেয়ে গিয়েছিল। যেমন, জমাদার শম্ভু রায় হুগলী শহরের হাবিলদার নিত্যানন্দ দে'র নাম করেছেন। তিনি নজরুলকে অরগ্যান

বাজানো শিখিয়েছেন। সৈনিক ব্যারাকে গানের মজলিস আবার বসত নজরুলের ঘরের সামনে। তাতে সৈনিকরা 'চালাও পানসী বেলঘরিয়া', 'ঘি চপ্‌চপ্‌ কাবলীমটর' ও 'দে গরুর গা ধুইয়ে' প্রভৃতি বুলি উচ্চারণ ক'রে আনন্দে ফেটে পড়তেন।

পল্টন হতে ফিরে আসার পরেও নজরুল তার গানের চর্চা অবিরাম চালিয়ে গেছে। শুধু বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলে জনপ্রিয় না হয়ে সে যে জনসাধারণের ভিতরেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল তার গানই তার প্রধান কারণ। শ্রীযুক্তা মোহিনী সেনগুপ্তা একজন বয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা ছিলেন। তিনি পত্রিকায় প্রকাশিত নজরুলের দু'একটি কবিতায় সুর দিয়ে তার স্বরলিপি প্রকাশ করেছিলেন। সে সময়ে বহু পত্রিকায় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার স্বরলিপি ছাপা হতো। আমি নজরুলের ফৌজ হতে ফিরে আসার দু'তিন মাসের ভিতরকার কথা বলছি। একদিন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার নিকট হতে নজরুল একখানা পত্র পেলো। তাতে তিনি তাকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সে যেন গানের কায়দা-কানুনের কাঠামোর ভিতরে গান লেখে। অর্থাৎ আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারটি ভাগে ভাগ ক'রে গান রচনা করার কথ নি তাকে বলেন। এইভাবে গান রচনা করলে সেই গানের সুরারোপে ও স্বরলিপি তৈয়ার করায় সুবিধা হয়, এই কথাও তিনি পত্রে লিখেছিলেন। তখনও তাঁর সঙ্গে নজরুলের মুখোমুখি পরিচয় হয়নি। সে যখন সত্যকার গান রচনা শুরু করেছিল তখন সম্ভবত শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তার উপদেশ সে মেনে চলেছিল। সম্ভবত বলছি এই করণে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার কোনো বিদ্যা নেই।

৮।১, পানবাগান লেনের বাড়ীতে নজরুল যখন বাস করতে এলো (১৯২৮ সালের শেষাশেষি হবে, মাসটা মনে করতে পারছিনে) তখন সে সঙ্গীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রচিত গান তারই দেওয়া সুরে সুর-শিল্পীরা তখন সর্বত্র গাইছেন। বিশেষ করে, তার নূতন রচিত গজল গানগুলির জনপ্রিয়তা অত্যন্ত বেশী। কিন্তু সঙ্গীতে নজরুল

ইসলাম যতই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, ব্রিটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর নিকটে সে ছিল সম্পূর্ণরূপে বর্জিত। যে ব্যক্তি রাজনীতিতে (রাজনীতি মানেই তখন ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম) যোগ দিয়েছে, তার জন্য জেল খেটেছে, তার সঙ্গে কি ক'রে একটা ব্রিটিশ কোম্পানী যোগস্থাপন করতে পারে ?

কিন্তু দেশের আবহাওয়া বদলে গিয়েছিল। গ্রামোফোন কোম্পানীও ছিল একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। ১৯২৮ সালে এই কোম্পানীর নিকটে চারদিক হতে জিজ্ঞাসা আসতে লাগল যে, তাদের রেকর্ডে কাজী নজরুল ইসলামের গান নেই কেন ? এই রকম জিজ্ঞাসা আসা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সুর-শিল্পীরা যাঁর গান দেশের সব জায়গায় গেয়ে বেড়াচ্ছেন, তাঁর গান গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে উঠবে না এটা কেমন কথা ? কোম্পানীর টনক নড়ল। তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, কাজী নজরুল ইসলামকে আরও এড়িয়ে চলার মানেই হবে ব্যবসায়ের দিক হতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। কোম্পানীর কর্মকর্তারা এই অবস্থায় যখন নজরুলের ঠিকানা যোগাড় করতে যাচ্ছিলেন, তখনই তাঁরা খবর পেলেন যে, তাঁদের রেকর্ডের দু'টি গান তার লেখা। সুবিখ্যাত গায়ক শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের দু'টি কবিতার অংশ বিশেষ সুর দিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গেয়েছিলেন। তখন তিনি কোম্পানীকে জানতে দেননি যে, এই দুটি গানের রচয়িতা কে। জানতে দিলে কোম্পানীর কর্তারা গান দুটি তাঁকে গাইতে দিতেন না। এখন কিন্তু খবরটি জানতে পেরে কোম্পানীর কর্তারা খুশীই হলেন। সঙ্গে সঙ্গে রচয়িতারপাওয়া রয়্যালটির হিসাব ক'রে দেখা গেল যে, নজরুলের কয়েক শ' টাকা (কত টাকা আমার মনে নেই) পাওনা হয়েছে। এই টাকাটা তাঁরা লোক মারফতে সোজাসুজি নজরুলের নিকটে তার পানবাগান লেনের বাড়ীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কোম্পানীর দ্বারা সে আমন্ত্রিতও হলো যে, তার গানযেন গ্রামোফোন কোম্পানীর রেকর্ডে গাইতে দেওয়া হয়। এইভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে

স্থাপিত হয়েছিল নজরুলের প্রথম সম্পর্ক। আর সেই সঙ্গে খুলে গেল তার চোখের সামনে একটি নূতন দিগন্ত। নজরুল বরাবর গান গেয়েছে। গান সে লিখেও যাচ্ছিল। যতটা মনে করতে পারছি—তার গানের পুস্তক 'বুলবুল' তখন ছাপা হয়েছিল। বই হতে কম হোক, বেশী হোক, টাকা সে পাচ্ছিল, কিন্তু গান হতে সে টাকা পেল এই প্রথম। তার সামনে একটা নূতন দিগন্ত খুলে গেল বই কি!

ক্রমশ একান্তভাবে সুরের রাজ্যে নজরুল তো প্রবেশ করছিলই, গ্রামোফোন কোম্পানীর নিমন্ত্রণে তার প্রেরণা আরও বেড়ে গেল। তখনই তার মনে এসেছিল যে, ওস্তাদী গানের বিদ্যাটা সে আরও ঝালিয়ে নেবে। এই সময়েই ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানকে তার বাড়ীতে দেখা গেল। একদিন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও নজরুল করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নামে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ১লা আশ্বিন (খ্রীঃ ১৬ই কিংবা ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) তারিখে গানের পুস্তক 'বন-গীতি' উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছে :

'ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলাবিদ আমার গানের
ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের দস্ত্ মোবারকে।'

এর সঙ্গে সে যে কবিতাটি লিখেছে তার শেষ দু'ছত্রও আমি এখানে তুলে দিলাম :

'সুর শা' জ্বাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি
মোর 'বন-গীতি' নজরানা দিয়া দস্ত্ চুমি।'

মোবারক' আরবী ভাষার শব্দ। তার মানে শুভ। 'দস্ত্' পারসী ভাষার কথা, মানে হাত। নজরুল যখন ১৯২৯ সালের শুরুতে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের নিকট হতে গানের শিক্ষা নিচ্ছিল তখন তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে সঙ্গীতের 'ট্রেনার'ও ছিলেন।

১৯২৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে ধরা পড়ে আমি যখন আবার জেলে গেলাম তখন দেখে গেলাম যে, কাজী নজরুল ইস্লাম সম্পূর্ণরূপে সুরের রাজ্যে প্রবেশ করেছে।

নজরুল ইস্‌লাম এক সঙ্গে গায়ক, সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুর সংযোজনকারী। এই তিন গুণের সমন্বয়ে উনিশ শ' ত্রিশের দশকে আমাদের দেশকে সে অপূর্ব অবদান দিয়ে গেছে। সুরের সৃষ্টিতে সে অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। সঙ্গীত রচনায় তার তুলনা নেই। নারায়ণ চৌধুরী লিখেছেন যে, নজরুল ইস্‌লাম রচিত সঙ্গীতের সংখ্যা তিন হাজার। ১৯৬৪ সালে একজন বন্ধু শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নিকট হতে শুনে এসে আমায় বলেছিলেন যে, নজরুল রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজার নয়, চার হাজার। আমার যতটা মনে পড়ে নজরুল নিজেও একদিন তার গানের সংখ্যা আমায় তিন হাজার বলেছিল। ১৯৩৬ সালের শেষাশেষিতে কিংবা ১৯৩৭ সালের শুরুতে নজরুল আর আমি তার বাড়ীতে একদিন এক সঙ্গে খেতে বসে-ছিলাম। বহু বৎসর কলকাতা হতে আমায় অনুপস্থিত থাকতে হয়েছিল বলে আমি অনেক কিছুই জানতাম না। সেইজন্য খেতে বসে আমি নজরুলকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'তোমার লেখা গানের সংখ্যা কত, এক হাজার দেড় হাজার হবে?' নজরুল উত্তরে বলেছিল, 'প্রায় তিন হাজার।' শুনে আশ্চর্য হয়ে আমি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বলছ কি তুমি? রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী?' সে জওয়াব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ'। আমি কোথাও রবীন্দ্রনাথের লেখায় পড়েছিলাম যে, তাঁর লেখা গানের সংখ্যা আড়াই হাজার। যদি আমি ভুলে না গিয়ে থাকি তবে এই সময়ে নজরুল ইস্‌লাম গ্রামোফোন কোম্পানীর গানের 'ট্রেনার ও হেড্‌ কম্পোজার' ছিল। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের মৃত্যু হওয়ার পরে সে-ই এই কাজে নিযুক্ত হয়েছিল।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার সময় তেমন তেমন বড়লোককেও সমীহ করে যেতে দেখেছি,—অতি বাক্‌পটুকেও ঢোঁক গিলে কথা বলতে শুনেছি—কিন্তু নজরুলের প্রথম ঠাকুর বাড়ীতে আবির্ভাব সে যেন ঝড়ের মত। অনেকে বলত, 'তোর এসব দাপাদাপি চলবে না জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে, সাহসই হবে না তোর এমনভাবে কথা কইতে।'

নজরুল প্রমাণ করে দিলেন যে, তিনি তা পারেন। তাই একদিন সকালবেলা—'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই রব তুলতে তুলতে তিনি কবির ঘরে গিয়ে উঠলেন—কিন্তু তাঁকে জানতেন বলে কবি বিন্দু-মাত্রও অসন্তুষ্ট হলেন না।···

নজরুল ধর্মের চেয়ে মানুষকে বড় করে দেখেছেন সব সময়, তাই ধর্ম-নির্বিশেষে নজরুলকে ভালবাসতে কারো বাধেনি।

কতদিন আমাদের বাড়ীতে গানের মজলিস বসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছি আমরা একসঙ্গে, গোঁড়া বামুনের ঘরের বিধবা মা, নজরুলকে নিজের হাতে খেতে দিয়েছেন—নিজের হাতে বাসন মেজে ঘরে তুলেছেন, বলেছেন, 'ও ত আমারই ছেলে—ছেলে বড়, না আচার বড়?'

এই যে নজরুল আপনাকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণের প্রাবল্যে, হৃদয়ের মাধুর্যে—এই তো মানুষের সবচেয়ে বড় ধর্ম, বড় আদর্শের কথা।

আমার মন সেদিন একটি বিশেষ কারণে খুব স্বাভাবিক ছিল না। ১৯৩৯ সালের অক্টোবর—ঠিক পূজার পরেই। সেদিন বেলা বারটা-একটার সময়ে আমার একটি শিশু-সন্তান মারা গেল। কয়েক মাসের সন্তান। বেলা ছুটো নাগাদ তার সৎকারের ব্যবস্থা করে শবটিকে শ্মশানে পাঠানো হল। বেলা তখন চারটে, একটি টেলিগ্রাম পেলাম, 'আমি এবং নজরুল আজ তোমার ওখানে পৌঁচুচ্ছি।—নলিনী।'

বলা প্রয়োজন, আমার সঙ্গে কাজীসাহেবের পরিচয় ছিল নাম-মাত্র। বোধকরি ১৯৩৩।৩৪ সালে তাঁর সঙ্গে আমদপুর রেলস্টেশনে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাদের ও অঞ্চলের একটি বর্ধিষ্ণু এবং উঁচু সরকারী চাকুরে মিয়া সাহেবের সঙ্গে তাঁদের বাড়ী যাচ্ছিলেন। কয়েকটি মাত্র কথা হয়েছিল। ১৯৩৩।৩৪-এ আমি আমার পরিচয় গড়ে তুলতে পারিনি। নলিনীদার সঙ্গে পরে পরিচয় হয়েছে 'শনিবারের চিঠি'র আপিসে। সেইহেতু টেলিগ্রাম তিনিই করেছিলেন। ওঁদের ওখানে যাবার বিশেষ একটি প্রয়োজন ছিল। কাজী সাহেবের স্ত্রী বাতে পঙ্গু ছিলেন। বহু স্থানে বহু চিকিৎসা করিয়ে কিছু হয়নি। তখন দৈব ওষুধের সন্ধানে 'বেলে'র কথা মনে পড়ে। বেলে গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন। বেলের ধর্মঠাকুরের স্থানের মাটি এবং এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও তেলের খ্যাতি বাতের ওষুধ হিসেবে বহুকাল থেকে বাংলা দেশে ছড়িয়ে আছে। দূর চট্টগ্রাম থেকেও লোক আসতে দেখেছি আমি। পাটনার একজন I. M. S. ডাক্তারকেও এই মাটি-তেল ব্যবহার করতে দেখেছি। আমিই পাঠিয়েছি। কাজীসাহেব বর্ধমানের লোক, তাঁর নিশ্চয় জানা ছিল।

যাক্, টেলিগ্রামখানি পেয়ে আমি বিব্রত হলাম। কারণ মেয়েরা

এই সময় এই আসা কেমন ভাবে নেবেন ঠিক বুঝলাম না। তবুও এসে কথাটা বললাম। এবং ওঁদের জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থাদি করলাম।

ওঁরা এলেন। লাভপুরে নামলেন রাত্রি ন'টায়। সেদিন বারে শনিবার ছিল। কারণ রবিবার হল ধর্মঠাকুরের বিশেষ-বার।

ওঁরা নেমেই আমাকে আমার ছেলে কেমন আছে প্রশ্ন করলেন। ছেলেটির অসুখের সংবাদ নলিনীদা জানতেন। কারণ সজনী [সজনীকান্ত দাস] তাঁকে কথাটা বলেছিল। যাই হোক, কথাটা শুনে কাজীসাহেব বললেন, আমাদের ডাকবাংলোয় একটু ব্যবস্থা করে দাও। কিংবা স্টেশনের ওয়েটিংরুমে। আমার আগ্রহে ও অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমার ওখানেই এলেন। রাত্রে থাকলেন সকালে ট্যাক্সি করে বেলে গিয়ে দুপুরে ফিরে এসে আহারাদির পর বললেন, রাত্রে আসর পাতো। গান গাইব।

বিকেলে আমাদের ওখানে ফুল্লরা মহাপীঠে গিয়ে দেবীর মন্দিরের সামনে নাটমন্দিরে পদ্মাসন হয়ে বসে কাজীসাহেব প্রাণায়াম যোগে জপ শুরু করলেন। দেখতে দেখতে মনে হল মানুষটা নিস্পন্দ বা সমাধিস্থ হয়ে গেছে। কুম্ভকে এতক্ষণ অবস্থান খুব বড় যোগী ভিন্ন সম্ভবপর নয়। সমস্ত শরীরে ঘামের বন্যা বয়ে গেল। যখন জপ সেরে উঠলেন তখন চোখ দুটি জবাফুলের মত লাল। এবং তখনও ঠিক জাগ্রত চেতনায় যেন ফেরেননি। সেই অবস্থাতেই একখানি গান রচনা করে সুর দিয়ে গেয়ে দেবতাকে এবং সমবেত লোকেদের শুনিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

তারপর সন্ধ্যা থেকে গানের আসর বসল। রাত্রি দুটো পর্যন্ত। একনাগাড়ে গেয়ে গেলেন। মধ্যে একবার আধঘণ্টার জন্য নলিনীদা দুই বা তিনখানি হাসির গান গেয়েছিলেন। লোকে লোকারণ্যের সৃষ্টি করেছিল। স্থানীয় মুসলমানেরা এসেছিলেন দলে দলে। তাঁরা ইসলামী সঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন। রাত্রির মধ্যখানে গেয়েছিলেন শ্যামাসঙ্গীত। সে সময় আশ্চর্য ভাবমণ্ডলের সৃষ্টি

করেছিলেন। এবং তাঁর মধ্যে কবি ও ভক্ত অর্থাৎ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বংলা দেশের সাধক বা মহাজনকে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

আমাদের হৃদয়ের সন্তান-বিয়োগ-বেদনার নিঃশেষে উপশম হয়েছিল এমন কথা বলব না, তবে তার উপর যে তিনি আনন্দ শ্বেতচন্দনের একটি স্নিগ্ধ-শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, এ শতবার উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে বলব।

আমার কাছে ঘটনাটা স্মরণীয় হয়ে আছে দুটো কারণে। এক এবং প্রথম—আমার সন্তান-বিয়োগের ঘণ্টা কয়েক পরেই এই বরণীয় অতিথিকে সংবর্ধনা করা। দ্বিতীয়—কাজীসাহেবের মত ব্যক্তির আগমন।

উদার নজরুল

মন্মথ রায়

দুনিয়ায় খুব কমই দেখা যায় যে, একজন আর একজনকে টেনে তুলছে ওপরে। এবং সে টেনে তোলা আরও মহত্তর হয়, যখন যিনি টেনে তুলছেন, তিনি খ্যাতির শীর্ষদেশে সমাসীন—যাকে টেনে তুলছেন, সে রয়েছে অখ্যাত, অবহেলিত। এমনি একটি কাহিনী দিয়েই আজ আমি নজরুল ইসলামের স্মৃতি-চারণ করছি।

১৯২১ সাল। দেশে তখন প্রবল অসহযোগ আন্দোলন। সে আন্দোলনে ভাসিয়ে দিলাম আমার আসন্ন বি. এ. পরীক্ষা। স্কটিশ হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে, বাসা বাঁধলাম নন্দকুমার চৌধুরী লেনের একটি মেসে। সারাদিন অসহযোগ আন্দোলনের কাজ করি, সময় পেলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে রাজনীতি আর সাহিত্য করি। এই মেসেই তখন থাকতেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সব নামকরা সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়, আর সেটা যেন আমাদেরই একটি গর্ব।

'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে। একদিন তাঁর কথা উঠতেই পবিত্র বললেন, 'ও, কাজীটার কথা বলছিস? তা ওটাকে আনবো একদিন।'

আমি তো হাঁ! বড় বেশী কথা বলতেন পবিত্র। কিন্তু সত্যি সত্যিই তিনি অবাক করে দিলেন কবি কাজী নজরুলকে একদিন আমাদের মেসে এনে। একটা শিহরণ খেলে গেলো আমার মনে। এই সেই কাজী নজরুল? আর পবিত্র তাঁর এতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু? পূজারীর মনোভাব নিয়ে সেদিন তাঁদের সামনে অর্ঘ্য রেখেছিলাম চায়ের বাটি, জলখাবারের থালা।

আমি তখন 'বঙ্গে মুসলমান' নামে একটি রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক লিখে নিজেই রোমাঞ্চিত। খুব ভয়ে ভয়ে কথাটা পেড়ে,

পাণ্ডুলিপি থেকে কবিকে তার দু'এক পাতা পড়ে শোনাবার একটা দুর্দম আকাঙ্ক্ষায় ভুগছি। শুরুও করেছিলাম, কিন্তু তেমন একটা সাড়া পেলাম না। আর একদল অনুরাগী এসে কবিকে বগলদাবা করে তুলে নিয়ে গেলেন আমাদের আসর থেকে।

১৯২৩ সাল। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. আর 'ল' পড়ি। তখনই লিখি আমার প্রথম একাঙ্ক নাটক—'মুক্তির ডাক'। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য এলো। কলকাতার স্টার থিয়েটার ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সেই নাটকটি এখনকার নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক একাঙ্ক-নাটক-রূপে নাটকটি ঐতিহাসিক মর্যাদা পেলো বটে, কিন্তু তদানীন্তন চার-পাঁচ ঘণ্টার নাটকের যুগে এই স্বল্প-দৈর্ঘ্য দেড় ঘণ্টার একাঙ্ক নাটকটি মোটেই জনপ্রিয় হলো না। তবু সৌভাগ্যই বলবো, কারণ তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক 'বীরবল' নামে খ্যাত স্বর্গীয় প্রথম চৌধুরী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আমাকে লিখলেন, 'আপনি শুনে খুশি হবেন যে, 'মুক্তির ডাক' আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনার নাটকখানির মহাগুণ এই যে, এখানি যথার্থই Drama।'

কিন্তু তখনও আমি অখ্যাতই বলতে হবে। কারণ, স্টার থিয়েটার তাঁদের প্রচারপত্রে নাট্যকাররূপে আমার নাম ঘোষণা করেন নি, 'মুক্তির ডাক' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো, তখনই আমার নামটা প্রকাশ পেলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় জগন্নাথ কলেজের সাহিত্য মুখপত্র 'বাসন্তিকা'য় আমি 'সেমিরেমিস' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লিখি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষ, সবুজপত্র, কল্লোল, বিচিত্রা প্রভৃতি সাহিত্য পত্র-পত্রিকায় আমার কিছু একাঙ্ক নাটক প্রকাশিত হলো বটে কিন্তু তখনও খ্যাতিমান হইনি আমি।

এম. এ. এবং 'ল' পাশ করে আমি চলে এলাম আমার তদানীন্তন বাসভূমি বালুরঘাট মহকুমা শহরে। শুরু করলাম ওকালতি।

সাহিত্যের হাটে হারিয়েই গেলাম বলা চলে। হঠাৎ সেখানে পেলাম অযাচিত একখানি চিঠি। বিস্ময়ে হলাম অভিভূত। বহু কষ্টে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে চিঠিটি লিখেছেন কবি নজরুল ইসলাম। আমার সঙ্গে পরিচয় করতে উৎসুক তিনি, কলকাতায় গেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেন না ভুলি। সঙ্গে সঙ্গে দিলাম উত্তর। লিখলাম, 'ঐ লগ্নটির অপেক্ষায় আমিও রইলাম।' সঙ্গে সঙ্গে পেলাম তাঁর আর একখানি চিঠি। এই চিঠির তারিখ ৪. ৭. ২৭।

লিখলেন তিনি—

নওরোজ কার্যালয়

সচিত্র মাসিকপত্র ৪৫বি, মেছুয়াবাজার স্ট্রীট

কলিকাতা

৪-৭-২৭

জয়যুক্তেষু—

আপনার স্নিগ্ধ চিঠি না-চাওয়ার পথ দিয়ে এসে আমায় যতো না বিস্মিত করেছে তার চেয়ে আনন্দ দিয়েছে ঢের বেশী।

আমি এতটা আশা করতে পারিনি যে, আমার প্রশংসা আপনার ললাটের প্রদীপ্ত প্রতিভা-শিখাকে উজ্জ্বলতর করবে—বা সোজা কথায় আমার প্রশংসায় আপনার মতো অসীম শক্তিশালী তুরন্ত সাহসী লেখকের কিছু 'এসে যায়'।

আমার মনের চেয়ে চোখের স্মরণশক্তি একটু বেশী। দেখ্‌লে তাকে হয়তো গ্রহান্তরেও চিনতে পারি—শুনলে তাকে পথান্তরে চিনতেও বেগ পেতে হয়। কাজেই নন্দকুমার চৌধুরী লেনের দেখা আপনাকে কাব্যের নন্দন-কাননের রাজপথে দেখেও চিন্‌তে আমার এতটুকু দেরী হয়নি। নন্দকুমার চৌধুরী লেনের সেই সুশ্রী ছিপ্‌ছিপে তরুণের চোখে অপ্রকাশ প্রতিভার যে আয়োজন দেখেছিলাম—তার পরিপূর্ণ বিকাশের সমারোহ আজ আমাকে শুধু বিস্মিত করেনি—পূজারী করে তুলেছে। এক বুক কাদা ভেঙে পথ চলে এক দীঘি

পদ্ম দেখলে দু'চোখে আনন্দ যেমন ধরে না, তেমনি আনন্দ দু'চোখ পূরে পান করেছি আপনার লেখায়—এ বল্‌লে আপনি কী মনে করবেন জানি না তবে আমার প্রাণের আনন্দ এর চেয়েও ভালো করে প্রকাশ করার শক্তি আমার নেই বলে লজ্জা অনুভব করছি।

নন্দকুমার চৌধুরী লেনে আপনার 'লোমহর্ষণ' নাটকটা শুনেছিলাম কিনা মনে নেই, যখন মনে নেই—তখন ওটাতে হয়ত 'লোমহর্ষণই' হয়েছিল 'প্রাণহর্ষণ' হয়নি। হলে নিশ্চয় মনে থাক্‌তো। তার জন্য দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখ্‌ছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—'মুক্তির ডাক'। পড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখ্‌তে বলেছিলেন। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জ্বলতর করে দেখানোর মতো আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র,:তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি'আমার নেই।

আপনার 'মুক্তির ডাক'-এর পর আমি 'অজগর মণি' ও 'কাজল লেখা' পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকিনি, যাকে পেয়েছি তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালি যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধহয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমায় তিনখানা 'বাসন্তিকা' দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি 'সেমিরেমিস,' 'ইলা' ও 'স্মৃতির ছায়া কি ছাপ' পড়ি। 'সেমিরেমিস পড়ে কি যে আনন্দ পেয়েছি—তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হ'য়ে উঠতো। এ ঈর্ষা এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হইনি একটুও—দুঃখিত যতই হই।

ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। এতবড় সৃষ্টি!—দুঃসাহসের দিক থেকে বলছিনে—এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বলছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এতো বিচলিত করেনি।···আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায়, কিন্তু তার সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ-সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগা মনে করছি।

আমার ভয় হয়, উকিল মন্মথ সেমিরেমিসের মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে। 'ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।···

আমি ইঙ্গিত দিতে কী পারবো আপনার মতো শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয় 'তাজমহল' সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা সত্যিকার তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেমিরেমিসের স্রষ্টাকে এ লিখ্‌তে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মত জান্‌লে খুশি হব।

'নওরোজ' বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—তবে তিনি 'নাজিরুল', নজরুল নন,—আকার-ইকারের দণ্ড ধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভালো লেখা পড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন। সত্যিই অনেক বক্‌লাম—আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেলো। তবে বকাটা বড্ড তাড়াতাড়ি হলো—তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

'নবনাটিকা' দর্শনাকাঙ্ক্ষী

নজরুল ইস্‌লাম

P. S—আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরী করলে চলবে না। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

এই যে সাহিত্যিক উদারতা—একজন অজ্ঞাত অখ্যাত লেখকের

রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে সাহিত্য-সমাজে এমন করে বরণ করে নেওয়া, নিজের প্রাণামৃতে এমন করে অভিষিক্ত করা—সাহিত্যের শিখরদেশ থেকে চলমান পৃথিবীর এক অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পীকে বুকে টেনে তোলা—এই ঔদার্য,—এই মহিমা, বিশেষ করে সাহিত্য-সমাজে এতই বিরল যে আমি চিরদিন অবাক হয়েছি, আজও অবাক হই।

শুধু তাই নয়, এরপর ওই ১৯২৭ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন মনোমোহন থিয়েটারে আমার পঞ্চাঙ্ক নাটক 'চাঁদ সদাগর' মঞ্চস্থ হয়, তখন তা দেখে সঙ্গীত রচনায় অক্ষম এই নাট্যকারের হাত দু'খানি ধরে তদানীন্তন জনপ্রিয়তম ঐ কবি নজরুল একদিন আমায় বললেন, 'আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়ে গান না লিখিয়ে নিলে আমার অভিমান হবে।'

এই আন্তরিক স্নেহেই তিনি আমার 'মহুয়া'র কণ্ঠে গান দিয়েছিলেন। আমার 'কারাগার'-এর জন্য শুধু গান রচনা করেই ক্ষান্ত হননি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পরমোল্লাসে তাতে স্বয়ং সুর যোজনাও করেছেন। আবার 'সতী' ও 'সাবিত্রী' নাটকের গীত-সম্ভারও তাঁরই মহাদান।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাসে নজরুলের অমৃত-নির্ঝর অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো। দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে কবির আরোগ্যের জন্য দেশবাসীর সকল কামনা, সকল প্রার্থনা, সকল প্রয়াস ব্যর্থ হলো। তাঁর কোনো ঋণই শোধ করবার কোনো সুযোগ পেলাম না। অক্ষম আমি। তবু ঋণ শোধের একটি ক্ষীণ চেষ্টা না করে পারলাম না। বাংলার এই কবি দুলালের মহিমময় পুণ্য জীবনী জনসাধারণের মধ্যে প্রচারই হলো আমার জীবনের মহাব্রত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার প্রযোজকরূপে আমার রচিত ও পরিচালিত তথ্যচিত্র 'বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম' কবির উদ্দেশ্যে আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের সেই শ্রদ্ধার্ঘ।

দু'টি ছোট গল্প

নলিনীকান্ত সরকার

দু'টি হিন্দুস্থানী পথচারী ভিখারী—একজন পুরুষ, অপরটি নারী—হারমোনিয়ামের সঙ্গে উর্দু গজল গেয়ে উর্ধ্বমুখে চলেছে সারা পল্লীতে মধু বর্ষণ করতে করতে। নজরুলের একান্ত আগ্রহে আমার বৈঠকখানায় তাদের ডেকে এনে গান শোনার ব্যবস্থা হলো। অনেকগুলি গান শুনিয়ে তারা বিদায় নিলো।

নজরুল তক্ষুণি বসলেন গান লিখতে। তাদের 'জাগো পিয়া' গানটির রেশ তখনও আমাদের কানে যেন ধ্বনিত হচ্ছে।

এই গানের সুর অবলম্বন করে নজরুল কয়েক মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন—'নিশি ভোর হলো জাগিয়া, পরাণ পিয়া' গানটি।

তাঁর গজল গান লেখার শুরু এইখান থেকে। গজল গানের নেশা তাঁকে যেন পেয়ে বসলো। অসি ছেড়ে এই বাঁশী ধরবার জন্য কয়েকজন উগ্রপন্থী ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করেছিলেন যথেষ্ট। রসের সন্ধান পেলে কবিপ্রাণের অপ্রতিহত গতিমুখে সকল বাধাই তৃণখণ্ডের মতো ভেসে যায়। এ ক্ষেত্রেও তাই হলো। নজরুল এ জন্য কয়েকজন চরমপন্থী রাজনীতিকের বিরাগভাজন হয়ে পড়লেন।

স্বার্থবিমুখ নজরুল কোনদিনই পরার্থপরতায় পরাঙ্মুখ ছিলেন না। মাত্র একটি ঘটনার কথা বলি।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি দুঃস্থা কন্যার বিবাহ। কোনরূপে দায় নির্বাহ করবার আয়োজন চলেছে।

কন্যাপক্ষ নজরুলের পরিচিত।

একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে নজরুল তাঁর গাড়ী নিয়ে আমার কাছে

উপস্থিত। এসে বললেন, 'তোমার এখন কোনো কাজ আছে? একটু এসো না আমার সঙ্গে।'

'কোথায় যাচ্ছো?'

নজরুল প্রথমে কিছুই ভাঙলেন না।

গাড়ী সটান চৌরঙ্গী অভিমুখে চলে থামলো 'বেঙ্গল-স্টোরস্'-এর সামনে। 'বেঙ্গল-স্টোরস্'-এ নেমে তখন তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করলেন আমার কাছে।

হিন্দু-বিবাহের লৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে নজরুলের বিশেষ পরিচয় ছিলো না, সেইজন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসা।

'বেঙ্গল-স্টোরস্' থেকে নজরুল ফুলশয্যার তত্ত্বের বহু জিনিস কিনলেন। গাড়ী বোঝাই সেই সকল সামগ্রী কন্যার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।

মানুষ-নজরুল

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার কাছে কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক বড়ো। একই দেশে আমাদের বাড়ী, একই জল-হাওয়ায় আমরা মানুষ হয়েছি, নজরুল আমার সহপাঠী, বাল্যবন্ধু। তাকে যখন আমি ভালবেসেছিলাম, অনেক বন্ধুর মাঝখান থেকে আমরা যখন একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, তখন আমরা কেউ সাহিত্যের ধারও ধারতাম না।

আমি সেই নজরুলকে চিনি যে-নজরুল ইকড়া গ্রামের বাবুদের বাড়ী বাসন্তীপূজোর সময় ভাঙা প্রাচীরের উপর বসে যাত্রাগান শুনছে, যে-নজরুল 'লেটো'র দলে বসে ঢোলক্ বাজাচ্ছে, যে-নজরুল সুর করে রামায়ণ-মহাভারত পড়ছে।

যেখানে সাধু-সন্ন্যাসী নাঙ্গা-ফকির—সেইখানেই নজরুল। শুনেছে শিয়ারশোলের শিশু-বাগানের কাছে একটা গাছের তলায় একদল ফকির বসে আছে। আমাকে ডাকতে এলো।—চল দেখে আসি।

গিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।

ওদিকে তখন পশ্চিম-আকাশটা কালো হয়ে এসেছে। কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠলো। দু'জনে ছুটতে ছুটতে ফিরে আসছি। ওদিকটা ছিল তখন জনহীন বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। কাঁকর পাথরে হাঁটুর কাছে খানিকটা চামড়া ছড়ে গেলো, খানিকটা রক্তও পড়লো। নজরুল তার নিজের কাপড় দিয়ে চেপে ধরলো জায়গাটা। তার কাপড়টা রক্তে ভিজে গেলো। বললাম, 'একি করলে?'

—'ও কিছু না। সাবান দিলেই উঠে যাবে।'

সেদিক দিয়ে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আমাকে তক্ষুনি সুস্থ করে তুলতে চায়। বললে, 'হাঁটতে পারবে?'

—'নিশ্চয় পারবো, চলো।'

ঝড়ের বেগ থেমে এসেছে। আমাদের আর দৌড়োতে হচ্ছে না।

নজরুল বললে, 'আমি একবার গাছে উঠে আম পাড়তে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আর একবার—এই দেখো, সাইকেল চড়া অভ্যেস করতে গিয়ে সাইকেলের চেনে কেটে গিয়েছিলো অনেকখানি।'

এ-সব কথার অবতারণা—আমাকে সান্ত্বনা দেওয়া। তখন বুঝিনি, কিন্তু এখন বুঝছি।

রাণীগঞ্জে তখন ওষুধের দোকান বলে কিছু ছিলো না। ডাক্তারের কাছেই ওষুধ পাওয়া যেতো। সাধনের দাদা সবে ডাক্তারী পাশ করে এসেছে। রাস্তার ধারেই সাধনের বাড়ী। নজরুল দাঁড়ালো সেইখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে কি হবে?

সামনের ঘরেই বসেছিলো সাধনের দাদা। সে তখন আমাদের দেখতে পেয়েছে।—'এই যে মাণিকজোড়? বাঃ, বেশ মানিয়েছে দুটিকে। একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান। আর-একটি কোথায়? সেই ক্রিশ্চান ছেলেটি? শৈলেন?'

নজরুলকে কথা বলার অবসরই দিচ্ছে না। ডাক্তার ভেবেছিলো আমরা সাধনকে খুঁজছি। বললে, 'সাধন বাজারে গেছে।'

নজরুল বললে, 'একটু টিন্‌চার আইডিন দেবেন?'

—'কি হবে?'

নজরুল আমার পা'টা দেখিয়ে দিলে।

ডাক্তার রসিকতা আরম্ভ করলে—'গাছে উঠেছিলে বুঝি? তা বেশ হয়েছে। হাত-পা ভেঙে গেলেই ভালো হতো। টিন্‌চার আইডিন লাগাতে হবে না। রাস্তার ধুলো খানিকটা ঘষে ঘষে ওখানে লাগিয়ে দাও—ভালো হয়ে যাবে।'

আমি তখন নজরুলের হাত ধরে টানছি।

ডাক্তার বললে, 'না ভাই, টিন্‌চার আইডিন নেই আমার কাছে।

এই তো সবে ডাক্তারী পাশ করলাম। ডাক্তার হয়ে বসি, তখন ওষুধপত্র সবই পাবে।'

নজরুলকে রাস্তায় টেনে এনে বললাম, 'টিন্‌চার আইডিন আছে আমাদের বাড়ীতে।'

নজরুল বললে, 'গিয়েই লাগিয়ে নাওগে। আর-একটা খুব ভালো ওষুধ আমি জানি। কাল দেবো।'

—'তাই দিও। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। দেরি হলে বকাবকি করবে। আমি পালাই।'

দু'জনে খুব কাছাকাছি থাকি। নজরুল গেল তার সিয়ারশোল স্কুলের মোহমেডেন্‌ বোর্ডিং-এ। খড়ে ছাওয়া মাটির একখানি ছোটো ঘর। পাঁচজন মুসলমান ছাত্রের খাবার-থাকবার জায়গা। আর আমি গেলাম আমার আস্তানায়। রায়-সাহেবের প্রকাণ্ড লাল-কুঠির নীচের তলার একখানা ঘরে।

পায়ে টিন্‌চার আইডিন লাগালে ভালো হতো। কিন্তু দোতলায় বাড়ীর গিন্নির কাছে গিয়ে চাইতে হবে। সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ উঠে গিয়েও নেমে এলাম। এই মেয়েটির ভয়ে আমাকে সব সময়েই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়। এইটি আমার জীবনে সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। টিন্‌চার আইডিন কেন চাইছি বলতে হবে। হাঁটুর কাছে ছড়ে যাওয়া জায়গাটা দেখাতে হবে। আছাড় খেয়েছি বললে সে বিশ্বাস করবে না। বিশ্রী একটা অপবাদ রটিয়ে সারা বাড়ীতে একটা হৈ-চৈ না বাধিয়ে ছাড়বে না। যার একটা বন্ধু মুসলমান আর একটা ক্রিশ্চান, সে কখনও ভালো ছেলে হতে পারে না।

তার চেয়ে কাজ নেই টিন্‌চার আইডিন লাগিয়ে।

একটা লণ্ঠন নিয়ে পড়তে বসলাম।

খানিক পরেই দেখি নজরুল এসে দাঁড়ালো। তার দু'হাত ভর্তি অনেকগুলো নিমের পাতা। বললে, 'এইগুলো বেশ ক'রে বেটে ওইখানে লাগিয়ে নাও। ব্যথা-বেদনা কিছু থাকবে না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'রাত্রে নিমপাতা কোথায় পেলে ?'

—'নিমগাছ খুঁজতেই তো দেরি হয়ে গেল। শেষে মনে পড়লো ক্রিশ্চানদের কবরখানার মুখে সেই বড় নিমগাছটার কথা।'

দিনের বেলাও সে নির্জন জায়গাটার কেউ ত্রিসীমানা মাড়ায় না, ভয়ে গা ছম্ ছম্ করে।

বললাম, 'এই অন্ধকারে তুমি ওই গাছটায় উঠতে গেলে কেন ? গাছটায় ভূত আছে।'

নজরুল বললে, 'তোমার মুণ্ডু আছে।'

এই ব'লে সে হাসতে হাসতে চলে গেলো। জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলো আমি আইডিন লাগিয়েছি কি না।

ভালই হলো, আমি বেঁচে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতে পারতাম না।

আবার না ফিরে আসে, তাই দোরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

না, ফিরে সে এলো না। শুধু দেখলাম তার কাপড়ে আমার রক্তের দাগটা তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে।

এই নজরুল !

চওড়া বুকের ছাতি, বড়ো বড়ো চোখ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর দেহ। মাথার চুলগুলো কিছুতেই বাগ মানছে না।—এই যা দুঃখ। আমার মাথার চুল খুব সুন্দর। কেমন ক'রে সুন্দর হলো বুঝতে পারি না। লোকে ভাবে, বুঝি মাথায় বড়ো বড়ো বাবরি চুল আমি সখ করে রেখেছি। কিন্তু তা নয়। চুল কাটবার পয়সা পাই না, এমন কি আঁচড়াবার একটা চিরুনি পর্যন্ত নেই।

নজরুল বলে, 'তোমার অমনি চুল কেমন ক'রে হলো তাই বলো।'

আমরা তখন পনেরো-ষোলো বছরের কিশোর বালক। রাণীগঞ্জে থাকি। দু'জন দুটো ইস্কুলে পড়ি, কিন্তু থাকি খুব কাছাকাছি। এক পুকুরে স্নান করি, সাঁতার কাটি, আম, জাম, কামরাঙা গাছ থেকে পেড়ে

নুন দিয়ে দিয়ে খাই, একসঙ্গে বেড়াতে যাই, সুখ-দুঃখের গল্প করি। অন্য বন্ধু আছে অনেক। তাদের ভেতর একমাত্র ক্রিশ্চান বন্ধু শৈলেন ছাড়া আর কেউ বড়ো একটা আমাদের সঙ্গে মেশে না। আমাদের জগৎ যেন সম্পূর্ণ আলাদা।

নজরুল ছোটো ছোটো গল্প লেখে, আমাকে শোনায়। আমি কবিতা লিখি—নজরুলকে শোনাই। আর-কাউকে শোনাতে ইচ্ছে করে না। শোনালে বিশ্বাস করে না। বলে, ও আমাদের নিজের লেখা নয়। কোথাও থেকে চুরি করেছি।

একমাত্র শৈলেন শোনে মাঝে-মাঝে। শোনে আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে। বলে, 'ওগুলো ছিঁড়ে ফেলে দাও। কিছু হয়নি।'

আমাকে রাগায়। বলে, 'ওই জন্যেই বুঝি চুল রেখেছো? চুল রাখলেই কবি হয় না।'

নজরুলকে বলে, 'তুমি গল্প লিখে কোনোদিন বঙ্কিমচন্দ্র হবে না। এই আমি ব'লে রাখছি।'

শৈলেনের কথায় আমরা রাগ করতাম না। শৈলেন ছিলো আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আজ আর ইহজগতে নেই।

কিন্তু যাবার আগে সে দেখে গেছে—আমরা আমাদের পেশা বদলে নিয়েছি। আমি লিখছি গল্প, নজরুল লিখছে কবিতা।

মাঝখানে কিছুদিনের জন্য নজরুল ছিলো করাচিতে।

শৈলেন আর আমি সেই ফাঁকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ ক'রে কলকাতায় এসেছি।

নজরুল এলো করাচি থেকে। হলো সৈনিক-কবি।

তার কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। গান লিখছে, গান গাইছে, সভায় সমিতিতে, বাড়ীর আড্ডায়, ছেলেদের হোস্টেলে নজরুলকে নিয়ে টানাটানি চলছে। তার মুহূর্তের অবসর নেই।

আমাদের দেখে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আড্ডা ছেড়ে পালিয়ে আসে।

সেখানে সত্ত-পরিচিত স্তাবক আর অনুরাগীর দল। মার্জিত রুচি শিক্ষিত মানুষের মজলিস। সংখ্যায় অগণ্য।

আর এখানে আমরা নগণ্য মাত্র তিনজন। নজরুল, আমি আর শৈলেন।

আবার যেন আমরা সেই পুরোনো দিনে ফিরে যাই। এখানে কবি ব'লে নজরুলের আলাদা কোনও সম্মান নেই। সবাই এখানে অবারিত, অনর্গল এবং নিরাভরণ। শান্তিপুরী পোশাকী ভাষায় কথা বলা তখনও ভালো রপ্ত হয়নি। আমাদের জন্মভূমি সেই রাঢ় অঞ্চলের প্রচলিত মাতৃভাষায় প্রাণখুলে কথা ব'লে আর হো হো ক'রে হাসে।

এমন সব কথা, এমন সব গল্প, যা ওখানে বলা চলে না, নজরুল এখানে তাই বলে। যে গানটি তার সবচেয়ে প্রিয় সেই গানটি শোনায়। যে কবিতাটি সবে লিখেছে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করে।

শৈলেন বলে, 'যাক্, এতদিন পরে আমার কথাটা আমি withdraw ক'রে নিলাম। তবে withdraw করবার দরকার হতো না যদি না তোমাদের লেখা হুটো তোমরা পাল্টা-পাল্টি ক'রে নিতে। তুমি যদি গল্প লিখতে, আর শৈলজা যদি কবিতা লিখতো তাহলে তোমরা হুজনেই মরতে।'

আমি বললাম, 'নজরুল এখনই-বা বেঁচে আছে কোথায়? সবাই হৈ-হৈ করছে, টানাটানি করছে, বলছে—গান গাও, কবিতা শোনাও। বাহবা দিচ্ছে, প্রশংসা করছে।···কিন্তু কি খেয়ে কেমন করে ও বেঁচে আছে সেদিকটা কেউ দেখছে না। একটা পয়সা আসছে না কোথাও থেকে। কি কষ্টে যে ওর দিন চলছে তা আমি জানি। যে গল্পগুলো ও লিখেছিলো তার কপিরাইট বেচার জন্মে বসে আছে। তাও তো আফজল্ বল্‌ছে একশো টাকার বেশি দেবে না।'

এই কথাগুলো কেউ শোনে নজরুল তা পছন্দ করে না। হে হে ক'রে হাসে আর অর্গ্যানের স্থর তুলে আমার কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে।

আমি তিরস্কার করলাম নজরুলকে।—'হে হে ক'রে হাসছে দেখো। যারা হু'পেয়ালা চা খাইয়ে সারাদিন তোমাকে গাধার মত খাটিয়ে নেয় তাদের বলতে পারো না?'

নজরুল বলে, 'তাদের কি বলবো? আচ্ছা বোকা তো!'

—'তাদের বলবে তুমি যাবে না, তোমাকে লিখতে হবে। টাকার দরকার। হুটো কবিতা লিখলে কুড়িটা টাকা তো পাবে।'

শৈলেন বললে, 'ও বলবে, তবেই হয়েছে। টাকার কথা ও কখ্খনো কাউকে বলতে পারবে না। মাথার চুলের হুঃখু ছিলো ওর চিরকাল। এখন চুলগুলো বাগিয়েছে, কবি-কবি চেহারা হয়েছে, ব্যাস, ওইতেই খুশি।'

নজরুল চুলের প্রশংসায় ভারি খুশি। বললে, 'শৈলজার মতো হয়েছে?'

আমি বললাম, 'আমি এবার চুলগুলো কেটে ফেলবো কিন্তু।'

নজরুলের খুব আপত্তি।—'না না, কাটবে না।'

শৈলেন বলেছিলো, 'তা না হয় কাটবে না। কিন্তু তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তোমার ওই চুলগুলোকে জটা ক'রে ফেলতে হবে। তারপর সারা গায়ে ছাই মেখে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকবে। ত্রিশূল একটা আমি তৈরী করিয়ে দেবো। সত্যি বলছি, দোহাই তোমার, মহাদেব হবার চেষ্টা কোরো না। সব ব্যাটা সমুদ্র মন্থন ক'রে অমৃতটুকু লুটে নিয়ে তোমার হাতে তুলে দেবে বিষ। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থেকো না। আমরা সহ্য করতে পারবো না।'

নজরুলকে নিয়ে এমনি রসিকতা করতো শৈলেন।

নজরুল হো হো ক'রে হাসতো আর বলতো, 'আমি হবো না বো না হবে। না তাপস, যদি না পাই তপস্বিনী। মহাদেব হবো কেমন করে? পার্বতী কোথায় পাবো?'

শৈলেন বলতো, 'বাবুদের অন্দরমহল থেকে যেরকম ঘন-ঘন ডাক আসছে তোমার—পার্বতী একটি জুটে যাবে ঠিক।'

আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি।

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

সে যে চায় না কিছুই। যে চায় না সে পায় না।

নজরুল চেয়েছিলো শুধু আনন্দ। সে তার অন্তরের ভিতর থেকে স্বতঃ উৎসারিত পরমানন্দ। টাকা নয়, পয়সা নয়, ক্ষুধার অন্ন নয়, পার্থিব কোনো সম্পদ নয়, সুর-সুন্দরের কাছ থেকে সে আনন্দ তার আপনিই আসে। সেই আনন্দে সে দিন-রাত মশগুল হয়ে থাকে।

'আপন গন্ধে ফিরি মাতোয়ারা কস্তুরীমৃগ সম!'

সেদিন তার খাবার সময়আমিতার আস্তানায় গিয়ে পড়েছিলাম

বাইরে কয়েকজন ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে; তাকে কোথায় যে নিয়ে যাবে। শেয়ালদা স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

খেতে বসবার আগে নজরুল আমাকে বললে, 'খাবে?'

আমি বললাম, 'না।'

কাছে গিয়ে দেখলাম কাঁচের একটি ডিসের উপর কয়েক মুঠো ভাত, একটি প্লেটের উপর তিন টুকরো মাংস আর একটুখানি ঝোল।

যে দুটো ডেকচিতে রান্না হয়েছিলো সে দুটো খালি পড়ে রয়েছে তাতে আর অবশিষ্ট কিছু নেই।

বিশ-পঁচিশ বছরের যে ছোকরাটি রান্না করে সে এক গ্লাস জল এনে নামিয়ে দিলে নজরুলের হাতের কাছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি খাবে না? নেই তো কিছু।'

লোকটি বললে, 'আমি হোটেলে খেয়ে নেবো।'

নজরুল ব'লে উঠলো, 'কেন, হোটেলে খাবে কেন?'

লোকটি বললে, 'আপনি তখন আপনার বন্ধুকে খাই দিলেন যে।'

এতক্ষণে মনে পড়লো নজরুলের। বললে, 'ধেৎ, সে আমা বন্ধু কেন হবে? সে এসেছিলো আমার কাছে টাকা ধার করতে

আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললে, 'আমার নাম-টাম শুনে লোকটা ভেবেছে আমার মেলা টাকা।'

—'তাই বুঝি তাকে খাইয়ে বিদায় করলে?'

নজরুল বললে, 'না না, দেখলাম বেচারার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। বললে, দু'দিন ভাত খাইনি।'

বললাম, 'তাকেই তো পয়সা দিয়ে হোটেলে পাঠাতে পারতে?'

নজরুল বললে, 'দশ টাকার একটি নোট ছাড়া আমার কাছে কিছু ছিলো না যে। টাকা পয়সাগুলো আমার কাছে আসতেও চায় না, থাকতেও চায় না। আমার সঙ্গে কী শত্রুতা যে আছে তাদের কে জানে।'

—'সেই দশ টাকার নোটটি তাকে দিলে বুঝি?'

নজরুল বললে, 'হুঁ। ভারি লজ্জা করছিলো। চেয়েছিলো একশো টাকা, দিলাম মাত্র দশটি টাকা।'

রাঁধুনী ছোক্‌রাটি দাঁড়িয়েছিলো একটু দূরে। তাকে দেখিয়ে বললাম, 'এখন ওকে কি দেবে দাও।'

নজরুল নিতান্ত অসহায়ের মতো তাকালে আমার দিকে।

একটি টাকা সেই ছোক্‌রাকে আমি দিতে গেলাম। সে নিলে না কিছুতেই। বললে, 'টাকা আছে আমার কাছে।'

নজরুলের মুখে হাসি ফুটলো।—'এই দেখো, সবাইকার কাছে টাকা থাকে, আমার কাছে থাকে না।'

ছোক্‌রাটি বললে, 'হোটেলে আমাকে খেতে হতো না, যা রান্না করেছিলাম ওতেই কুলিয়ে যেতো, কিন্তু তিনজনের খাবার লোকটা একাই খেয়ে ফেললে।'

নজরুল ধমক দিলে।—'ধেৎ, ওরকম করে বলতে নেই। আমি ওর মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম বেচারার খুব খিদে পেয়েছিলো। খেয়েছে বেশ করেছে।'

খাওয়া শেষ করে হাত-কাটা ফতুয়ার উপর বাসন্তী রঙের চাদরটি

গায়ে দিয়ে চটি পরে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যাচ্ছিল নজরুল, আমাকে বললে, 'চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

বললাম, 'খুব হয়েছে। তুমি যাবে পশ্চিমে, আমি যাবো পূবে।'

নজরুল বললে, 'গাড়ী এনেছো তো! মোটরকার?'

মোটরকার এলে আর রক্ষে নেই। যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারো।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল—এই মোটরে চড়ার শখটা তার গেলো না কিছুতেই। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহান্নমে নিয়ে যায় তো ও তক্ষুনি যেতে রাজী হয়ে যাবে।

একদিন হয়েছে কি, বিকেলে শৈলেনদের বিডন স্ট্রীটের বাড়ীতে বসে বসে গল্প করছি শৈলেনের সঙ্গে, এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে নজরুল ঢুকলো। আমাদের কাছে হাত পেতে বললে, 'চারটে টাকা দাও। বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।'

রাস্তায় গিয়ে দেখলাম, ট্যাক্সির ভাড়া ঠেছে পাঁচ টাকা। নজরুলের পকেটে ছিলো মাত্র একটি টাকা। সেই টাকাটি ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছে, 'টাকা আনছি, তুমি দাঁড়াও।'

ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে শৈলেন বললে, 'এই টাকাটা তোমাকে আমি ধার দিলাম। ফিরিয়ে দিয়ে যেয়ো। যদি না দাও তো তোমার গলায় গামছা দিয়ে আমি আদায় করবো।'

তার সেই প্রাণখোলা হাসি হাসতে হাসতে নজরুল এসে বসলো তার নিজের জায়গায়। মানে অর্গ্যানের সামনে। বললে, 'তুমি তো খৃষ্টান ছিলে, হিঁদু হলে কবে?'

শৈলেন বললে, 'হয়েছি তোমার জন্যে।'

—'তা বেশ করেছো। সেই রাণীগঞ্জ থেকে ধরলে অনেক টাকা তুমি পাবে আমার কাছ থেকে। হিসেব করে রেখো। আপাততঃ দু'পেয়ালা চা দাও।'

শৈলেন জিজ্ঞাসা করলে, 'দু'পেয়ালা কেন?'

নজরুল বললে, 'লাখ পেয়ালা চা না খেলে চালাক হয় না। লাখ পেয়ালা হতে আমার এখনও দু'পেয়ালা বাকি আছে।'

শৈলেন বলেছিলো, 'লাখ পেয়ালা চা খেয়ে চালাক তুমি হবে কিনা জানি না, কিন্তু মদ্যপান যদি করতে পারো তো নিঘ্‌ঘাৎ মাইকেল মধুসূদন হয়ে যাবে—সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি।'

আমাদের দুর্ভাগ্য, শৈলেন অনেকদিন হলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। নজরুল আজ সত্তর বছরের বৃদ্ধ। সারাজীবনে সে মদ্যপান দূরের কথা, ধূমপান পর্যন্ত করলে না। কাজেই সে মাইকেল হলো কিনা শৈলেন দেখে যেতে পারলে না।

কিন্তু যা সে হয়েছে তাই-বা ক'জনে হতে পারে?

যা সে পেয়েছে তাই-বা ক'জন পায়?

কবি এবং গীতিকার নজরুল সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাই দেশবাসীর কাছ থেকে পেয়েছে সে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর প্রণতি।

একদিকে জীবন-দেবতার কাছ থেকে পেয়েছে সে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ আর অপরিমাণ যন্ত্রণা।

কবি নজরুলের চেয়ে মানুষ-নজরুল অনেক—অনেক বড়। শিশুর মতো সরল, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, নিরহঙ্কার, এমন অজাতশত্রু, হৃদয়বান এবং আনন্দময় পুরুষ এ যুগে সচরাচর দেখা যায় না।

শৈলেন একদিন হাসি-রহস্য করে বলেছিলো, 'তুমি মহাদেব সেজে ছাই মেখে বোম্‌ বোম্‌ করে পথে পথে ঘুরে বেড়াও।'

আজ শৈলেনের সেই কথাটা মনে পড়ছে। বলেছিলো সমুদ্র মন্থনের অমৃতটুকু নিজেরা নিয়ে বিষটুকু তুলে দেবে তোমার হাতে। সেই বিষ খেয়ে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে থাকবে।

তাই হয়েছে। আজ শৈলেন নেই, কিন্তু তার কথাটা সত্য হয়ে গেছে। নজরুল নীলকণ্ঠ হয়ে ধ্যানমগ্ন তপস্বীর মতো চুপ করে বসে আছে।

নজরুলের সঙ্গে

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

তখন আমি আই. এ ক্লাসের ছাত্র, ঢাকা কলেজে পড়ি। সাহিত্যের নেশায় পাঠ্যপুস্তকের চাইতেও অপাঠ্য পুস্তক অধ্যয়নের মনোযোগটা বেশী। 'আল-এসলাম', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' ও আরও দু'একটি পত্রিকায় দু'একটা প্রবন্ধ তখন আমার বেরিয়েছে। মোট কথা, সাহিত্যিক হবার মকশ প্রাণপণেই চলেছে। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন এক পত্রিকায় একটা অদ্ভুত লেখা চোখে পড়লো। লেখাটার নাম: 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'—লেখক: হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। লেখাটা এত সুন্দর লাগলো যে, এই হাবিলদার নজরুল ইসলাম কে, তা জানবার জন্য অধীর হয়ে উঠলাম। প্রথম লেখাই যাঁর এত সুন্দর, পরবর্তীকালে তাঁর লেখা যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলে গণ্য হবে এ-ধারণা আমার মনে দৃঢ়মূল হয়ে রইলো।

আমার এক নিকট-আত্মীয় বললো, 'আমাদের বাড়ীতে থেকে দরিরামপুর স্কুলে পড়ত এক কাজী নজরুল ইসলাম—সে নয়তো? কিন্তু সে তো 'হাবিলদার' ছিলো না। তবে তার বাতিক ছিলো গান করা, কবিতা লেখা আর অট্টহাস্য করা। পাঠ্য বই কেনবার তার পয়সা ছিলো না, সহপাঠীদের নিকট থেকে একদিন-দু'দিনের জন্য বই ধার নিতো এবং সারা রাত জেগে পড়তো। তবু পরীক্ষায় কিন্তু সে বরাবর হতো ফার্স্ট। কিন্তু হাবিলদার সে হবে কেমন করে?'

আমি বললাম, 'তুমিও যেমন। দরিরামপুর স্কুলের পড়ুয়া হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, এ কি একটা কথা হলো?'

কিছুদিন পরে ঢাকা থেকে কলকাতা গিয়ে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলাম এবং ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-

সমিতি'র অফিসে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে দিলাম। সাহিত্য-সমিতির সহ-সম্পাদক মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদের সাথে এবং কলকাতার আরো অনেক সাহিত্যিকের সাথে ক্রমে আলাপ-পরিচয় হলো। মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদকে একদিন নজরুল ইসলামের কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন: 'আরে, নজরুল ইসলাম আজই করাচী থেকে এখানে আসছেন যে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি এখানে এসে পৌঁছবেন।'

অধীর আগ্রহে নজরুল ইসলামের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে প্রতীক্ষার শেষ হলো—নজরুল এলেন। সৈনিক বেশ, কাঠখোট্টা চেহারা, দাড়ি-গোঁফ গজায়নি, এক কিশোর খন্‌খনে অট্টহাসিতে ঘর মুখরিত ক'রে আমাদের কাছে এগিয়ে এলেন। অপেক্ষমান সকলের সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয় করিয়ে দিলেন মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ। আমার পরিচয় জেনে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন এবং বললেন: 'আরে আপনি। 'মহাশ্মশানে'র নিন্দাকারীর প্রতিবাদ আপনিই করেছিলেন? আমি ভেবেছিলুম ইয়া লম্বা-দাড়ি কোনো প্রবীণ লোক আপনি হবেন। এখন দেখছি, হয়ত আপনি এখনো কলেজের ছাত্র।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ি।'

তারপর অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা হলো। সাহিত্য ছাড়া তাঁর মুখে অন্য কোনো কথা ছিলো না। কথায় কথায় বললেন যে, কলকাতায় থেকে তিনি একনিষ্ঠভাবে সাহিত্য-চর্চা করবেন।

সাহিত্য-সমিতি অফিসেই তিনি আস্তানা গাড়লেন। তাই প্রায় প্রতিদিনই তাঁর সাথে দেখা হতো। ক্রমে সাহিত্য-সমিতির নজরুলের বাস-কক্ষটি সাহিত্যিকদের একটা আড্ডা হয়ে উঠলো। মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কাজী আবদুল ওদুদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে প্রতিদিন সেখানে সাহিত্যের নেশায় সমবেত হতেন। নানা আলোচনায়, গল্পে, গানে আসর গুলজার হয়ে উঠতো

তারপর কিছুদিন আমি বাড়ীতে ছিলাম। হঠাৎ একদিন মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর আহ্বানে কলকাতায় গিয়ে হাজির হলাম এবং দৈনিক 'মোহাম্মদী'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগ দিলাম। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তখন দৈনিক 'মোহাম্মদী'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। সম্পাদকীয় দফতরে তখন আরো লোকের প্রয়োজন। একদিন ওয়াজেদ আলী বললেন, 'নজরুল আবার কলকাতায় এসেছে। তাকে আমাদের এখানে আনলে কেমন হয়?'

আমি বললাম, 'খুব ভালো হয়। এক্ষুনি তাঁকে নিয়ে আসুন।'

নজরুল এলেন। তাঁর অট্টহাসিতে, গল্পে, গানে, আবৃত্তিতে আমাদের সম্পাদকীয় দফতর গুলজার হয়ে উঠলো। দুপুরের খাওয়াটা অফিসঘরেই সবদিন চলতো। নজরুলও তাতে শামিল হতেন। চাপাতি-কাবাব ছিলো আমাদের প্রধান খাদ্য। তা-ই আমরা সকলে মিলে গোগ্রাসে গিলতাম। একদিন চাপাতি-কাবাবের সদ্ব্যবহার করতে করতে নজরুল হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'আপনার বাড়ী কোথায়?'

আমি বললাম, 'ময়মনসিংহে।

'কিন্তু ময়মনসিংহে কোথায়?'

'পাড়াগাঁয়ে। বর্ধমানের লোক আপনি, সে তো চিনতে পারবেন না।'

'চিনতে পারবো না মানে? আমি যে বহুদিন ময়মনসিংহের পাড়াগাঁয়ে ছিলাম।'

'কোথায় ছিলেন? আমার বাড়ী ধানীখোলা। চিনতে পারবেন?'

'চিনবো না কিরকম? আমি ওগাঁয়ে কতদিন গিয়েছি। কাজীর-শিমলার কাজী বাড়ীতে থেকে আমি যে দরিরামপুর স্কুলে পড়েছি।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার সেই আত্মীয়ের কথা মনে পড়ে

কি[illegible] বললাম, 'অপনি কি পরের কাছে বই ধার করে নিয়ে,

হলাম [illegible]গ পড়ে, পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে যেতেন?'

তিনি অট্টহাসি হেসে উঠলেন। বললেন, 'সে কথা জানলেন কি করে?'

আমি বললাম যে, তিনি কাজীর-শিমলায় যে বাড়ীতে থাকতেন, তারা আমার নিকট-আত্মীয়। তাদের কারুর মুখে শুনেছি।

তিনি বললেন, 'ঠিকই শুনেছেন। আপনার আত্মীয়টি ছিলেন তখন আসানসোলের দারোগা। আমার মেধা ও দারিদ্র তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক রুটির দোকান থেকে তিনি আমাকে উদ্ধার করে দেশে নিয়ে যান এবং পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দেন। আপনাদের দেশে ছিলাম মাত্র এক বৎসর। তারপরেই সেখান থেকে চলে এসে আমি পল্টনে নাম লেখাই।'

আমি বললাম, 'এত কাছে ছিলেন, অথচ আপনার সাথে আমার দেখাই হলো না—আশ্চর্য! আচ্ছা, আপনি ধানীখোলার কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন?'

'ধানীখোলায় গিয়েছিলাম এক ছাত্র-সভায়। শুনেছিলাম, একটি স্কুলের ছেলে নাকি এক নাটক লিখেছে এবং তা-ই সেখানে অভিনীত হচ্ছে। ভারী কৌতূহল হলো। দরিরামপুর স্কুলের সহপাঠীদের সাথে তাই দেখতে গিয়েছিলাম। ছাত্র-নাট্যকারটির সাথে পরিচিত হওয়ারও ইচ্ছা জেগেছিল।'

'পরিচিত হয়েছিলেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, আমার সহপাঠী রুস্তম আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।'

'অথচ এখন তাকে চিনতেই পারছেন না।'

'মানে? আপনিই তবে সেই ক্ষুদে নাট্যকার?'

আমি হেসে উঠলাম। তিনিও অট্টহাসিতে ঘর ভরিয়ে দিলেন। আমরা পরস্পর প্রীতিভরে করমর্দন করলাম।

নজরুল-সঙ্গলাভে দৈনিক 'মোহাম্মদী'তে আমাদের সময় বেশ আনন্দেই কাটছিলো; কিন্তু নিয়ম-কানুনের বাধা-নিষেধ মেনে চলা নজরুলের প্রকৃতিই নয়। অফিস-ডিসিপ্লিনকে তিনি বারবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ

দেখাতে লাগলেন। অফিসে একদিন আসেন তো তিনদিন আসেন না। কাজের খুব ক্ষতি হতে লাগলো। এমনি সময়ে একদিন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু-সংবাদ প্রকাশিত হলো। নজরুল ঝড়ের বেশে অফিসে এসে বললেন, 'সত্যেন সম্পর্কে আজকের আর্টিক্‌ল্ আমি লিখব কিন্তু।' আমরা খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম, 'নিশ্চয়ই আপনি লিখবেন। আপনি ছাড়া এ আর্টিক্‌ল্ আবার কে লিখবে?'

আর্টিক্‌ল্ তিনি লিখলেন এবং সকলকে পড়ে শোনালেন। খুবই সুন্দর লেখা। কিন্তু ওয়াজেদ মিয়া গোপনে আমাকে বললেন, 'এ লেখা কি করে আমাদের কাগজে প্রকাশ করা যায়।'

আমি বললাম, 'দু'চারটে শব্দ ও বাক্য পরিবর্তন করে প্রকাশ করলে কেমন হয়?'

ওয়াজেদ মিয়া বললেন, 'তা হয় বটে, কিন্তু নজরুল রাগ করে আবার চলে না যায়!'

সে আশঙ্কা খুবই ছিলো। তবু রাতে প্রুফ দেখতে গিয়ে লেখাটার কিছু কিছু পরিবর্তন আমাদের করতে হলো। পরদিন আমাদের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো: সেই সে নজরুল ডুব দিলেন আর আমাদের অফিস-মুখো কখনো হলেন না।

এখন যেটা এলিট সিনেমা আগে তার নাম ছিল ম্যাডান থিয়েটার্স প্যালেস অব ভ্যারাইটিস্ আর পাশেই ওয়াই ডব্লু সি এ। এখনও সেইখানেই ওয়াই ডব্লু সি এ আছে। এখানে এক সন্ধ্যায় এক আধা-রাজনৈতিক সভা, সেই সভায় নজরুল গান করবেন। আমাদের বয়স তখন কুড়ির নীচে। নলিনীকান্ত সরকারের সৌজন্যে এই সভার প্রবেশপত্র পেয়েছিলাম। সেইদিন সন্ধ্যায় নজরুল গাইলেন—কাণ্ডারী হুঁশিয়ার। মাইকের বালাই নেই, নজরুলের কণ্ঠস্বরও কিঞ্চিৎ কর্কশ ছিল, কিন্তু সেই গান, সেই কণ্ঠস্বর, সেই উন্মাদনা জীবনে খুব কমই মেলে। নজরুল গান গাইছেন—কে আছো জোয়ান, হও আগুয়ান···তখন সেই সভাগৃহের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। সভার শেষে সবাই ভেঙ্গে পড়ল কবিকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য, আর কবিও স্মিতহাস্যে সকলের সঙ্গে কথা বললেন। এই ছিলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম। তরুণ বাংলার নেতা সুভাষচন্দ্র আর কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম। তাই কল্লোল আয়োজিত সম্বর্ধনা সভায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সভাপতিত্বে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—আমরা যেদিন মার্চ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে যাব সেদিন আমাদের কণ্ঠে থাকবে কাজীর গান।

কাজী নজরুল ইস্‌লাম চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে আরো লক্ষ লক্ষ বাঙালীর মত মর্মাহত হয়েছিলেন। কল্লোলের সবাই শিয়ালদহ ষ্টেশনে হাজির ছিলেন সারারাত ফুলের মালা নিয়ে। কাজী লিখলেন অজস্র শোকগাথা যা পরে ‘চিত্তনামা’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে-সাম্প্রতিককালে এমন শোককাব্য বা এলিজি আর আছে কিনা জানি না।

কাজী নজরুল ‘কল্লোলে’ যেদিন আসতেন সেদিন কল্লোলে যেন

একটা উৎসবের আসর বসত কাজীকে কেন্দ্র করে। চলত গান, গল্প আর অনর্গল কবিতা আবৃত্তি। কতটুকু ঘর। কিন্তু কত বিখ্যাত বাঙালী সেই ঘরটিতে বসে সাংস্কৃতিক আলাপাচার করতেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

নজরুলই বোধহয় বাঙলা ভাষায় সর্বপ্রথম 'সর্বহারা' কথাটি চালু করেন। তাঁর এই নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হলে সাড়া পড়ে গেল। আর 'বিদ্রোহী'—এই কবিতা সেকালে কণ্ঠস্থ ছিল না এমন বঙ্গ-সন্তান বিরল, আবার অন্যদিকে কাজীর রচিত বাঙলা গজল 'কে বিদেশী বন-উদাসী বাঁশের বাশী বাজাও বনে।' এমন এক প্রাণরসে পরিপূর্ণ আনন্দময় পুরুষের কদাচিৎ আবির্ভাব ঘটে। কাজীর আবির্ভাবকালে বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি দিক্‌পালগণ স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আশ্চর্য, কাজী নজরুল এই সব ক'টি মানুষেরই প্রিয়জন, অন্তরের মানুষ। বাংলাদেশ কাজীকে পেয়ে ধন্য—আর দুর্ভাগ্য আমাদের যে ফুলের জলসায় তিনি আজ নীরব।

উন্নত শির

বিমল মিত্র

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের হল্‌-ঘরে গান-বাজনার আসর। হলের ভেতর দেদার লোক। এক-একজন নাম-করা গায়ক আসছেন আর গান গাইছেন। শ্রোতাদের মধ্যে তেমন কোনও সাড়া-শব্দ নেই। তারা নির্বিকার। এক-একজন গায়ক তো গান শেষ করবার সুযোগও পাচ্ছেন না। তার আগেই শ্রোতারা হাততালি দিয়ে তাঁদের তাড়িয়ে দিচ্ছে।

এমন সময় ঘোষণা হলো—নজরুল ইসলাম তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন।

সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর যতক্ষণ আবৃত্তি চললো ততক্ষণ আর কোথাও এতটুকু টুঁ-শব্দ নেই। বীর চললো শির উন্নত করে—

এই আমার প্রথম নজরুল দর্শন। আমার বয়েস তখন কুড়ি-বাইশ আর নজরুলের বোধহয় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সেই বয়সেই সুবিখ্যাত। মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া রুক্ষ বাবরি চুল। গায়ে একটা গেরুয়া চাদর।

এর পর মেগাফোন কোম্পানীর স্টুডিওতে। ছোটবেলায় আমার কোন সাহিত্যিক বন্ধু ছিল না। এরা সবাই ছিল গায়ক। গানের আসরেই দিন-রাত কেটে যায়। শচীন দেববর্মন, কুন্দনলাল সায়গল, অনুপম ঘটক, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, অনিল বিশ্বাস। ইউনিভার্সিটি ফেরতা চলে আসি অক্রুর দত্ত লেনের হিন্দুস্থান স্টুডিওতে। তারপর সেখান থেকে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফিরতে যার নাম মাঝ রাত্তির। ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ এলে তো কথাই নেই। অথচ

স্টুডিওতে আমার একটা ছোট্ট ভূমিকা আছে। আমি রেকর্ডের গান লিখি।

অনিল বিশ্বাস হিন্দী গজল রেকর্ড করলো মেগাফোনে। তার সঙ্গে আড্ডা মারতেই সেখানে যাই।

একদিন সেখানে গিয়ে দেখি নজরুল এক আর্টিস্ট্‌কে গানের তালিম দিচ্ছেন। সামনে আর্টিস্ট ছাড়াও আরো দশ বারো জন ভদ্রলোক। একবার গানের সুর শেখাচ্ছেন আর্টিস্টকে, আর সামনের একটা খাতার পাতায় গান লিখছেন। সামনে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা নজরুলকে বরানগরে না শিবপুরে কোথায় নিয়ে যেতে এসেছেন। সেখানে গিয়ে তিনি যে-গান গাইবেন সেই গানটাই তখন লেখা হচ্ছে। তখন মাত্র লেখা হচ্ছে, তারপর সুর দেওয়া হবে তাতে। আর তারপর তিনি সভায় গিয়ে সেটা গাইবেন। একাধারে অনেকগুলো কাজ একসঙ্গে চলেছে। একগাদা পান রয়েছে সামনের রেকাবিতে। এক-একবার পান মুখে পুরে দিচ্ছেন, আর পাশে রাখা পিক্‌দানিতে পিচ্‌ ফেলছেন।

এমন সময় কে একজন এসে জানালো অফিস ঘরে তাঁর টেলিফোন এসেছে। তিনি হন্ত-দন্ত হয়ে চাদর সামলাতে সামলাতে সেদিকে চলে গেলেন।

মনে হলো বীর চলেছে শির উন্নত করে—

এর পর একেবারে আমাদের পাড়ায়। আমারই এক বন্ধুর বাড়িতে নজরুলের গানের আসর। আমরা সবাই ছুটলুম। একা নজরুল নয়। তাঁর সঙ্গে উমাপদ ভট্‌চায্যি আর নলিনীকান্ত সরকার। সন্ধ্যে থেকে আসর শুরু হলো। রাত যখন বারোটা তখন বাড়ি চলে এলাম উমাপদ ভট্টাচার্য আর নলিনীকান্ত সরকারও চলে গেলেন। কিন্তু নজরুল রয়ে গেলেন। শুধু সেই রাতটাই নয়। তারপর পনেরো দিন ধরে নজরুল সে-বাড়িতেই রয়ে গেলেন।

অবিশ্রান্ত গান চলতে লাগলো। পনেরো দিন পরে বোধহয় কেউ এসে স্মরণ করিয়ে দিলে যে এটা তার বাড়ি নয়, তখন তিনি হারমোনিয়ম সহ বিদায় নিলেন। বীর চললেন শির উন্নত করে—

এই শেষবার।

এর পর আমিই বা কোথায় আর নজরুলই বা কোথায়! গ্রামোফোন রেকর্ডে তাঁর লেখা আর তাঁর সুর দেওয়া গান শোনা ছাড়া আর কোনও চাক্ষুষ সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া গানের জগৎ থেকে আমিও তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। বলতে গেলে কলকাতা শহর থেকেই তখন চির-বিদায় নিয়েছি। কিন্তু যখন আবার ফিরে এলাম তখন যুগ বদলে গেছে। মাইক্রোফোন লাউড্-স্পীকারের আবির্ভাব হয়েছে। সেই সায়গল, শচীন দেববর্মন, অনিল বিশ্বাস, অনুপম ঘটক, তাদের মধ্যে দু'জন আছে, দু'জন নেই। ফৈয়াজ খাঁ, আবদুল করিম খাঁ সাহেব, তাঁরাও চলে গেছেন। আমারও এবার যাবার পালা।

কিন্তু বীর এখনও শির উন্নত করেই চলেছে—

প্রার্থনা করি যেন বীরের শির চির-উন্নতই থাকে।

নজরুল-সাহিত্যে নূতন ভাবধারা

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা দ্বারা বাংলা সাহিত্যে একটা নূতন সুর বাজিয়া উঠে। তিনি কবিতা ও প্রবন্ধ দ্বারা বাংলা সাহিত্যে নূতন ভাবধারা আনয়ন করেন। তাঁহার সাহিত্যের তিনটি যুগ আছে: প্রথমটি জাতীয়তাপূর্ণ সাহিত্য; দ্বিতীয়, সাম্যবাদীয় সাহিত্য; তৃতীয়, তৎপরবর্তীকালের সাহিত্য, যাহা গজল প্রভৃতি গান প্রধান সাহিত্য।

তিনি বলিয়াছেন, 'অনেকেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন, 'ধূমকেতু'র পথ কি?…নীচে মোটামুটি 'ধূমকেতু'র পথনির্দেশ করছি।…সর্ব প্রথম, 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না। কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহরথী এক এক রকম করে থাকেন। পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা-নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে—সকলের আগে আপনাকে চিন্‌তে হবে।' এই স্থলে কবির জাতীয়তাবাদীর রূপের পার্শ্বে সামাজিক-বিপ্লববাদীর রূপ প্রকাশ পায়।

সাধারণভাবে যাহাকে 'জাতীয়তাবাদ' বলে তাহা তাঁহার লক্ষ্য নয়। তাঁহার এই আদর্শ 'ভারত ভারতবাসীর জন্য' এই বুলিতে পর্যবসিত হয় নাই। তাঁহার লক্ষ্য মানবের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি। এই জন্য তিনি কেবল রাজনীতিক পরিবর্তন চান নাই, সমাজকেও সম্পূর্ণ-ভাবে পরিবর্তিত করিতে চাহিয়াছেন।

এক সময় বোধ হয় তিনি কোনো কোনো ভূতপূর্ব বৈপ্লবিকের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহাদের অতীত কার্যের কাহিনী শ্রবণ করেন। এই সময়েই ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী

প্রকাশিত হয়। এই সময়েরই পুস্তক হইতেছে কবির 'কুহেলিকা'। এই পুস্তক অতি উচ্চ স্তরের সাহিত্য। এই নভেলে লেখক তথাকথিত হিন্দু সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিকের সহিত মুসলমান যুবকেরও দেশপ্রেমজনিত ত্যাগের অতি উচ্চাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। 'প্রমত্-দা'র নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতার জন্য জমিদার-পুত্র জাহাঙ্গীর প্রাণ বিসর্জন পর্যন্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প ও শেষে দ্বীপান্তর গমন, এই বর্ণনা গঙ্গা ও যমুনার মিলনের ন্যায় সুমহান হইয়াছে।

এই পুস্তকে কবি ভারতবর্ষ ও জাতীয়তাবাদের প্রচলিত অর্থের উর্ধ্বে উঠিয়াছেন। তাই তিনি বৈপ্লবিক নেতা প্রমথের মুখ দিয়া বলিতেছেন, 'আমার ভারত ও মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমার ভারতবর্ষ,—ভারতের এই মূক দরিদ্র নিরন্ন পর-পদ-দলিত তেত্রিশ কোটী মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দনতীর্থ; ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মস্‌জিদের ভারতবর্ষ নয়—এ আমার মানুষের—মহামানুষের মহা-ভারত।'

নিরন্ন পদ-দলিত, শোষিত লোকদেরই নিয়া যে ভারতবর্ষ, তাহা পরের যুগের কবির সাহিত্যে আরও পরিস্ফুট হয়। এই সময়ে কবিকে শোষিত সর্বহারাদের প্রতিভূরূপে দেখিতে পাই। তাঁহার বীণায় নূতন ঝঙ্কার ধ্বনিত হয়। তাই তিনি বলিতেছেন :

'সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।'

পুনঃ, এইরূপে তিনি 'কৃষাণের গান', 'ধীবরের গান', 'শ্রমিকের গান', 'সাম্যবাদের গান', 'মানুষের গান' প্রভৃতি গান তখনকার নব প্রতিষ্ঠিত 'লাঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। এই সব গানে তিনি গণ-শ্রেণীদের দুঃখের কথা, তাহাদের উপর উচ্চশ্রেণীদের শোষণের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। এই সব গানগুলি আজ সারা বাংলার সম্পত্তি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, তিনি বুর্জোয়া

সমাজের মাপকাঠি দ্বারা পাপ-পুণ্যের বিচার করাকে ঘৃণা করিয়াই বলিয়াছেন :

'যত পাপীতাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই
অন্যের পাপ গণিবার আগে নিজেদের পাপ গোণো।'

এই তর্ক ধরিয়াই তিনি আবার চোর-ডাকাতকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন :

'কে তোমায় বলে ডাকাত বন্ধু, কে তোমায় চোর বলে ?
চারিদিকে বাজে ডাকাতি ডঙ্কা, চোরেরি রাজ্য চলে।
ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।
যারা যত বড় ডাকাত দস্যু, দাগাবাজ,
তারা তত বড় সন্ন্যাসী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।'

এই সময়ে সাম্যের গান গাহিবার কালে তিনি গাহিয়াছেন :

'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান
যাহারা আনিল গ্রন্থ কেতাব
সেই মানুষেরে মেরে পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।
মূর্খরা সব শোনো মানুষ এনেছে গ্রন্থ,
গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।'

এই স্থলে সর্ব প্রথম বাংলা ভাষার বড় কবি চণ্ডীদাসের সে অমর বাণী 'শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপ নাই' তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। চণ্ডীদাসের প্রায় ছয় শত বৎস পরে বাংলা সাহিত্যে আবার সেই ধ্বনি উত্থিত হয়। আ আশ্চর্যের কথা, উভয় কবিই বীরভূমের মাটিতে উৎপন্ন। চণ্ডীদা সময়ের পর, বাংলা সাহিত্যের কত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে ; ক ভাব-বন্যার স্রোত তাহাতে আসিয়াছে, কিন্তু বর্তমানের গণসমু কবি নজরুল ইসলাম যে নূতন রূপ সাহিত্যে প্রদান করিয়াছেন ত অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয় থাকিবে।

শাক্তপদাবলীর কবি নজরুল   গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম মায়ের দামাল ছেলে। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্য নিয়ে বাংলা মায়ের কোলে আবির্ভূত হয়ে তিনি এইটিই প্রমাণ করেছেন যে, তিনি যথার্থই শাক্ত মায়ের শক্তিতে শক্তিমান সন্তান। তাঁর এই উদ্দাম প্রাণের, অপরিমিত সৃজনী শক্তির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা গানে—যার ভঙ্গীও বহু বিচিত্র : কখনো গজলের চটুল আবেশের ছোঁয়ায় মাতাল, কখনো দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় বিভোর, কখনো নানা রাগ-রাগিণীর তন্ময়তায় আনন্দ-বিহ্বল। আজকের বাংলা দেশ তাঁকে জানে এক অদ্বিতীয় সুরকার ও গীতিকার হিসাবেই এবং একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক কবিরূপে, যাঁকে স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও একদিন অভিনন্দিত করে স্বীকৃতি দিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু নজরুলের আসল পরিচয় আমাদের অগোচরেই রয়ে গিয়েছে, তাঁর ব্যক্তিসত্তার মর্ম-কেন্দ্রটি আমাদের কাছে আজও উদঘাটিত হয়নি। যিনি আজ স্তব্ধ, মূক হয়ে আমাদের মধ্যে বছরের পর বছর কাটাচ্ছেন তাঁর মহামৌনের অতলে ডুব দিলে শুনতে পাওয়া যাবে শুধু মাতৃনামের ঝঙ্কার। কাজী নজরুল ইসলাম স্বভাবে ও স্বরূপে মাতৃসাধক বা পরম শাক্ত। প্রথম জীবনে দেশমাতৃকারূপে এই জননীই তাঁর ধ্যান জ্ঞান আরাধনার বিষয় ছিলেন এবং শেষের দিকে বিশ্বমাতৃকা বা জগজ্জননীরূপে তিনিই তাঁর আরাধ্যা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অন্তর্জীবনের এ পরিণতির খবর হয়তো অনেকে রাখেন না, গীতি সুরকার বা কবি গায়ক নজরুলের অন্তরালে সাধক নজরুলের অস্তিত্বের কথা অনেকেই জানেন না।

তিনি শক্তিতত্ত্ব বা মাতৃস্বরূপের নব ভাষ্যকার। চমকে যেতে হয় তাঁর হিন্দুশাস্ত্রে গভীর অনুপ্রবেশ দেখে।...

এই নিখিলের আরাধ্যা মহাশক্তিকে তাঁর নানা বিভাবে বন্দনা করেছেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'দেবীস্তুতি'তে। মূলে যিনি আদ্যাশক্তি পরমা কুমারী তাঁর মুখ্য তিনটি বিভূতি বা বিভাব: মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী। মহাকালীরূপে তাঁর প্রথম আবির্ভাব মধুকৈটভনাশের জন্য বিষ্ণুকে উদ্বোধিত করতে। কাজী নজরুল মধু ও কৈটভকে চিনেছেন অধৈর্য ও অবিশ্বাস রূপে। তাঁর এ ব্যাখ্যা যেমন অভিনব তেমনি আকর্ষণীয়। তেমনি মহিষাসুরকে তিনি দেখেছেন ক্রোধের প্রতীকরূপে, যার বিনাশ সাধন করেন মহালক্ষ্মী এবং জগতে এনে দেন শান্তিসুষমা, সুখসমৃদ্ধি। আর শেষে কাম ও লোভরূপী শুম্ভ-নিশুম্ভকে বধ করেন সরস্বতী তাঁর জ্ঞানের প্রোজ্জ্বল খড়গ দিয়ে। তখন—

'মা যে আমার কেবল জ্যোতি'

এবং

'সেই পরম শুভ্র জ্যোতির্ধারায়
নিখিল বিশ্ব যায় ডুবে যায়।'

এই পরম অনুভবে কবি আত্মহারা। আমাদের শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মায়ের এই তিন মূল বিভাবের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে, মধুকৈটভাদি দৈত্য বা অসুরের নানা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিলো এবং আধুনিক যুগেও 'সাধন-সমর' প্রভৃতি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়।

বাংলা দেশের এই মহা দুর্দিনে কবির এই অভিনব শাক্তপদাবলী এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে এনেছে।

গানের কবি নজরুল

বিনয়কুমার সরকার

নজরুলের লেখা গান শুনি প্রথম ১৯২৫ সনের ডিসেম্বর মাসে। ব্যারিষ্টার কুমুদনাথ চৌধুরীর বাড়ীতে (ব্রাইট ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ) তাঁরা আমাদেরকে অতিথি ক'রে রেখেছিলেন। প্রায় বার বছর পর বিদেশ হ'তে কলকাতায় ফিরে এলাম ; প্রথম বিদেশ-পর্যটনের কথা বল্‌ছি :

মেয়েরা গান কর্‌তো। কোরাস্‌ শুনেছিলাম। নিম্নরূপ :

'চল্‌ চল্‌ চল্‌।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল।
নিম্নে উতলা ধরণীতল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে, চল্‌রে, চল্‌
চল্‌, চল্‌, চল্‌।'

জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, নজরুলের লেখা। শুন্‌বা মাত্র মনে পড়্‌লো 'বিদ্রোহী'র—

'বল বীর
বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির॥'

এই কবিতার চরম তারিফ ক'রেছিলাম প্রবাসে 'ফিউচারিজম্‌ অব ইয়ং এশিয়া' বইয়ে (বার্লিন, ১৯২২)।···

নজরুল আধুনিক বাংলা কাব্যের যুগ-প্রবর্তক।···নজরুলের গান শুনেছি এখানে-সেখানে তাঁর চেলাদের মুখে। নজরুলের সঙ্গে প্রথম দেখা হয় বোধ হয় মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনে (১৯৩২)— দ্বিতীয় বিদেশ-পর্যটনের পর। সেই সম্মেলনেই সেকালের প্রবীণ কবি কৈকোবাদ ও একালের প্রবন্ধ-সাহিত্যিক ওদুদের [কাজী

আবদুল ওদুদ] সঙ্গে আলাপ। নজরুলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে অন্যান্য সভা-সমিতিতেও। তাঁর নিজ গলার গাওয়া গান শুনেছি ভূতপূর্ব মেয়র জাকারিয়ার বাড়ীতে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪২)। নৈশ ভোজনে উপস্থিত ছিলেন আবদুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, 'কৃষক'-সম্পাদক মনসুর, মানব-দরদী যুবা-কবি হাতেম আলি নওরোজি। দরজার ফাঁক দিয়ে অন্দর হ'তে মেয়েদের ফরমায়েস এল 'অগ্নিবীণা' পড়বার। নজরুলের পাঠও শুনা গেল সেই বৈঠকে।...

কিন্তু সেদিনকার আবহাওয়ায়ও নজরুল আমার কাছে গানের কবি বা একমাত্র গায়ক রূপেই র'য়ে গেলেন। শুনা গেল ফজলুল হকের 'নবযুগ' দৈনিকে তাঁকে সম্পাদক করা হবে। 'নবযুগ' যখন বেরুলো, তাতে 'ঈদের চাঁদ' কবিতা দেখলাম নজরুলের। বেশ জোরাল ও ঝাঁঝাল।...

বুঝলাম নজরুল শুধু গানের কবি মাত্র নন, গায়ক-কবিও বটে. তাঁর গানের সুরগুলো লাগে ভাল। রৈবিক সুরও আমার পছন্দ-সই। নজরুলের সুরও পছন্দ-সই। বাঙালীকে গজল শুনিয়ে নজরুল নামজাদা। কিন্তু গজলই তাঁর একমাত্র সুর নয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সুরু হয়েছে রৈবিক সুরের ধারা। নজরুলি সুরের ধারা সুরু হ'লো তার প্রায় বছর পঁচিশেকের পর. ধারা দুইটা বেশ-কিছু স্বতন্ত্র। দুই ধারাই বাঙালী জাতকে মাত ক'রেছে। রৈবিক সুর আর নজরুলি সুর অনেকদিন পর্যন্ত বাংলা দেশকে মাত ক'রে রাখবে। এই দুই সুরের ধারা অনেকটা আলাদা-আলাদা ভাবে বাংলার নর-নারীকে তাতাতে-তাতাতে চল্‌বে। হয়ত কোথাও-কোথাও রৈবিক সুরের সঙ্গে নজরুলি সুরের মেলমেশও সাধিত হ'তে থাকবে। সুর-শিল্পী নজরুল বাঙালী-সমাজে অমর। রামপ্রসাদী, বৈষ্ণব, ভাটিয়াল, বাউল, কীর্ত্তন, ঝুমুর, বোল্‌বাই (গম্ভীরা), জারি, রাবীন্দ্রিক ইত্যাদি সুরের মতন নজরুলি সুরও বঙ্গীয় সঙ্গীত-সাংস্কৃতির অন্যতম সম্পদ।

কাজী সাহেবের কবিতা

মোহিতলাল মজুমদার

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব ? বাঙ্গালা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ-ঝঙ্কার ও ধ্বনি-বৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ-ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে। যে ছন্দ কবিতায় শব্দার্থময়ী কাব্যভারতীর ভূষণ না হইয়া, প্রাণের আকুতি ও হৃদয়স্পন্দনের সহচর না হইয়া ইদানীং কেবলমাত্র শ্রবণ-প্রীতিকর প্রাণহীন চারু-চাতুরীতে পর্যবসিত হইয়াছে সেই ছন্দ এই নবীন কবির কবিতায় তাঁহার হৃদয়নিহিত ভাবের সহিত সুর মিলাইয়া মানবকণ্ঠের স্বর-সপ্তকের সেবক হইয়াছে।

কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী।

অভিযান

— · —

নতুন পথের যাত্রা-পথিক
চালাও অভিযান।
উচ্চকণ্ঠে উচ্চার আজ—
"মানুষ মহীয়ান।"

— · —

চারিদিকে আজ ভীরুর মেলা
খেলবি কে আয় নতুন খেলা?
জোয়ার জলে ভাসিয়ে ভেলা
বাইবি কে উজান?
পাতাল ফেড়ে চলবি মাতাল
স্বর্গে দিবি টান॥

— · —

সমর-সাজের নাই রে সময়
বেরিয়ে তোরা আয়,
আজ বিপদের পরশ নেব
নাঙ্গা আদুল গায়।
আসবে রণ-সজ্জা করে,
সেই আশাতেই বসলি সবে;

রাত পোহাবে প্রভাত হবে-
গাইবে পাখী গান
আয় বেরিয়ে, সেই প্রভাতে
ধরবি যারা তান।

— · —

ঝাঁঝির ঘোরে অন্ধযাত্রী
যাত্রাপথিক সব
এ উহারে হানছে আঘাত
করছে কলরব।

সাজোরে বীর সেনাদল!
জ্বালাও মশাল, চল্ আগে চল্
কুচকাওয়াজের বাজাও মাদল,
গাও প্রভাতের গান!
ঊষার দ্বারে পৌঁছে গাবি
"জয় নব উত্থান!"

নজরুল ইসলাম

নারায়ণগঞ্জ, }
২-৭-২১)

একদিনের ঘটনা

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

একদিন সন্ধ্যাবেলা বসে আছি তাঁর [নজরুলের] ঘরে। একদল ছেলে এলো—আমার চেয়ে বয়সে বড়।

ছেলেরা একে একে নজরুলকে প্রণাম করলো, তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিলো।

আমি বিস্মিত। কেননা এমন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ব্রাহ্মণের ঘরের ছেলে আমি। কাজেই পায়ের ধুলো সম্পর্কে জ্ঞান টনটনে।

পরিচয়ে জানলাম, শ্রীরামপুর কলেজের ছাত্রদল শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নজরুলকে।

হিন্দুর ছেলে, ব্রাহ্মণের ছেলেরা মুসলমানকে প্রণাম করে গেল, বললে কবিদের কোন জাত নেই।

'আমার কাননের বুলবুলি —উড়ে গেছে। যে দেশে গেছ তুমি সে কি বুলবুলিস্তান ইরানের চেয়েও সুন্দর ?'

পুত্র বুলবুলের মৃত্যুতে উন্মাদপ্রায় হয়ে গিয়েছে নজরুল। সে কী, মৃত্যু কেন ? মৃত্যু তো অকাল মৃত্যু কেন ? চারিদিকে এতো উৎসব-উজ্জ্বল জীবন সমারোহ, তার মাঝে কেন এই অকাল-নির্বাপণ ? এই শীতল সমাপ্তি ? এই প্রাণোচ্ছল সদানন্দ শিশু কি মরবে বলে এসেছিলো ? কিন্তু তার চোখে-মুখে দেহে-মনে তার তো কোনো সঙ্কেত, কোন আভাস ছিলো না। প্রদীপটি স্থির শিখায় জ্বলতে-না-জ্বলতে কে তাতে নিশ্বাস ফেললো ? কে সমস্ত কিছু নিবিয়ে দিলে এক ফুঁয়ে। কে সে ? কোথায় সে ? তার দেখা পেলে একবার জিজ্ঞেস করতাম। কোন্ পথে গেলে তার দেখা পাওয়া যায় ? আমাকে সে পথের সন্ধান কে দেবে ?

'সহসা একদিন তাকে দেখলাম।' 'পথহারার পথ' নামে বইটির ভূমিকায় লিখেছে নজরুল : 'নিমতিতা গ্রামে বিবাহ সভায় সকলে বর দেখছে, আমার ক্ষুধাতুর আঁখি দেখছে আমার প্রলয়-সুন্দর সারথিকে। সেই বিবাহ সভায় আমার বধূরূপিণী আত্মা তার চির জীবনের সাথীকে বরণ করে নিলো। অন্তঃপুরে মুহুর্মুহুঃ শঙ্খধ্বনি হুলুধ্বনি হচ্ছে। শ্বেতচন্দনের শুচি সুরভি ভেসে আসছে, নহবতে সানাই বাজছে—এমনি শুভক্ষণে আনন্দবাসরে আমার সে ধ্যানের দেবতাকে পেলাম, তিনি এই গ্রন্থ-গীতার উদ্গাতা শ্রীশ্রীবরদাচরণ মজুমদার মহাশয়। আজ তিনি বহু সাধকের পথপ্রদর্শক। সাধন-পথের প্রতিটি পথিক আজ তাঁকে চেনে। কিন্তু যেদিন আমি তাঁকে দেখি, তখনও তিনি শিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অনেকের কাছেই ছিলেন অপ্রকাশ।

সেদিন থেকে আমার বহির্মুখী চিত্র অন্তরে কার যেন অভাব বোধ করতে লাগলো। তখন ভারতে রাজনীতির ভীষণ ঝড় উঠেছে—অসহযোগ আন্দোলনকে বাংলার প্রলয়ঙ্কর রুদ্রের চেলারা ভ্রূকুটিভঙ্গে ভয় দেখাচ্ছে, আমি ধূমকেতুরূপে সেই রুদ্র ভৈরবদের মশাল জ্বেলে চলেছি।

কিছুদিন পরে যখন আমি আমার পথ খুঁজছি তখন আমার প্রিয়তম পুত্রটি সেই পথের ইঙ্গিত দেখিয়ে আমার হাত পিছলে মৃত্যুর সাগরে হারিয়ে গেল। মৃত্যু এই প্রথম আমার কাছে ধর্মরাজরূপে দেখা দিলেন। সেই মৃত্যুর পশ্চাতে আমার অন্তরাত্মা নিশিদিন ফিরতে লাগলো। ধর্মরাজ আমার হাত ধরে তাঁরই কাছে নিয়ে গেলেন, যাঁকে নিমন্ত্রিতা গ্রামে বিবাহ সভায় দেখেছিলাম : ধ্যানে বসে আবিষ্টের মতো তাঁকে বাইশবার প্রদক্ষিণ করলাম। ধর্মরাজ আমার পুত্রকে—বুলবুলকে—শেষবার দেখিয়ে হেসে চলে গেলেন।'

'পথহারার পথ' শ্রীবরদাচরণ মজুমদারের লেখা। পথহারার পথ অর্থ যোগসাধনার পথ। কালক্রমে নজরুল আবার সেই পথের পর্যটক। নজরুল তাই শুধু যোদ্ধা নয়, সে আবার যোগী। তার যোগ আর যুদ্ধ একসঙ্গে। সে যুদ্ধযোগী, যোগীযোদ্ধা।

শ্রীঅরবিন্দ তাই। নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাই। নজরুলও তাঁদের অনুগামী। অরবিন্দের মতো নজরুল আবার কবি।

লিখছে নজরুল : 'আমি আমার আনন্দ-রস-ঘন স্বরূপকে দেখেছি। কি দেখেছি, কি পেয়েছি আজও তা বলবার আদেশ পাইনি। হয়তো আজ তা গুছিয়ে বলতেও পারবো না, তবু কেবলই মনে হচ্ছে, আমি ধন্য হলাম, আমি বেঁচে গেলাম! আমি অসত্য হতে সত্যে এলাম, তিমির হতে জ্যোতিতে এলাম, মৃত্যু হতে অমৃতে এলাম।'

ব্ল্যাক-আউটের রাতে নিবিড় অন্ধকারে একা-একা হেঁটে গিয়ে

দক্ষিণেশ্বরে ধ্যানে বসছে নজরুল, আবার বিরজাসুন্দরীর অন্তিম শয্যার পাশে বসে ভক্ত হরিদাসের মত নাম কীর্তন করছে। আর তার মুখে নাম শুনে গৌরর্পিতচিত্ত বিরজাসুন্দরী বলছেন, 'অদ্যাপিও সংকীর্তন করে গোরা রায়। কোনো কোনো ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।' বিরজাসুন্দরী সেই ভাগ্যবতী।

নজরুল আজ সঙ্গীতের স্তব্ধতা নয়, স্তব্ধতার সঙ্গীত। বিদ্রোহের প্রণাম নয়, প্রণামের বিদ্রোহ।

প্রথম আলাপে

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নজরুলের সঙ্গে আলাপ জমে গেলো। সে কবিতা পড়লো। গান শোনালো। আমিও তাকে গান শোনালুম।

কি ভালই লেগেছিলো নজরুলকে সেই প্রথম আলাপে। সবল শরীর; ঝাঁক্ড়া চুল, চোখ দুটি যেন পেয়ালা, কখনো সে পেয়ালা খালি নেই। প্রাণের অরুণ রসে সদাই ভরপুর। গলাটি সারসের মতো পাতলা নয়, পুরুষের গলা যেমন হওয়া উচিত তেমনি সবল বীর্য-ব্যঞ্জক। গলার স্বরটি ছিলো ভারী, গলায় যে সুর খেললো তা বলতে পারিনে, কিন্তু সেই মোটা গলার সুরে ছিলো যাদু। ঢেউয়ের আঘাতের মতো, ঝড়ের ঝাপটার মতো তার গান আছড়ে পড়তো শ্রোতার বুকে।

অনেক চিকন গলার গাইয়ের চেয়ে নজরুলের মোটা গলার গান আমার লক্ষগুণ ভালো লাগলো।...

প্রবল হতে সে ভয় পেতো না, নিজেকে মিঠে দেখবার জন্যে সে কখনো চেষ্টা করতো না।

রবীন্দ্রনাথের পরে এমন শক্তিশালী কবি আর আসেনি বাং দেশে। এমন সহজ গতি, আবেগের আগুন ভরা কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিরল।

বাইরের জগতে মাঝে মাঝে যেমন ঝড় ওঠে, মানুষের মনের জগতেও তেমনি। এবং ওঠে একই কারণে।

কোথাও কোনো উত্তাপ যখন অস্বাভাবিক ও অসহ্য হয়ে ওঠে তখন ঝটিকার প্রচণ্ডতার ভিতর দিয়েই অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি তার স্বাভাবিক সামঞ্জস্য ফিরে পাবার প্রয়াস পায়।

বাংলা দেশের বর্তমান খৃষ্টীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এমনি অস্বাভাবিক উত্তাপই রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক কারণে জমে উঠেছিলো। সেই উত্তাপ থেকে যে দুরন্ত বাষ্পাবেগের সৃষ্টি হয়েছিলো তার একদিকের প্রকাশ নজরুল ইসলামের মধ্যে মূর্ত।

নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের জগতে ছন্দোময় এক দুরন্ত ঝটিকা-বেগ। ঝটিকার যা ধর্ম নজরুল ইসলামের কাব্য-প্রতিভার মধ্যে তার সব কিছুই বর্তমান। উচ্ছৃঙ্খল বাত্যার মতই তা সাহিত্যের আকাশে দেখা দিয়েছে, যা নড়বড়ে তাকে নাড়া দিয়ে ভেঙেছে, যা জীর্ণ তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিগ্বিদিকে দিয়েছে উড়িয়ে, যার যেখানে অন্যায় অসত্য শিকড় গেড়ে বসেছে সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনের কণ্ঠরোধ করে, সেখানে আঘাতের পর আঘাতে মূল পর্যন্ত দিয়েছে টলিয়ে। পূর্বের কিছু কিছু রচনা রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নজরুল ইসলাম সমস্ত সাহিত্য জগতের কাছে সচকিত স্বীকৃতি যেন সবলে আদায় করে নেন।

কাব্য-বিচারে 'বিদ্রোহী'র মূল্য সকলের কাছে সমান না হতে পারে, কিন্তু তদানীন্তন যুগ-মানস যে প্রথম এই কবিতার মধ্যেই প্রতিবিম্বিত এ-কথা কেউ বোধহয় অস্বীকার করবেন না। এ কবিতার

বিশৃঙ্খল ছন্দ ও উগ্র উৎকট উপমা উৎপ্রেক্ষাও যেন সে যুগের অন্তরলোকের নিরুদ্ধ বাষ্পাবেগের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত।

'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়েই নজরুল ইসলামের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সমস্ত জীবন ও কাব্য-সাধনার মধ্যে বিদ্রোহের প্রেরণাই প্রধান হলেও শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্য দিয়ে তাঁকে চিনতে চাইলে তাঁর প্রতি একান্ত অবিচার করা হবে বলে মনে হয়। নজরুল ইসলাম চির-বিদ্রোহী সত্য, কিন্তু সে বিদ্রোহের আসল পরিচয় উগ্র উচ্ছ্বাসে নয়। সমস্ত উদ্দাম তরঙ্গ-আন্দোলনের তলায় কোথায় সে বিদ্রোহ যেন গভীর সমুদ্রের মতো শান্ত, সমস্ত ঝটিকা-আন্দোলনের ঊর্ধ্বে তুষারশিখরের মতো স্থির।

সমস্ত উন্মত্ত বেগের পিছনে এই প্রসন্ন প্রশান্তি ও স্থৈর্য না থাকলে প্রাকৃতিক ঝটিকার মতই নজরুল ইসলামের নাম বাংলা কাব্য-সাহিত্যের চিরন্তন গৌরব না হয়ে শুধু সাময়িক দুর্যোগের স্মৃতি হয়েই থাকত।

নজরুল

প্রবোধকুমার সান্যাল

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষপ্রান্তে যখন জগৎজোড়া অসন্তোষ দেখা দেয় এবং বাংলার হোমরুল আন্দোলন যখন প্রবলতর হতে থাকে সেই কালে বাংলার কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অপরিচিত যে তরুণ কাব্য-সাধকের আকস্মিক আবির্ভাব ঘটে—তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের পূর্বপরিচয় কারও জানা ছিলো না—তখন শুধু জানা গিয়েছিলো তিনি সৈনিকবৃত্তি ছেড়ে বাংলা সাহিত্যের সেবায় অবতীর্ণ হয়েছেন। পরে জানা গিয়েছিলো বর্ধমান জেলার বিশেষ একটি গ্রামের ইস্কুলে তিনি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সতীর্থ ছিলেন। নজরুল যখন তাঁর অনুরাগরঞ্জিত কবি-জীবন নিয়ে এসে দাঁড়ালেন কলকাতার রাজপথে, তখন তাঁর একদল লক্ষ্মীছাড়া বন্ধু ভিন্ন অপর সহায় সম্বল বিশেষ কিছু ছিলো না। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ছিলো এমন একটি প্রবল উজ্জ্বল প্রাণ, এমন একটি সরল, উজ্জ্বল এবং উৎসাহোদ্দীপ্ত জীবন,—যেটি সর্বক্ষণ অনুপ্রাণিত করে রাখতো তাঁর পারিপার্শ্বিক বন্ধু সমাজকে। তাঁর স্বভাবের দীপ্তি, তাঁর প্রাণবন্যা এবং তাঁর হাস্যমুখরতা—এদের আকর্ষণে কলকাতার রাজপথে একদা ভিড় জমে যেতো। রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তী শ্রেষ্ঠ কবিদল থেকে নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণ পৃথক প্রকৃতির—তাঁর গোত্র মেলেনি কারও সঙ্গে,—তিনি আগাগোড়া অনন্য। তিনি জাতি-গোত্র-গোষ্ঠী-বর্ণের অতীত এক বিস্ময়কর ও দৈব-প্রেরিত ব্যক্তিত্ব—যাঁর জুড়ি এ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি।

নজরুলের সাহিত্য-জীবনের আয়ুষ্কাল হয়তো মাত্র পঁচিশ বছরের বেশি নয়, এই কালের মধ্যে তিনি একদিকে যেমন জাতীয়তাবাদী বাঙালীর জীবনে প্রবল উদ্দীপনা ও প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিলেন,

অন্যদিকে যেমন সাহিত্যকর্মী ও রসিক সমাজে শ্রেষ্ঠ সমাদরও লাভ করেছিলেন। তাঁর এক হাতে ছিলো অসি, অন্য হাতে ছিল বাঁশী কাব্য-রচনাকালে তিনি সর্বপ্রকার অভ্যস্ত নীতি ও নিয়ম, ছন্দ ও মিল, রীতি ও গঠন—এগুলিকে অতিক্রম করে যে অবিমিশ্র নবীনতার স্বাদ এনেছিলেন তাঁর কবিতায়, যে নবতম শব্দ সম্ভারে তিনি প্রাণময় করে তুলতেন তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা ও গান,—তার পরিচয় আজও আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। নজরুলের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর লিরিকগান, শ্যামাসঙ্গীত এবং তাঁর বিবিধ তেজস্বী রচনা—আপন আপন প্রাণময়তায় আজও সতেজ। সেদিনের সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আজও নিষ্প্রভ হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি সকলের অলক্ষ্যে একটি যোগাসন গ্রহণ করেন,—এই সংবাদটি শুনে তাঁর সমকালীন লেখক-গোষ্ঠী সচকিত হন। তাঁরা এ-কথা জানতেন, তাঁর প্রথম পুত্র-সন্তানের মৃত্যুর পর থেকে নজরুলের উদ্দাম ও বাধাবন্ধহীন কবি জীবনে একটি ভাবান্তর আসে, এবং তিনি ধীরে ধীরে এক অধ্যাত্ম জীবনের দিকে আসক্ত হতে থাকেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের শেষপ্রান্ত অবধি এইভাবেই তাঁর চলে, এবং সেই সময় থেকেই তাঁর রচনা-স্রোত স্তিমিত হয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর হাওড়ায় যে বিরাট শোকসভার আয়োজন করা হয়, নজরুল তাঁর জীবনের শেষবারের মতো সেই সভায় যোগদান করেছিলেন।

নজরুল আজও সুস্থ দেহে বিরাজ করছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর বর্তমান যে আত্মসমাহিত স্তব্ধতা, এটিকে কোনও দুরারোগ্য ব্যাধি বলতে আমার মন প্রস্তুত নয়। এদেশ ও ওদেশের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাবিদরাও তাঁর এই রহস্যজনক ব্যাধিকে নিরাময় করতে সমর্থ হননি। তাঁর চেহারা ও চাহনি, ভাব ও ভঙ্গী—এমন একটি মর্মার্থ বহন করছে, যেটি লৌকিক বিচারে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা বোধ হয় সাধ্যাতীত। তাঁর বাহ্য-চৈতন্য অসাড়,—কি তাঁর

অন্তশ্চৈতন্য হয়তো কোনও এক নিবিড় ও গভীরতর ধ্যানে আত্ম-নিমজ্জিত। কে জানে, তিনি হয়তো তাঁর আয়ুষ্কালের শেষপ্রান্তে হঠাৎ আবার একদিন ফিরে আসবেন আমাদের এই লৌকিক জগতে।

কিন্তু এ-কথা নির্ভুলভাবেই সত্য, কাজী নজরুল ইসলামের সম্মান ও সংবর্ধনা যতো বেশি বৃদ্ধি পায়, তাঁর সমকালীন লেখক ও লেখিকারা ততো বেশি গৌরব-গর্বিত বোধ করেন। বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে নজরুল অজাতশত্রু হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল ইসলাম

বুদ্ধদেব বসু

আমার বাল্যকাল কেটেছে অজ মফঃস্বলে। দেশের বৃহৎ জীবনের বহুমুখী স্রোত সেখানে পৌঁছতো না—যদি বা কখনো পৌঁছতো, সে অনেক দেরী করে এবং অনেক ক্ষীণ হয়ে। অনেকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রের গ্রাহক হয়ে বালক মনের প্রবল কৌতূহল যথাসম্ভব মেটাবার চেষ্টা করতুম ; ওরই ভিতর দিয়ে রাজধানীর প্রাণকল্লোলের সঙ্গে ছিলো আমার পরিচয়।

ক্বচিৎ এমন ঘটনাও দেশে ঘটে, যার অভিঘাতে ম্লানতম মফঃস্বলও থরথর করে কেঁপে জেগে ওঠে। গান্ধীজীর প্রথম অসহযোগ আন্দোলন তেমনি একটি ঘটনা। অবাক হয়ে দেখলুম নিঃস্ব নোয়াখালিতেও প্রাণের জোয়ার। দেশসুদ্ধ লোক যেন সব খোয়াবার মন্ত্রে ক্ষেপে গেলো।

সে-সময়ে আমি যদি দশ বছরের বালক না হয়ে বিশ বছরের যুবা হতুম, তাহলে নিশ্চয়ই কলেজরূপী সরকারী গোলামখানার ধুলো পা থেকে ঝেড়ে ফেলে ভাগ্যের ভেলাকে ভাসিয়ে দিতুম বিপর্যয়ের অস্থির আবর্তে। কিন্তু আমি এতই ছোট ছিলুম যে, পিকেটিং করে জেলে যাবার পর্যন্ত উপায় ছিলো না আমার। যা-হোক কিছু একটা করে উত্তেজনার ধারটাকে বইয়ে দেবার কোনো পথ আমার খোলা ছিলো না বলেই মনে-মনে এই নেশার উচ্ছ্বাসে আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম।

ঠিক এই উন্মাদনারই সুর নিয়ে এই সময়ে নজরুল ইসলামের কবিতা প্রথম আমার কাছে পৌঁছলো। 'বিদ্রোহী' পড়লুম ছাপার অক্ষরে মাসিকপত্রে—মনে হলো, এমন কখনো পড়িনি। অসহযোগের অগ্নিদীক্ষার পরে সমস্ত মন-প্রাণ যা কামনা করছিলো, এ যেন তা-ই ; দেশব্যাপী উদ্দীপনার এ-ই যেন বাণী। একজন মুসলমান যুবকের

সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন, এবং তাঁর কাছে—কী ভাগ্য! কী বিস্ময়!—একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালির রাক্ষসী নদীর আগাছা-কণ্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে সেই খাতাখানা আদ্যন্ত পড়ে ফেললুম। তার মধ্যে ছিলো 'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, সত্যের উদ্বোধন', ছিলো 'কামাল পাশা', আর কী-কী ছিলো মনে পড়ছে না। সে-সব কবিতা অচিরেই ছাপার অক্ষরে দেখা যেতে লাগলো, আর তাদের প্রবলতা আমাদের প্রশংসা করার ভাষাটুকু পর্যন্ত কেড়ে নিলে। তাঁর নিখাদ নির্ঘোষ আমাদের মনের মধ্যে কেবলই ঢেউ তুলে ফিরতে লাগলো :

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়।

নূতনের কেতন সত্যি উড়লো। নজরুল ইসলাম বিখ্যাত হলেন। আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতখানি বিখ্যাত অন্য কোন কবি হননি।

কে এই নজরুল ইসলাম? তাঁর সম্বন্ধে একটিমাত্র খবর পাওয়া গেলো যে, তিনি যুদ্ধ-প্রত্যাগত। প্রথম-প্রথম তাঁর নামের আগে 'হাবিলদার' এবং 'কাজী' এই জোড়া খেতাব বসানো হতো—তার মধ্যে প্রথমটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝ'রে পড়ে, দ্বিতীয়টি বহুদিন পর্যন্ত ঝুলে ছিলো। সামরিক বেশে তাঁর ছবি বেরোলে মাসিকপত্রে—ঠিক মনে নেই এটাই সেই ছবি কিনা যাঁতে কবি একটা কামানের গায়ে হেলান দিলে দাঁড়িয়ে—তরুণ বলিষ্ঠ চেহারা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফের রেখা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। যে-সব ভাগ্যবান কবিকে স্বচক্ষে দেখে এসেছে, তাদের মুখে কালক্রমে আরো শুনলুম যে, তিনি বেপরোয়া দিলখোলা ফুর্তিবাজ মানুষ, এবং তাঁর স্ত্রী হিন্দুকন্যা।

পটপরিবর্তন ক'রে আসা যাক দশ বছর পরে, ঢাকায়, পুরানা

পল্টনে, 'কল্লোল'-প্রগতি'র যুগে। নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছেন এবং গান গেয়ে সারা শহর মাতিয়ে তুলেছেন। 'কল্লোলে' গজল-গানের প্রথম পর্যায় বেরিয়ে গেছে—তার পরে ব'য়ে চলেছে গানের স্রোত—যেন তা কখনো ক্ষান্ত হবে না, যেন তা কখনো ক্লান্ত হবে না। সেবারে ঢাকায় সুধীজনের মধ্যে নজরুলকে নিয়ে কাড়াকাড়ি, জনসাধারণ তাঁর গান শুনে আত্মহারা, কেবল কতিপয় দুর্জন দুষমনের পক্ষে তাঁর প্রতিপত্তি এত দুঃসহ হলো যে, তারা শেষ পর্যন্ত তার উপর গায়ের জোরের গুণ্ডামি ক'রে ঢাকার ইতিহাসে একেবারেই অনেকখানি কালিমা লেপন করে দিলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে এক মুসলমান অধ্যাপকের বাসা, সেখান থেকে নজরুলকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা কয়েকটি উৎসাহী যুবক চলেছি আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায়। বিকেলের ঝকঝকে রোদ্দুরে সবুজ রমনা জ্বলছে। হেঁটেই চলেছি আমরা, কেউ-কেউ বাইসাইকেলটাকে হাতে ধ'রে ঠেলে নিয়ে চলেছে, জনবিরল সুন্দর পথ আমাদের কলরবে মুখর, নজরুল একাই একশো। চওড়া মজবুত জোরালো তাঁর শরীর, লাল-ছিটে-লাগা বড়ো বড়ো মদির তাঁর চোখ, মনোহর মুখশ্রী, লম্বা ঝাঁকড়া চুল তাঁর প্রাণের ফূর্তির মতোই অবাধ্য গায়ে হলদে কিংবা কমলা রঙের পাঞ্জাবি এবং তার উপর কমলা কিংবা হলদে রঙের চাদর—দুটোই খদ্দরের। 'রঙিন জামা পরেন কেন?' 'সভায় অনেক লোকের মধ্যে চট করে চোখে পড়ে, তাই।' ব'লে ভাঙা-ভাঙা গলায় হো-হো করে হেসে উঠলেন।

আমাদের টিনের ঘরে নিয়ে এলাম তাঁকে, তারপর হার্মোনিয়ম, চা, পান, গান, গল্প, হাসি। আড্ডা জমলো প্রাণমন খোলা, সময়ের হিসেব-ভোলা—নজরুল যে-ঘরে ঢুকতেন সে-ঘরে কেউ ঘড়ির দিকে তাকাতো না। আমাদের 'প্রগতি'র আড্ডায় বার-কয়েক এসেছেন তিনি, প্রতিবারেই আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। প্রাণশক্তির এমন অসংবৃত উচ্ছ্বাস, এমন উচ্ছৃঙ্খল অপচয় অন্য কোনো বয়স্ক মানুষের

মধ্যে আমি দেখিনি। দেহের পাত্র ছাপিয়ে সব সময় উছলে পড়ছে তাঁর প্রাণ, কাছাকাছি সকলকেই উজ্জীবিত করে, মনের ময়লা খেদ ও ক্লেদ সব ভাসিয়ে দিয়ে। সকল লোকই তাঁর আপন, সব বাড়িই তাঁর নিজের বাড়ি। শ্রীকৃষ্ণের মতো, তিনি যখন যার তখন তার। জোর করে একবার ধরে আনতে পারলে নিশ্চিন্ত, আর ওঠবার নাম করবেন না—জরুরি এনগেজমেণ্ট যাবে ভেসে। ঝোঁকে পড়ে দলে পড়ে, সবই করতে পারেন। একবার কলকাতায় খেলার মাঠে বুঝি মোহনবাগানের জিৎ হলো, না কি এমন আশ্চর্য কিছু ঘটলো ফুর্তির ঝোঁকে 'কল্লোল' দলের চার-পাঁচজন খেলার মাঠ থেকে শেয়ালদা স্টেশনে এবং শেয়ালদা থেকে একেবারে ঢাকায় চ'লে এলেন—নজরুলকে ধ'রে নিয়ে এলেন সঙ্গে। হয়তো দু-দিনের জন্য কলকাতার বাইরে কোথাও গান গাইতে গিয়ে সেখানেই এক মাস কাটিয়ে দিলেন। সাংসারিক দিক থেকে এ-চরিত্র অনুকরণযোগ্য নয়, কিন্তু এতে যে রম্যতা আছে তাতে সন্দেহ কী! সে-কালে বোহিমিয়ানের চাল-চলন অনেকেই অভ্যাস করেছিলেন—মনে মনে তাঁদের হিসাবের খাতায় ভুল ছিলো না—জাত-বোহিমিয়ান এক নজরুল ইসলামকেই দেখেছি। অপরূপ তাঁর দায়িত্বহীনতা। সেই যে গোলাম মুস্তাফা একবার ছড়া কেটেছিলেন—

> কাজী নজরুল ইসলাম
> বাসায় একদিন গিছলাম।
> ভায়া লাফ দেয় তিন হাত,
> হেসে গান গায় দিন রাত,
> প্রাণে ফূর্তির ঢেউ বয়;
> ধরায় পর তার কেউ নয়।

এর প্রতিটি কথা আক্ষরিত সত্য।

কথাবার্তার আসরে তিনি যে খুব দীপ্যমান, তা নয়। নিজের আনন্দেই তিনি মত্ত, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনবার সময়

কই? নিজে রসিকতা ক'রে নিজেই হেসে লুটিয়ে পড়ছেন। কথার চেয়ে বেশী তাঁর হাসি, হাসির চেয়ে বেশী তাঁর গান। একটি হার্মোনিয়ম এবং যথেষ্ট পরিমাণে চা এবং পান দিয়ে একবার বসিয়ে দিতে পারলে তাঁকে দিয়ে একটানা পাঁচ সাত ঘণ্টা গান গাওয়ানো কিছুই নয়।—গানে তাঁর আন্না নেই; ঘুমের সময় ছাড়া সবটুকু সময় গাইতে হলেও তিনি প্রস্তুত। কণ্ঠস্বর মধুর নয়, ভাঙা খাদের গলা, কিন্তু তাঁর গান গাওয়ায় এমন একটি আনন্দিত উৎসাহ, সমস্ত দেহ-মনে প্রাণের এমন একটি প্রেমের উচ্ছ্বাস ছিলো যে, আমরা মুগ্ধ হয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনেছি। সে সময়ে গান রচনা করতেও দেখেছি তাঁকে—হার্মোনিয়ম, কাগজ আর কলম নিয়ে বসেছেন, বাজাতে বাজাতে গেয়েছেন, গাইতে গাইতে লিখেছেন। সুরের নেশায় এসেছে কথা, কথার ঠেলা সুরকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। সেবারে ঢাকায় যে সব গান তিনি লিখেছিলেন সেগুলি প্রায় সবই স্বরলিপি সমেত 'প্রগতি'তে বেরিয়েছিলো। 'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়লো তরী,' 'এ বাসি বাসরে আসিলে কে গো/ছলিতে', 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া/ পরাণ পিয়া', এ-সব গান ঢাকায় লিখেছিলেন বলে মনে পড়ছে। এইমাত্র-শেষ-করা গান কবির নিজের মুখে তক্ষুনি শুনতে-শুনতে আমাদেরও মনের মধ্যে নেশা ধরে যেতো।

ঠিক মনে পড়ে না কোথায় নজরুলকে প্রথম দেখেছিলাম—ঢাকায় না 'কল্লোলে'র আড্ডায়। নিরবচ্ছিন্নভাবে বেশিদিন ধরে দেখাশোনা তাঁর সঙ্গে আমার কখনোই হয়নি, কলকাতায় এসে এখানে সেখানে মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে, প্রতিবারেই তাঁর প্রাণ-শক্তির উল্লাস মুগ্ধ করেছে আমাকে। সত্যিই তিনি যেন 'চির শিশু, চির কিশোর।' সম্প্রতি তাঁর মুখে বয়সের ছাপ দেখে ব্যথিত হচ্ছিলাম—এইজন্যে ব্যথিত যে, প্রৌঢ় ঋতুর প্রশান্ত সৌন্দর্য সেখানে ফলেনি, তাঁর মুখে যেন ক্লান্তির ছায়া, যেন

নিরাশার কালিমা। শেষ বার তাঁর সঙ্গে দেখা হলো বছর চারেক আগে—সেবার অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা কেন্দ্রের আমন্ত্রণে আমরা একদল কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টিমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো—দেখলাম তাঁর চোখ মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'I am the greatest yogi in India.' যোগসাধনা আরম্ভ করে তাঁর গায়ের রং তপ্তকাঞ্চনের মতো হয়েছিলো, একবার শ্রীঅরবিন্দ সূক্ষ্ম দেহে তাঁর কাছে এসে আধ ঘণ্টা বসেছিলেন—এমনি নানা কথা বললেন। কেমন-কেমন লাগলো। এর কিছুকাল পরে শুনলাম, নজরুল মানসিক অসুস্থতার জন্য চিকিৎসকের নজরবন্দী হয়েছেন।

তার পরে তাঁকে আর দেখিনি। আর দেখবো কিনা জানি না। প্রার্থনা করি, তিনি রোগমুক্ত হয়ে আমাদের মধ্যে ফিরে আসুন—তাঁর কাব্যে, তাঁর গানে, তাঁর জীবনে, পরিণত বয়সের শান্ত সুষমা প্রতিফলিত হোক। আর যদি তা না হয়, যদি এখানেই তাঁর সাহিত্যসাধনার সমাপন ঘটে, তাহলেও, গেলো পঁচিশ বছর ধরে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন, সেই তাঁর অজস্র কাব্য ও সঙ্গীত বাঙালীর মনে তাঁকে স্মরণীয় ক'রে রাখবে। আমরা যারা তাঁর সমকালীন আমরা তাঁর উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা, আমাদের প্রীতি আমাদের কৃতজ্ঞতা মহাকালের খাতায় জমা রাখলুম।

কবি নজরুল প্রসঙ্গে

জসীমউদ্দিন

একবার কলিকাতা গিয়া কবির সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাসায় যাই। তখন বিবাহ করিয়া সদ্য সংসার পাতিয়াছেন। হাস্য-রসিক নলিনীকান্ত সরকারের বাসায় তিনি ছিলেন। কবি আমার সঙ্গে ভাবীর পরিচয় করাইয়া দিলেন। ভাবীর সেই রাঙা টুকটুকে মুখের হাসিটি আজও মনে আছে। এরপর যখনই কবিগৃহে গমন করিয়াছি, কবি-পত্নীর ব্যবহারে তাঁহাদের গৃহখানি আমার আপন বলিয়া মনে হইয়াছে। আমি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ি।

ভাবীর মতন এমন সর্বংসহা মেয়ে বাংলাদেশে খুব কমই পাওয়া যায়। কবির ছন্নছাড়া নোঙরহীন জীবন। এই জীবনের অন্তঃপুরে স্নেহ-মমতায় মধুর হইয়া চিরকাল তিনি কবির কাব্য সাধনাকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। কোনো সময় তাঁহাকে কবির সম্পর্কে কোনো অভিযোগ করিতে দেখি নাই।

কবির প্রথম ছেলেটির নাম ছিল বুলবুল। অতটুকু ছেলে কি সুন্দর গান করিতে পারিত! কেমন মিষ্টিসুরে কথা বলিত! কবির কোল হইতে কাড়িয়া লইয়া আমরা তার মুখের মিষ্টিকথা শুনিতাম। কবি হারমোনিয়ামে যখন যে কোন সুর বাজাইতেন, বুলবুল শুনিয়াই বলিয়া দিতে পারিত কবি কোন্ সুর বাজাইতেছেন। ওস্তাদী গানের নানা সুর-বিভাগের সঙ্গে সে ঐটুকু বয়সেই পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বড়ো বড়ো মজলিসে কবি খোকাকে লইয়া যাইতেন। এই শিশুটিকে পাইয়া কবির ছন্নছাড়া জীবন কতকটা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কবিকে আর কবি-পত্নীকে অনন্ত কান্নার সাগরে ডুবাইয়া সেই বেহেস্তের বুলবুল পাখী বেহেস্তে পলাইয়া গেল। কবির গৃহে শোকের তুফান উঠিল।

বুলবুলের মৃত্যুর সময় আমি কলিকাতায় ছিলাম না। কলিকাতায় আসিয়া শোকাতুর কবিকে ডি. এম. লাইব্রেরীতে খুঁজিয়া পাইলাম। দোকানের বেচাকেনার হট্টগোলের মধ্যে এক কোণে বসিয়া তিনি হাস্যরস-প্রধান 'চন্দ্রবিন্দু' নামক বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতেছেন। পুত্রশোক ভুলিবার এই অভিনব উপায় দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। দেখিলাম, কবির সমস্ত অঙ্গে বিষাদের ছায়া। চোখ দুটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফুলিয়া গিয়াছে আমি এই সময় প্রায়ই কবির কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। ঐ সময় একদিন জেল হইতে তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মোজাফ্ফর আমেদের চিঠি পাইয়া তিনি অজস্রভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। বুলবুলের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমেদ সাহেব কবিকে সমবেদনা জানাইয়া ঐ পত্র লিখিয়াছিলেন।

বুলবুলের যতো খেলনা, তাহার বেড়াইবার গাড়ী, পোশাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি কবি বাড়ীতে একটি ঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। বুলবুলের মৃত্যুর পর তাহার শতচিহ্ন-জড়িত গৃহে কবির মন টিকিতেছিলো না। খোকার অসুখে অজস্র খরচ করিয়া এই সময়ে কবি ভীষণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন। এই শ্রেষ্ঠ কবিকে আমাদের দেশ প্রকৃত সম্মান দেয় নাই।...

একবার পরলোকগত সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কবি আর হেমন্ত সরকার আমাদের ফরিদপুরে আসিলেন। সরোজিনী নাইডু একদিন পরেই চলিয়া গেলেন। কবিকে আমরা কয়েকদিন রাখিয়া দিলাম।

এক সভায় কবি তাঁহার বিখ্যাত 'সাম্যবাদী' কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন। সে কী আবৃত্তি! কবির কণ্ঠ হইতে যেন অগ্নি-বর্ষণ হইতেছিল—সেই আগুনে যাহা কিছু ন্যায়ের বিরোধী, সমস্ত পুড়িয়া যেন ধ্বংস হইতে লাগিল। ইহার পর আরও একবার কবি আমার পদ্মাতীরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু ফরিদপুরের তরুণ জমিদার বন্ধুবর লাল মিয়া সাহেব মোটর হাঁকাইয়া আসিয়া আমার কাছ হইতে কবিকে ছিনাইয়া লইয়া শহরে চলিয়া গেলেন। বাঁশবনের

যে স্থানটিতে কবির বসিবার আসন পাতিয়া দিয়াছিলাম, সেই স্থান শূন্য পড়িয়া রহিল। চরের বাতাস আছাড়ি বিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার নদীতীরের কুটীরে কবির এই শেষ আগমন।

কবি কতভাবে কত জায়গায় দেখিয়াছি। যখন যেখানে তাহাকে দেখিয়াছি, স্ব-মহিমায় তিনি সমুজ্জ্বল। বড়ো প্রদীপের কাছে আসিয়া ছোটো প্রদীপের যে অবস্থা হয় আমার তাহাই হইত। অথচ, পরের গুণপনাকে এমন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করিতে নজরুলের মতো আর কাহাকেও দেখি নাই। নজরুলের ছিলো অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। নজরুলের জীবন লইয়া অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। এই লোকটি আশ্চর্য লোকরঞ্জনের ক্ষমতা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই যেখানে গিয়াছেন যশ সম্মান আপনা হইতেই আসিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িয়াছে।—গ্রামোফোন কোম্পানীতে আজ যে এতো কথাকার আর সুরকার গুঞ্জরণ করিতেছেন, এ শুধু নজরুলের জন্যই। নজরুল প্রমাণ করিলেন যে, গানের রেকর্ড বেশী বিক্রী হয় —সে শুধু গায়কদের সুকণ্ঠের জন্যই নয়, সুন্দর রচনার সহিত সুন্দর সুরের সমাবেশ রেকর্ড বিক্রয় বাড়াইয়া দেয়। আমি দেখিয়াছি গ্রামোফোন কোম্পানীতে নানান ধরনের গানের হট্টগোলের মধ্যে কবি বসিয়া আছেন—সামনে হারমোনিয়াম—পাশে অনেকগুলি পান, আর গরম চা। ছ'সাতজন নামকরা গায়ক বসিয়া আছেন কবির রচনার প্রতীক্ষায়—একজনের চাই শ্যামাসঙ্গীত, অপরজনের কীর্তন, একজনের ইসলামী সঙ্গীত, অন্যজনের ভাটিয়ালি গান—আরেকজনের চাই আধুনিক প্রেমের গান। এঁরা যেন অঞ্জলি পাতিয়া বসিয়া আছেন। কবি তাঁহার মানস-লোক হইতে সুধা আহরণ করিয়া আছেন তাঁহাদের করপুট ভরিয়া দিলেন। কবি ধীরে ধীরে হারমোনিয়াম বাজাইতেছেন, আর গুনগুন করিয়া গানের কথাগুলি গাহিয়া চলিয়াছেন। মাঝে মাঝে থামিয়া কথাগুলি লিখিয়া লইতেছেন। এইভাবে একই অধিবেশনে সাত-আটটি গান শুধু

রচিত হইতেছে না—তাহারা সুর সংযোজিত হইয়া উপযুক্ত শিল্পের কণ্ঠে গিয়া আশ্রয় লইতেছে।

কবিকে আমি শেষবার সুস্থ অবস্থায় দেখি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শুনিলাম, মুসলিম-হলে কবির অনুষ্ঠান আছে। আমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক রূপে দেখিয়া কবি কতো খুশী হইলেন—আমার কানে কানে বলিলেন—'মায়েরা ছেলেদের প্রতি যে স্নেহ-মমতা ধারণ করে, তোমার চোখে মুখে সমস্ত অবয়বে সেই স্নেহ-মমতার ছাপ দেখতে পেলাম।'

কিছুদিন পরেই শুনিলাম কবি উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন। ব্যথিত হৃদয়ে অসুস্থ কবিকে দেখিবার জন্য বহুবার কবি-গৃহে গমন করিয়াছি। আগে তিনি দেখিলে আমায় চিনিতে পারিতেন—এখন আর পারেন না। কবির শাশুড়ী খালা আম্মার বিষয়ে কিছু বলিয়া প্রসঙ্গের শেষ করিব।

একদিন বেলা একটার সময় কবি-গৃহে গমন করিযা দেখি, খালা আম্মা বিষণ্ণ বদনে বসিয়া আছেন। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে খালা আম্মা বলিলেন—'জসীম, তোমরা জানো, লোকে আমার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে। নুরুর নামে যেখান থেকে যতো টাকা পয়সা আসে, আমি নাকি সব বাক্সে বন্ধ করে রাখি। নুরুকে ভালোমতে খাওয়াই না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করি না। তুমি জানো, আমার ছেলে নেই, নুরুকেই আমি ছেলে করে নিয়েছি। আর, আমিই বা কে? নুরুর দু'টি ছেলে আছে—তারা বড়ো হয়ে উঠছে। আমি যদি টাকা লুকিয়ে রাখি তারা সহ্য করবে কেন?—নিজের ছেলের চাইতে কি কবির প্রতি অপরের দরদ বেশী? আমি তোমায় বলে দিলাম জসীম—এই সংসার থেকে একদিন আমি কোথাও চলে যাবো। এই নিন্দা আমি আর সহ্য করতে পারছি না।' এই বলিয়া খালা আম্মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বলিলাম—'খালা আম্মা, কাঁদবেন না। একদিন সত্য উদ্ঘাটিত হবেই।' খালা আম্মা আমার হাত

ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন, যে ঘরে নজরুল থাকিতেন সেই ঘরে। দেখিলাম মল-মূত্রের মধ্যে কাপড় জামা সমস্ত অপরিষ্কার করিয়া কবি বসিয়া আছেন। খালা-আম্মা বলিলেন—'এই সব পরিষ্কার করে স্নান করে আমি বিধবা মেয়েছেলে তবে রান্না করতে বসবো। খেতে খেতে বেলা পাঁচটা বাজবে। রোজ এইভাবে তিন চার বার পরিষ্কার করতে হয়। যারা নিন্দা করে তাদের বোলো, তারা এসে যেন এই কাজের ভার নেয়। তখন যেখানে চোখ যায়, আমি চলে যাবো।' তখন বুঝিতে পারি নাই, সত্যসত্যই খালা আম্মা ইহা করিবেন। ইহার কিছুদিন পরে খালা আম্মা সেই যে কোথায় চলিয়া গেলেন, কিছুতেই তাঁহার খোঁজ পাওয়া যায় নাই। কবির দুই পুত্র সানি, নিনি কতো স্থানে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়াছে—সেই মহিয়সী মহিলাকে আর পাওয়া যায় নাই। রক্ষণশীল হিন্দু ঘরের এই বিধবা মহিলা নিজের মেয়েটির হাত ধরিয়া একদিন এই প্রতিভাধর বাঁধনহারা কবির সঙ্গে অকূলে ভাসিয়াছিলেন।

নিজের সমাজের হাতে, আত্মীয়-স্বজনের হাতে সেদিন তাঁর গঞ্জনার সীমা ছিলো না। সেই লাঞ্ছনা-গঞ্জনাকে তিনি তৃণের মতো পদতলে দলিত করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী নিন্দা অন্য ধরনের—অত্যন্ত কুৎসিত, কদর্য। এই নিন্দা তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না।

খালা আম্মা আজ বাঁচিয়া আছেন কিনা জানি না। ইহলোকে বা পরলোকে যেখানেই থাকুন, তিনি যেন তাঁর এই পাতানো বোনপো'টির একফোঁটা অশ্রুজলের সমবেদনা গ্রহণ করেন। মুহূর্তের জন্যও যেন একবার স্মরণ করেন ভালো কাজ করলে তাহা বৃথা যায় না।

খালা আম্মা গিরিবালা দেবীর সেই নীরব আত্মত্যাগ অন্ততঃ পক্ষে একজনের অন্তরের বীণায় আজও মধুর সুর-লহরে প্রকাশ পাইতেছে।

যৌবনের কবি নজরুল

সুশীলকুমার গুপ্ত

নজরুল যৌবনের কবি। তাঁর বিদ্রোহ, পৌরুষ, প্রেম প্রভৃতি হৃদয়-বৃত্তি এই যৌবনাবেগ থেকেই উৎসারিত। নজরুলের যৌবনের মধ্যে একদিকে যেমন সৃষ্টি-সুখের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত নিয়ম-কানুন রীতিবন্ধন ভাঙার দুর্জয় আহ্বান। তিনি বলেছেন, 'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস।' তাঁর 'এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য'। যৌবনের মূর্ত প্রতীক নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। তিনি 'অগ্নিবীণা'য় 'প্রলয়োল্লাসে' শুনিয়েছেন :

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন।
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—
মধুর হেসে!
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্!!'

নজরুলের যৌবনের মধ্যে এক প্রচণ্ড অহমিকা, প্রবল প্রাণময়তা ও দুর্মর পৌরুষ ছিলো যার জন্য তিনি ঘোষণা করতে পেরেছিলেন :

'বল বীর—
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির!
বল বীর—

বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি'
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া,
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর!'

নজরুল যৌবনের কবি বলে তিনি যৌবনের সর্ববাধাজয়ী শক্তি ও অপ্রতিহত গতিতে আস্থাশীল। তাঁর উদ্দীপ্ত কণ্ঠের প্রশ্ন, 'এই যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবি কি দিয়া বালির বাঁধ?' নজরুল জানেন যে, গর্বোদ্ধত যৌবনই বৃদ্ধত্ব ও স্থবিরত্বের শাসন ও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে নূতন জীবন ও জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম। তিনি যৌবনের পূজারী বলে যৌবনের প্রতীক পৃথিবীর শ্রমশক্তির বিজয়-সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছেন। এই শ্রমশক্তিই জরা মৃত্যু বিভীষিকাময় পৃথিবীকে সুন্দর ও মনোহর করে তোলে। শ্রমজীবীদের বিষয়ে তাঁর ঘোষণা:

'গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
ত্রস্তা ধরণী নজ্‌রানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে।'

নজরুলের আন্তরিক কামনা, 'যৌবন জয়ী হোক, জড়তা ও জরা যাক, প্রতি নিঃশ্বাসে 'পাব' নিঃশ্বাস বেঁচে থাকা!' তাঁর নৌজোয়ান 'নিত্য অভেদ উদার প্রাণ'। তিনি বলেন, 'মৃত্যুতে তারা করে না ভয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান! তাহারা বুদ্ধি বদ্ধ নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!' তিনি পৃথিবীতে যৌবনসম্পন্নদের মৃত্যুহীন লীলাবৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করে দৃপ্ত-কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন:

'ইহাদেরই রণ-নৃত্যের তালে পদতলে হয় গুঁড়া
ভোগ-বিলাসীর তখ্‌ত ও তাজ, লীলা-প্রাসাদের চূড়া।
ইহারাই প্রেমলোক হতে আসে প্রহার-অস্ত্র হাতে,
ইহারাই আনে বিজয়োল্লাস ধরণীর আঙিনাতে।

এরা দুর্জয়, এরা নির্ভয়, এরা আল্লার সেনা,
এরাই ফোটায় নিরাশার বনে আশার হাস্‌নাহেনা।'

এইজন্য যৌবনের কবি নজরুল ভারতের যুবশক্তির লাঞ্ছনা, অপমান ও দীনতা দেখে হতাশা ও গ্লানিতে জর্জরিত হয়েছেন। 'যৌবনের টিকা-পরা তরুণের দল' আজ জরাগ্রস্ত বুদ্ধিজীবী ও ধূর্ত রাজনীতিবিদ্‌দের প্রলোভনের শিকার হয়ে অধঃপতনের চরম সীমানায় পৌঁচেছে। তাই তাঁর সুতীব্র বেদনাজনিত খেদোক্তি, 'যৌবনের এ লাঞ্ছনা দেখিবার আগে কেন মৃত্যু হইল না?' কিন্তু তিনি তরুণদের বিষয়ে আস্থা হারাননি, কেননা তিনি তাদের মধ্যে ভয়হীন, দ্বিধাহীন ও মৃত্যুহীন ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছেন। তরুণদের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্বোধনে তাই তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'চাহ আঁখি খুলি আপনার মাঝে দেখ আপন স্বরূপ! অতীত-দাসত্ব ভোলো। বৃদ্ধ সাবধানী হইতে পারে না কভু তোমাদের নেতা!' তিনি কঠোর দুঃখে তরুণ তাপসদলকে আহ্বান করেছেন এক শ্রম-মহান্ বীর্যবান ও প্রাণবন্ত জগৎ সৃষ্টি করবার জন্য। তরুণদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তিনি বলে উঠেছেন :

'কোথায় মানিক ভাইরা আমার সাজ্‌রে সাজ্‌।
আজ বিলম্ব সাজে না চালাও কুচ্‌কাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ।—
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্রপথিক রে যুবাদল,
জোর কদম চল্‌রে চল্‌॥'

নজরুলের তরুণেরা দেশমাতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরবে। কঠোর বর্তমানের দারুন দৈন্যতার মধ্যেও তিনি তাদের শুনিয়েছেন মাভৈঃ বাণী। তাঁর ভাষায় 'ভয় কি আয়, ঐ মা অভয়-হাস্ত

দেখায় রামধনুর লাল শাঁখায় তারুণ্যের উদ্দেশ্যে নজরুলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

'নাকের বদলে নরুণ চাওয়া এ তরুণেরে নাহি চাই—
আজাদ মুক্ত স্বাধীন চিত্ত যুবাদের গান গাই।
হোক সে পথের ভিখারী, সুবিধা-শিকারী নহে যে যুবা
তারি জয়গাথা গেয়ে যায় চিরদিন মোর দিলরুবা।'

যৌবনের কবি বলে নজরুল 'বিদ্রোহী', 'বাঁধনহারা', 'অগ্নিবীণা'-বাদক। তিনি একদিকে 'দোলন-চাঁপা'র গন্ধে বিভোর, অন্যদিকে 'ফণি মনসা'র প্রতি আগ্রহশীল। তিনি 'ভাঙার গান' শোনান, 'প্রলয়-শিখা' জ্বালান। তিনি কঠোর ও কোমল, সুন্দর ও ভীষণ, সামঞ্জস্য ও অসামঞ্জস্য, সাম্য ও বৈষম্যে বিচিত্র, দুর্দমনীয় ও গতিশীল। যৌবনের প্রাবল্য ও উদ্দীপনায় কখনো তিনি দৃপ্ত, মহৎ ও অম্লান, আবার কখনো স্খলন পতন ত্রুটিতে অসম, ভারসাম্যহীন ও দীপ্তিহীন। বলা বাহুল্য, এ সবই যৌবনের ধর্ম এবং তাই জীবনের সমগ্র সাধনায় বিধৃত, আর নজরুল এই যৌবনের কবি বলে তাঁর আবেদন এতো দুর্বার, প্রাণবন্ত এবং অনেক ত্রুটি ও তর্কসাপেক্ষ গুণ সত্ত্বেও অব্যর্থ।

নজরুল ইসলাম ও কে. মল্লিক

গোলাম কুদ্দুস

গ্রামোফোন ক্লাবে বাংলা ডিপার্টমেন্টের বড়ো-কর্তা ছিলেন ভগবতী-চরণ ভট্টাচার্য। সবাই তাঁকে ডাকতো বড়োবাবু বলে। একদিন নলিনী সরকার নামে এক ভদ্রলোক এসে বড়োবাবুর হাতে একখানা গানের খাতা দিয়ে বললো, 'দেখুন তো এই বাংলা গজল গানগুলি রেকর্ড করা যায় কিনা?'

বড়োবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কে লিখেছে?

'কাজী নজরুল ইসলাম।'

বড়োবাবু কে. মল্লিককে ডাকলেন: 'দেখুন তো এই খাতাখানা। আর এই ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলুন।'

কে. মল্লিক খাতা পড়ে দেখলো গজল ছাড়া অন্য গানও আছে। ওর মধ্য থেকে দু'খানা গান সে লিখে নিলো। 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল।' আর 'আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।' খাতাটা নলিনী সরকারের হাতে ফেরত দিয়ে বললো, 'এ দু'খানার বাজার দেখে তারপর অন্য গান নেওয়া যাবে।'

এই গান দু'খানার রেকর্ড যখন বাজারে বেরুলো তখন প্রায় এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। বড়োবাবু কে. মল্লিককে ডেকে বললেন, 'যাক, একটা নতুন লাইন পাওয়া গেলো। এ্যাদ্দিন কেবল তুমি দেহতত্ত্ব, ভজন, শ্যামা সঙ্গীত গেয়েই কাল কাটালে। এবার দেখা যাক কি হয়।'

'আর একটু স্পষ্ট করে বলুন।'

'কাজী সাহেবকে আনিয়ে আরো গান নাও না।'

কে. মল্লিক কাজী নজরুলকে গ্রামোফোন ক্লাবে নিয়ে এলো।

সেখানে কোম্পানীর পরামর্শ অনুযায়ী সুরু হলো তাঁর গান লেখা। বিদ্রোহের রণ-দামামা এখানে বাজানো যাবে না। ঝাঁঝালো স্বদেশী গান এখানে চলবে না। বৃটিশ কোম্পানীর আওতায় এ-সব বাদ দিয়ে লিখতে হবে গান, যাতে শুধু পয়সা আসে। ধর্মীয় গানে একদম কারো আপত্তি নেই। আর মানুষ তো দেশে ধর্ম-প্রবণ। অন্যান্য গানের সঙ্গে তাই একই লেখনী দিয়ে বেরুতে লাগলো দেব-দেবীর উপাসনা, নমাজ, পীর-পয়গম্বরের গান। এতদিন হিন্দু-সঙ্গীত দিয়ে মুনাফা হচ্ছিলো। এখন ইসলামী সঙ্গীত দিয়ে আরো একটি বড়ো বাজার দখল করার চেষ্টা করলো বৃটিশ কোম্পানী। কাজী নজরুল দু'য়েরই যোগান দিয়ে চললেন অপূর্ব প্রতিভা নিয়ে। এখন তিনি দু'বেলা আসতে লাগলেন গ্রামোফোন ক্লাবে। কে. মল্লিকের কণ্ঠে বেজে উঠলো কাজী নজরুলের প্রথম যুগের অনেক জনপ্রিয় গান। ফলে, কে. মল্লিকের জনপ্রিয়তা যেন দেখা দিলো নতুন করে।

এমন সময় তাকে একদিন এসে ধরলো তার এক দেশের লোক। বললো, 'আপনার তো নামডাক খুব, আমাকে একটু উঠতে দেবেন?'

'তার মানে?'

'দেখুন মল্লিকবাবু, আপনি কালনার লোক, আমার বাড়ী কাটোয়ায়। এক দেশের লোক বললেই হয়—উঠতে দেবেন আমাকে?'

কে. মল্লিক হাসি চেপে বললো, 'আপনি আমার দেশের লোক, আপনি উপরে উঠলে তো খুশির কথা। কী নাম আপনার?'

'প্রোফেসর জি. দাস। দেখুন, দেশের লোকই দেশের লোককে উঠতে দেয় না কিনা!'

মল্লিক বললো, 'কিন্তু দেখুন, আমাদের গান দেওয়ার আগে একটু পরীক্ষা করতে হয়।'

উত্তর এলো, 'বেশ, দেবো পরীক্ষা।'

প্রোফেসর জি. দাসের পরীক্ষা নেওয়া হলো। একবারেই অচল।

কথাটা শুনে প্রোফেসর জি. দাস ঠিক হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো। কে. মল্লিক যতই সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করে—'একদিন হবেই।' ততই সে দ্বিগুণ কান্নার আবেগে ফুলে ফুলে উঠে বলতে লাগলো, 'আমি আঙুরবালাকে মা বলেছি, ইন্দুবালাকে মাসি বলেছি আর আমাকে কিনা—'

কথাটা শেষ না করেই প্রোফেসর জি. দাস আবার কাঁদতে লাগলেন। তখন বড়োবাবু এসে বললেন, 'কী ব্যাপার?'

প্রোফেসর জি. দাস চোখ মুছে বললেন, 'রেকর্ডে নাকি আমার গান গাওয়া হবে না?'

বড়োবাবু জবাব দিলেন, 'এখনও তোমার গান ভালো হচ্ছে না, সুর তাল ঠিক থাকছে না।'

হঠাৎ প্রোফেসর জি. দাস প্রশ্ন করলেন, 'তবে কি আমার সীতাভোগ মিহিদানা খাওয়ানো ব্যর্থ হলো?'

বড়োবাবু অবাক হয়ে শুধোলেন, 'কে তোমার মিষ্টি খেয়েছে?'

উত্তর এলো, 'বীরেনবাবু আর কমলবাবু। কে. মল্লিক আমাকে হিংসে করে গান গাইতে দিচ্ছে না, ওরা আমাকে বলেছে।'

বড়োবাবু হেসে ফেললেন। এই বোকা লোকটাকে ঠকিয়ে ওরা মিষ্টি খেয়ে কে. মল্লিকের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে মজা দেখার জন্যে।

এমন সময় কাজী নজরুল এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রোফেসর বলেই যাচ্ছে, 'ওরা আমাকে কথা দিয়েছিলো একখানা রেকর্ড অন্ততঃ হবেই, আজ কিনা বলে কিছু হবে না।'

কাজী নজরুল সব শুনে বললেন, 'দেখুন মল্লিক, এঁকে যখন একখানা রেকর্ড নেওয়ার কথা দেওয়া হয়েছে তখন সে কথা রাখতেই হবে।'

মল্লিক বললো, 'বলেন কি, লোকটা পাগল দেখছেন না।'

'কিন্তু বাংলা দেশটাও কম হুজুগে নয় মল্লিক', বললেন কাজী

নজরুল। তারপর প্রোফেসরের দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি আজ যাও, কাল এসো—আমি তোমাকে শিখিয়ে রেকর্ড করাবো।'

জি. দাস একগাল হেসে চলে গেলো। পরদিন কাজী নজরুল দেখেন অনেক আগেই প্রোফেসর হাজির। তাকে বললেন, 'মল্লিককে ডেকে আনো।'

প্রোফেসর জবাব দিলো, 'কাজী সাহেব, মল্লিক আমার শত্রু। আমার গান খারাপ করে দেবে।'

কাজী নজরুল আশ্বাস দিলেন, 'জানো না, কে. মল্লিক খুব ভালো লোক। তোমার সঙ্গে কেমন সুন্দর হারমোনিয়াম বাজাবে দেখো!'

কে. মল্লিক ঘরে ঢুকতেই কাজী নজরুল বললেন, 'আসুন মল্লিক সাহেব। আর জি. দাস, তুমি কপাটে খিল এঁটে দাও। তার আগে তবলাওয়ালাকে ডাকো।'

ঘরে রইলো তখন চারজন।

কাজী নজরুল বললেন, 'শোনো জি. দাস, কেউ যদি জিজ্ঞেস করে —কী গাইবে, কিছুতেই বলবে না। খুব সাবধান। বাজারে রেকর্ড বের হলে তখন শুনবে।'

জি. দাস সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে বললো, 'না, কাউকে আগে শোনাবো না।'

কাজী নজরুল বললেন, 'আচ্ছা, তাহলে ধরো এইবার গান :

'কলগাড়ী যায় ভষড় ভষড়,
ছ্যাক্‌রা গাড়ী যায় খচাং খচ্
ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
কুলকুচি দেয় করে ফচ্।'

পরের দিন কাজী নজরুল এই গানের জোড়া লিখে আনলেন :

'মরি হায় হায় হায়
কুব্‌জার কী রূপের বাহার দেখো।

তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা
উপুড় করলে হয় সাঁকো।
হরিঘোষের চার নম্বর খুঁটো
মরি হায় হায় হায়।'

প্রোফেসরকে চতুষ্পদ বানানো হচ্ছে তাও সে বুঝলে না। খুব উৎসাহে চালাতে লাগলো রিহার্সেল। রেকর্ডিং ম্যানেজারকে বলা হলো না কী গান রেকর্ড করা হচ্ছে। আর সে সাহেব বাংলা প্রায় বোঝেই না। কাজেই কেউ হঠাৎ টের পেয়ে বাধাও দিতে পারলো না। খুব গোপনেই গান দুখানা রেকর্ড হলো। কয়েকদিন পর বেরুলো বাজারে।

কাজী এসে বললেন, 'মল্লিক, দেখুন তো একবার বাজারে খোঁজ নিয়ে।'

'খোঁজ নিয়েছি! খুব বিক্রি! খদ্দেররা কিনছে আর বলছে, কলগাড়ী যায় ভষড় ভষড়।'

হিগিন্‌স তো ভীষণ খুশি। বড়বাবুকে ডেকে বললো, 'ভটচায'! তুমি বলো লোকটা ক্ষ্যাপা। বেশ তো সেল হচ্ছে! আরো গান নাও।'

শুনে কাজী নজরুল বললেন, 'মল্লিক সাহেব, এবার কিন্তু গালাগাল খেতে হবে। হুজুগে দেশে ওরকম একবারই চলে!'

ক্রমে ক্রমে কাজী নজরুলের সঙ্গে কে. মল্লিকের সম্পর্কটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো।

স্মৃতি-রঙ্গ

জুলফিকার হায়দার

১৯৩২ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে এক রবিবারের সকাল-বেলা আমি কবির বাড়ীতে গেলাম। তখন কবির বাড়ীতে নেপালী দারোয়ান, গ্যারেজে দামী মোটর। বেশ শান-শাওকতের সঙ্গেই তিনি ছিলেন। এ সময় তিনি ৩৯, সীতানাথ রোডে এক ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বাস করতেন।

বেলা তখন ৯টা। আমি সোজা দোতলায় চলে গেলাম। বৈঠকখানায় গিয়ে দেখি সিরাজগঞ্জের আসাদউদ্‌দৌলা শিরাজী বসে আছেন। আমিও আসন গ্রহণ করলাম। কিছুক্ষণ পরেই কবি এলেন। সত্যস্নাত এবং পরিচ্ছন্ন ধুতি-গেঞ্জি পরিহিত অবস্থায় সেদিন সকাল বেলায় কবিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিলো। তিনি আমাদের সাথে ঢালা বিছানায় আসন গ্রহণ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে, তোমরা কতক্ষণ থেকে বসে আছো?'

আসাদউদ্‌দৌলা শিরাজী অবশ্যি পূর্ব থেকেই কবির বৈঠকখানায় বসেছিলেন। আমি বললাম, 'এই কিছুক্ষণ হলো।'

শিরাজী সাহেব সিরাজগঞ্জে নিখিলবঙ্গ মুসলিম যুব-সম্মেলন অনুষ্ঠানের ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে কবির দরবারে হাজির হয়েছিলেন। এ-কথা সে-কথার পর তিনি তাঁর প্রস্তাব পেশ করলেন। সেই আসন্ন সম্মেলনে কবিকে সভাপতিত্ব করতে হবে। কবি শুনেই তাঁর স্বভাবসুলভ হাসির তরঙ্গ তুলে বললেন, 'তুমি আর লোক পেলে না? আমাকে দিয়ে এ-সব হবে-টবে না। কি বলতে কি বলে ফেলবো। শেষটায় হয়তো কাফের ফতোয়ায় আমাকে অভিষিক্ত করবে। নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলন করতে চাও—বেশ, করো। কিন্তু সভাপতিত্ব করার জন্য অন্য কাউকে গিয়ে ধরো—আমাকে নয়।

শুনছো আসাদ, যুব-সম্মেলনে বলবার কথা আমার যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু তোমার দেশ তো তা চায় না।'

কবির কথাবার্তার মধ্যে বেদনামিশ্রিত অভিমানের সুর সুস্পষ্ট লক্ষ্য করলাম। কিন্তু শিরাজী সাহেব নাছোড়বান্দা। তিনি বার বার একান্তভাবে কবিকে অনুরোধ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত কবি রাজী হলেন।

সিরাজগঞ্জে নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছিলো ঠিক এই দিনের দিন দশেক পরে। সময়টা যতদূর মনে পড়ছে উনিশশো বত্রিশ সালের ৫ই এবং ৬ই নভেম্বর। কবির ওখানেই স্থির হয়েছিলো তাঁর সাথে কলকাতা থেকে কে কে সিরাজগঞ্জে যাবেন। তাদের মধ্যে আমিও একজন।

যথা নির্ধারিত দিনে আমি আমার পার্ক সার্কাসের বাসভবন থেকে গাড়ী ছাড়বার মিনিট পনেরো পূর্বে শিয়ালদা স্টেশনে গিয়ে পৌঁছাই। সাথে সাথে কবিকে নিয়ে শিরাজী সাহেবও এসে হাজির হন। তাঁদের সাথে রয়েছেন বন্ধুবর আব্বাসউদ্দীন। এবং মোমেনশাহীর প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব গিয়াসউদ্দীন সাহেব। তিনি তখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।

গাড়ী যথাসময়ে স্টেশন ছেড়ে ছুটে চললো। এই সুদীর্ঘ রাস্তায় কবির অপূর্ব রসালাপের মধ্যে কি করে যে সময় কেটে গেলো, টেরও পেলাম না। অবশ্য মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য কবি শুয়ে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

যথাসময়ে ট্রেন সিরাজগঞ্জ স্টেশনে এসে পৌঁছলো। আগে থেকেই কয়েক সমস্র জনতা, বিশেষ করে ছাত্র এবং যুবকেরা কবিকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করছিলো। গাড়ীর গতি স্টেশনে এসে স্তিমিত হয়ে আসতেই হাজার কণ্ঠে 'কবি নজরুল ইসলাম জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো। কবি নামলেন। আমরাও সাথে সাথে নেমে পড়লাম। কবিকে মালা

পরানো হলো। এই অপূর্ব সংবর্ধনার দৃশ্য দেখে আমার দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়লো।

মিছিল করে জনতা কবিকে নিয়ে চললো নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানে। মুহুর্মুহু 'বিদ্রোহী কবি জিন্দাবাদ' আওয়াজ ধ্বনিত হতে লাগলো, আর সহস্র কণ্ঠের সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে আশেপাশে দূরদূরান্তের আলো-বাতাস সব কিছুকেই যেন উজ্জীবিত করে তুললো।

মিছিল গিয়ে শেষ হলো একেবারে যমুনা নদীর তীরে—সুন্দর এক বাংলোর সামনে। আমরা সেখানে উন্মুক্ত চত্বরে আসন গ্রহণ করলাম।

মিনিট দশেক পরে শিরাজী সাহেব সমাগত জনতাকে সম্বোধন করে অনুরোধ জানালেন, 'এখন কবি কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন। রেল ভ্রমণের পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আপনারা দয়া করে এখন চলে যান। কবি যা বলবেন তা শুনবার জন্যই প্রকাশ্য অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা অবশ্যই সেই অধিবেশনে কবির বাণী শুনবার সুযোগ লাভ করবেন।'

যমুনার তীরে অবস্থিত বাংলোয় আমাদের থাকার ব্যবস্থা সত্যিই চমৎকার হয়েছিলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সুব্যবস্থাই করেছিলেন।

প্রকাশ্য অধিবেশনে যথেষ্ট লোক সমাগম হয়েছিলো। কবি অভিভাষণ সমবেত শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছিলো। দ্বিতীয় দিবে কবির কণ্ঠে তাঁর 'নারী' কবিতার আবৃত্তি সমবেত সকলকে অভিভূত করে রেখেছিলো।

সেই সম্মেলনে কবির নিজের গান এবং আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে বিভিন্ন নজরুল-সঙ্গীত সিরাজগঞ্জ শহরকে যেন মোহাবিষ্ট করে রেখেছিলো।

বেশ মনে পড়ছে সম্মেলনশেষে জনাব আফজল মোক্তার সাহেবের

পরপৃষ্ঠায় লেখকের সহধর্মিণীকে লিখে দেওয়া কবির একটি কবিতার পাণ্ডুলিপি চিত্র।

স্নেহ কল্যাণীয়া বধূ মাতা
রাবেয়া হায়দর-
চিরায়ুষ্মতীষু

যেদিন মনের মরোক্কো হইতে বোরকা ফেলিলে টানি
ফিরদৌসের আনার-কলি হ'লে তুমি, কল্যাণী!
তব মুক্ত মনের উদার আকাশে,
কত তারা ফোটে, কত চাঁদ হাসে
তোমার কথার পারাবতগুলি চঞ্চল পাখা হানি'
দিগ্‌দিগন্তে উড়ে চলে সব শুনায়ে সবার বাণী।

হেরেমের নহ, তুমি আরবের বাগিচার মঞ্জরি,
পল্লব-অঞ্চল ঢাকা দিয়ে শুধুই শাখায় [illegible]।
উঠিয়া সহসা মুখের নেকাব
হেরিলে, ঈদের চাঁদের রেকাব
টুটে গেছে অবরোধ-ঘন মেঘ ভেঙে পরী'
[illegible]

জুলফেকারের পাশে তব কালো জুলফের ছায়া দোলে
কওসর-সাকী হায়দরের, কি পিয়ালা তোমার কোলে
জৈতুন-রাঙা কওসর নিয়ে
হেরেমে হেরেমে প্রদীপ জ্বালিয়ে
এস তাপসিনী রাবেয়া! ওঠ শুকতারা সম জেগে,
কোহ-ই-তুর হ'তে নূর আনো এই আঁধির দিগঞ্চলে!

নিত্য শুভার্থী -
কাজী নজরুল ইসলাম

ফেব্রুয়ারী ১৯৪১।

বাড়ীতে কবি ও তাঁর দলবলের জন্য এক সংবর্ধনা-ভোজের আয়োজন করা হয়েছিলো। ভোজন পর্বের পর কবি ও আমরা ঘোড়ার গাড়ীতে চেপে বসলাম। গাড়ী সবেমাত্র চলতে শুরু করেছে, এমন সময় আফজল সাহেব বেশ জোরে চিৎকার করেই গাড়োয়ানকে বললেন, 'থামাও থামাও।'

আমরা রীতিমতো বিস্মিত হলাম। ব্যাপার কী! তিনি গাড়ীর দরজার কাছে এসে হেসে বললেন, 'কবিকে দেখার জন্য বাড়ীর মেয়েদের একান্ত ইচ্ছা। কবি একটু কষ্ট করে গাড়ীতে উঠে দাঁড়ালেই---খোলা গাড়ী ছিলো—তাদের মনের আশা মিটে যায়।'

কবি হো-হো করে হেসেই আকুল। বললেন, 'কি মুসকিল!'

কবি অবশ্য উঠে দাঁড়ালেন। মেয়েরা আধ-আড়াল থেকে কবিকে এক নজর দেখে নিলেন।

সেখান থেকে মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমাধি জিয়ারত করার জন্য কবি এবং আমরা আসাদ্উদ্দৌলা শিরাজী সাহেবের বাড়ী বাণীকুঞ্জে গেলাম। মুসলিম বাংলার অগ্নিপুরুষ 'অনল-প্রবাহের' প্রখ্যাত লেখক, অনন্যসাধারণ বাগ্মী ও জনপ্রিয় দেশনেতা মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সমাধি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কবি অশ্রু-সজল নয়নে দু'হাত তুলে আল্লার দরগায় তাঁর আত্মার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করলেন।

অতঃপর তিনি বেদনাসিক্ত কণ্ঠে বললেন, 'কবি হিসাবে আমাকে অনল-প্রবাহের লেখক যে আদর দেখিয়েছেন, তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম পাওয়া। এমন আদর সারা বাংলায় আর কেউ আমাকে করেছে বলে আমি জানি না। তিনি এই সিরাজগঞ্জ থেকে মনি-অর্ডার করে দশটি টাকা আমাকে পাঠিয়েছিলেন এবং কুপনে লিখে দিয়েছিলেন—'এই সামান্য দশটি টাকা আমার আন্তরিক স্নেহের প্রতাকরূপ পাঠালাম। এই টাকাটা দিয়ে তুমি একটা কলম কিনে নিও। আমার কাছে এর বেশী এখন নেই। যদি বেশী থাকতো

ামি তোমাকে আরো বেশী পাঠিয়ে দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে রতাম। তা হলো না।'

কবির কণ্ঠ সেই মহান, পরম পুরুষের স্নেহ-স্মৃতি স্মরণে কেমন যেন বদনা বিধুর হয়ে উঠলো। বহু স্মৃতি-বিজড়িত শ্রদ্ধা সিক্ত-গ্রন্থির মোচনে আমাদের চোখও তখন অশ্রু-সজল। স্মৃতির মণিকোঠায় বির সেই গদগদ স্বগতোক্তি আজো আমার মনে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।

সিরাজগঞ্জ সম্মেলন শেষ হলো। তৃতীয় দিনে আমরা লকাতায় ফিরে এলাম। আসবার সময় কবি অধিকাংশ সময় মিয়েই কাটালেন। খুব সম্ভবতঃ কর্মব্যস্ততার দরুণ তিনি অতি াত্রায় ক্লান্তিবোধ করছিলেন। সিরাজগঞ্জে কবির সঙ্গে একটানা তন দিন কাটিয়ে আমি অপূর্ব অভিজ্ঞতা লাভ করেছি—বিশেষ করে বির চটুল রসজ্ঞান সম্পর্কে। এখানে তাই কয়েকটি ছোটো ঘটনার ল্লেখ করছি।

যমুনার তীরে সেই বাংলোয় খেতে বসেছি। আসাদউদ্‌দৌলা াহেব ও গিয়াসউদ্দীন সাহেব পরিবেশন করছিলেন। তাঁরা াতে পাতে ইলিশ মাছ-ভাজা দিয়ে চলেছেন। কবির পাতেও তা ওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কবি বেশ বড়ো দু'টুকরো মাছ-ভাজা য়েছেন। এমন সময় একজন পরিবেশক যেই কবির পাতে আরও ছু ইল্‌শে-ভাজা দিতে যাচ্ছিলেন অমনি কবি তাকে বাধা দিয়ে লে উঠলেন, 'আরে করছো কি! শেষকালে আমাকে বিড়ালে ামড়াবে যে!'

সকলে কথাটা ধরতে পারেনি! গিয়াসউদ্দীন সাহেব তখন লেন, 'মানে!'

কবি হো হো করে হেসে বললেন, 'ও, বুঝতে পাচ্ছেন না! শে মাছ—যে মাছের গন্ধ মুখে লালা ঝরায়, বিড়ালকে মাতাল রে তোলে। বেশী খেলে কি আর রক্ষে আছে! সারা দেহ থেকে ছুটবে আর সেই গন্ধ পেয়ে বিড়াল তেড়ে আসবে।'

সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

ভোজনপর্ব প্রায় শেষ। এবার শিরাজী সাহেব কবির পাতে দই ঢেলে দিলেন। একটুখানি দই মুখে দিয়েই কবি অদ্ভুত ভঙ্গী করে শিরাজীর দিকে চাইলেন এবং ডাগর দুই চোখ তুলে বললেন, 'কি হে! তুমি কি এই দই তেঁতুল গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এলে নাকি!'

আবার সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। বলা বাহুল্য, দই টক ছিলো।

খাওয়া-দাওয়ার পর কবি পান-জরদা মুখে পুরে উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে আস্সালামু আলাইকুম বলে কবির সামনে দাঁড়ালেন। কবি পরম বিস্ময়ের সাথে বলে উঠলেন, 'আরে, দুর্গাদাসবাবুর মুখে আস্সালামু আলাইকুম যে!' উপস্থিত সকলেই তখন আর এক পশলা হেসে নিলেন—ছাদ ফাটানো সে হাসি!

সত্যিই, সেই আগন্তুক ভদ্রলোক বাংলা নাট্যমঞ্চের বিখ্যাত নট দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই সুদর্শন ছিলেন। তিনি বিনীতভাবে বললেন, 'আমি বন্দ্যোপাধ্যায় নই, আমি সৈয়দ। এই তো রায়পুরে আমার বাড়ী।'

আবার সেই হাসি।

কবির সংশ্রবে যাঁরা কিছু সময় কাটাবার সুযোগ লাভ করেছেন তাঁরা উপলব্ধি করেছেন—কবির সৌন্দর্যবোধ, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গি কতো সুন্দর ছিলো। তিনি শুধু মাত্র বিপ্লবী এ-কথাটাই অনেকে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু বিনয় নম্রতায়, কোমল প্রাণের পেলবতায়, বন্ধু-বাৎসল্যের মাধুর্যে—এক কথায় জীবনের সর্বদিক দিয়ে এক অসাধারণ শক্তি ও গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিলো।

স্মৃতির গ্রামোফোনে··· হেমেন্দ্রকুমার রায়

নজরুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে কতটা মধুর ঘনিষ্ঠ, কোনো রকম বর্ণনা করেই সেটা আমি বোঝাতে পারবো না। আমাকে তিনি খালি মুখেই দাদা বলে ডাকতেন না, সত্যই বড়ো ভাইয়ের মত দেখতেন। যখন তখন ছুটে আসতেন আমার কাছে। প্রায়ই আমার বাড়ীতে কাটিয়ে দিতেন একটানা চার, পাঁচ, ছয় দিন। আমরা একসঙ্গে আহার ও শয়ন করতুম। বাকি সব সময়টা কোথা দিয়ে চলে যেতো তাঁর কণ্ঠে গান আর গান আর গান শুনে। তখন তিনি সংসারী, তাঁর বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব উঠেছে, কিন্তু এটা বুঝেও তিনি কিছুমাত্র ব্যস্ত নন, নিশ্চিন্তভাবে চায়ের পেয়ালা খালি করছেন, পান মুখে পুরছেন আর গাইছেন।

আমার বড় মেয়ের বিয়েতে নজরুলকে নিমন্ত্রণ করতে সাহস করি নি। হিন্দুর বাড়ী, আত্মীয়স্বজনের অধিকাংশই ছুঁতমার্গ মেনে চলেন। কিন্তু বিবাহের দিন সন্ধ্যাবেলায় অনাহুত নজরুল নিজেই এসে হাজির অম্লানবদনে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অসন্তোষের সাড়া জাগতেও বিলম্ব হলো না। কিন্তু আমি দুই কূল বজায় রেখেছিলুম, বন্ধুদের ও আত্মীয়দের পৃথক স্থানে আহারের ব্যবস্থা করে।

গঙ্গার ধারে আমার নূতন বাড়ী। পূর্ণিমার রাত্রি। অকস্মাৎ নজরুলের আভির্ভাব! চীৎকার করে উঠলেন, 'দে গরুর গা ধুইয়ে। বাঃ, কি জায়গায় বাড়ী করেছো দাদা? আজ আমার এখানেই আহার ও শয়ন।'

তারপরেই হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে চন্দ্রকর-পুলকিত গঙ্গার দিকে তাকিয়ে গান গাইতে বসলেন।

স্মৃতির গ্রামোফোনে সেই সব গান রেকর্ড করে রেখেছি, আজও তা শুনতে পাই যখন আবার আসে পূর্ণিমার রাত, গঙ্গাজলে সাঁতার কাটে চাঁদের আলো।

কিন্তু নজরুল আজ থেকেও নেই!

নিষ্ঠুর সত্য!

কাজী সাহেব

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ বাহার

কাজী সাহেবের সঙ্গে প্রথম দেখা আমার হুগলীতে, কিন্তু তার বহু আগেই তাঁকে মেনে নিয়েছি জীবন পথের অগ্রদূত হিসাবে। হঠাৎ একদিন বন্ধুবর মঈনুদ্দীনের সঙ্গে হুগলীতে রেলের লাইনের ধারে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম। শুনলাম, তিনি উত্তর-পাড়ায় এক সভায় গেছেন। রাত্রি ন'টার সময় তিনি ফুলের মালা গলায় পরে বাড়ী ফিরে এলেন। বিশেষ পরিচয় করে দিতে হলো না। দেখেই তিনি হেসে উঠলেন, যেন যুগ যুগের চেনা। উপস্থিত কেউ বুঝতেও পারলো না, সেই আমাদের প্রথম পরিচয়।

কাজী সাহেব চট্টগ্রামে আমাদের বাড়ী গিয়েছেন কয়েকবার। যে ক'দিন তিনি ছিলেন চট্টগ্রামে, মনে হতো বাড়ীখানি যেন ভেঙে পড়বে। রাত্রি দশটায় থারমোফ্লাস্কে ভরে চা, বাটা ভরা পান, কালিভরা ফাউন্টেন পেন আর মোটা মোটা খাতা দিয়ে তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম।

সকালে উঠে দেখতাম, খাতা ভর্তি কবিতা। এক-এক করে 'সিন্ধু', 'তিন তরঙ্গ', 'গোপন প্রিয়া,' 'অনামিকা,' 'কর্ণফুলি, 'মিলন মোহানায়,' 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি,' 'নবীনচন্দ্র,' 'বাংলার আজিজ,' 'শিশু যাদুকর,' 'সাত-ভাই চম্পা'—আরও কতো কবিতা লিখেছেন আমাদের বাড়ীতে বসে। চট্টগ্রামের নদী, সমুদ্র, পাহাড়, আমাদের বাড়ীর সুপারী গাছগুলো আজ অমর হয়ে আছে তাঁর সাহিত্যে।

সারারাত কবি চা আর পান খেতেন—আর খাতা ভর্তি করতেন কবিতা দিয়ে। দুপুরে কখনো কিছু পড়তেন, কখনো করতেন পামিষ্ট্রীর চর্চা, কখনো বা মশগুল হতেন দাবা খেলায়। বিকেলে দল বেঁধে যেতাম নদীতে, সমুদ্রে। সাম্পানওয়ালারা এসে জুটতো, সুর

করে চলতো সাম্পানের গান। সবাই মিলে গান ধরতাম, 'আমার সাম্পান যাত্রী না লয়, ভাংগা আমার তরী',…'ওগো, গহীন জলের নদী'…এক-এক সময় চট্টগ্রামী সাম্পানওয়ালারা গাইতো—'বঁধুর আমার চাটি গাঁ বাড়ী—বঁধুর আমার নন্দীর কূলে ঘর'।

এক-একবার বেড়াতে যেতাম ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে। কখনো পরতেন তিনি আরবী পোশাক, কখনো বা ব্রিচেস। কাজী সাহেবকে নিয়ে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের পাহাড়, জঙ্গল, হ্রদ, জলপ্রপাত, খালবিল, নদী-চরে বেড়িয়েছি। সঙ্গে ছেলের দল। এতবড়ো বিদ্রোহী বীর, কিন্তু জোঁককে তিনি বড়ো ভয় করতেন। একবার সীতাকুণ্ডের পাহাড়ে উঠে জোঁকের ভয়ে আর তিনি নামতে চান না। কয়েকজনে মিলে কাঁধে করে তাঁকে নামাতে হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আমার জীবনের মজার ঘটনা কাজী সাহেবকে নিয়ে। আমার আত্মীয়েরা সকলেই প্রায় সরকারী চাকুরে। সবাই ধরে বসলেন—আমাকে আই. সি. এস. পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষায় পাশ হলাম, ডাক্তারী পরীক্ষা হয়ে গেলো। শুধু Secretary of State এর মঞ্জুরী বাকী। কাজী সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করা হলো, নিযুক্তি পত্র এলে কলকাতা কংগ্রেসের সময় মঞ্চের উপর উঠে পদত্যাগের কথা ঘোষণা হবে। কাজীদার ভক্ত-শিষ্য পুলিশের চাকরি করবে, তিনি সইতে পারতেন না। পদত্যাগ আমাকে আর করতে হয়নি, কথাটি আগেই বেরিয়ে পড়েছিলো। টেগার্ট সাহেবের দৌলতে ইংরেজের চাকরির খাতা থেকে আমার নাম কেটে যায় চিরদিনের জন্য। আমি তখন কাজী সাহেবকে নিয়ে সভা করে বেড়াচ্ছি কাজী সাহেব বক্তৃতা করছেন, 'গান্ধীজীর দল কাটছে চরকা—আমরা কাটবো মাথা।' কাজী সাহেবের মনে কারুর প্রতি বিদ্বেষ দেখিনি কোনদিন। তিনি ছিলেন সকল ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে। মাঝে মাঝে তিনি বলতেন ঃ

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

গরুর গায়ে পানি ঢেলে দিলে সে যেমন করে আনন্দে লাফাতে থাকে, তার মধ্যে তখন থাকে না বিদ্বেষ-বিষ, সে-রকম অনাবিল আনন্দের ধ্বনি এই :

'দে গরুর গা ধুইয়ে।'

নজরুলকে 'জাতীয় কবি' বললেই সবটুকু বলা হলো না আমাদের জীবনে নজরুল ইসলাম কতখানি জায়গা জুড়ে আছেন পরিমাপ করা সহজ নয়। এক কথায় বলতে গেলে কাজীদাকে বাদ দিয়ে আমরা নিজের কথা ভাবতেই পারিনে। আমাদের রাজনীতি, আমাদের সাহিত্য, আমাদের মানস ও মনন—এক কথায় আমাদের জীবনের অনেকখানি তো তাঁরই হাতে গড়া।

নজরুল ধাপের পর ধাপ পরিশ্রম করে সাহিত্যের যশের মন্দিরে এসে উপস্থিত হয়নি···যেদিন সে এলো, সে দিনই সে বিজয়ীর মতো এলো···কালবৈশাখীর অকস্মাৎ ঝড় যেমন হঠাৎ আসে অরণ্য উতলা করে পথঘুর্ণি তুলে, পথিকদের সন্ত্রস্ত সচকিত ক'রে গৃহস্থের টিনের চাল উড়িয়ে দিয়ে, ঝঞ্চার মঞ্জীর বাজিয়ে।

প্রচণ্ড মহীরুহ ভেঙে দুমড়ে ফেলে আনন্দের অট্টহাস্যে ঘোষণা করে, আমি এসেছি···তুমি যাও বা না-যাও তাতে আমার কিছু যায় আসে না···বাংলার সমসাময়িক সাহিত্য ও সমাজে নজরুল ঠিক সেইভাবেই প্রবেশ করে, একদিন অকস্মাৎ ঝড়ের মতন, বিজয়ীর মতন। তাকে খুঁজে নিতে হয়নি তার আসন, সে এসে মহা-অভ্যাগতের মতন যেখানে বসেছে, সেখানেই তার আসন রচিত হয়েছে। সাহিত্য-জগতে তার এই প্রবেশের সঙ্গে তার সমগ্র সাহিত্যিক জীবনের বিবর্তনই এক সুর ও এক ছন্দে গাঁথা।

কালবৈশাখী যেমন কোথা থেকে এলো, কি করে এলো, আসতে না আসতেই কোথা থেকে নিয়ে এলো এই প্রচণ্ড কালো মেঘের প্রমত্ত ছুটে চলা, তা যেমন কেউ জিজ্ঞাসা করবার সময় পায় না, কালবৈশাখী তার অস্তিত্বের প্রচণ্ড উল্লাসে কাউকে তা জিজ্ঞাসা করবার অবকাশই দেয় না, নজরুল সম্বন্ধেও সেদিন কেউ জিজ্ঞাসা করলো না, কোথা থেকে এলে, কি করে এলে, কোথায় কখন সংগ্রহ করলে এই প্রচণ্ড গতির সংবেদন···নজরুলও কাউকে সে অবকাশ দিলো না।

শুধু এইটুকু জানা গেলো, সে হাবিলদার···যুদ্ধ ফেরত···নজরুল নিজে তার নামের মাঝে হাবিলদার কথাটিতে সংযুক্ত রাখতে ভালবাসতো। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধে যে সব বাঙালী তরুণ যোদ্ধা হিসেবে

যোগদান করেছিলো, নজরুল তাদেরই একজন···পল্টন ভেঙে দেওয়াতে তারা ফিরে এসেছে—পল্টন-জীবনের স্মৃতি নজরুল তখন নিজের অঙ্গে বহন করে বেড়াতো। তার বিচিত্র পোশাকের সঙ্গে পায়ে থাকতো মিলিটারি বুট···সে এক অদ্ভুত পোশাক···গেরুয়া রঙের চাদর···পায়ে মিলিটারি বুট···হাতে একখানা হাত-পাখা··· একরাশ এলো চুল···কাঁধ পর্যন্ত ঝুলছে দুলছে।···

আমাদের সঙ্গে যখন পরিচয় হলো তখন আমাদের কাছেও নজরুল তার পূর্ব জীবনের কথা উল্লেখ করতো না···আমরাও পীড়াপীড়ি করিনি···তার বালক কালের বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী শৈলজানন্দের কাছে যা শুনতাম, তাতে এইটুকু বুঝেছিলাম, নিদারুণ দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকে এগিয়ে আসতে হয়েছে।

আমরা সবাই তখন জীবনের অবজ্ঞাত মধ্যবিত্ত স্তর থেকে এসেছি···তাই আমাদেরই সগোত্র একজন বলে ধরে নিয়েছিলাম··· পিছনের কথা জানবার কোনো প্রয়োজনই হতো না···কারণ সামনে যাকে পেয়েছি, তার নতুনত্বের বৈচিত্র্যই মনকে আচ্ছন্ন করে রাখতো···নজরুল নিজেও নিজের সম্বন্ধে সেই কথাই বলতো, এই আমি···। এই আমার পরিচয়···এর বেশী জেনে কি লাভ?

নজরুল ইসলাম

কাজী আবদুল ওদুদ

বাঙালী পল্টন ভেঙে যাবার পরে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নজরুল যখন কলকাতায় এলেন তার কিছুদিন আগে থাকতেই 'সওগাত' ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি পত্রিকা'য় ছোটো গল্পের ধরনের কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিলো (লেখাগুলো পরে 'ব্যথার দান' ও তাঁর 'রিক্তের বেদন'-এ সংগৃহীত হয়)। সেই লেখাগুলো তখন বেশী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কেননা ঐসব পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা খুব বেশী ছিলো না; কিন্তু যাঁদের চোখে পড়েছিলো তাঁদের বেশ একটু চমক লেগেছিলো। লেখাগুলো যে খুব পাকা নয় সে-সম্বন্ধে তাঁদের বুঝিয়ে বলার কিছুমাত্র প্রয়োজন ছিলো না, তাঁদের চমক লেগেছিলো এই বড়ো কারণে যে, লেখাগুলোয় বিজ্ঞতার অভাব যতটা ছিলো প্রায় সেই অনুপাতেই তাতে ছিলো লালিত্য আর প্রাণসম্পদ।

কলকাতায় যখন নজরুল এলেন তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসর। গড়নে নাতিদীর্ঘ কিন্তু সুঠাম, ললিতশ্যাম, চোখ দুটি কিছু বেশী চঞ্চল ও উজ্জ্বল—স্নেহ মমতা কাড়বার অপূর্ব যাদু তাতে, কণ্ঠে অশ্রান্ত গান বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের যৌবনের প্রেমের গান আর কারণে অকারণে প্রাণখোলা উচ্চ হাসি। সবাই জানেন নজরুল জনপ্রিয় হয়েছিলেন অতি অল্প দিনে—তার মূলে ছিলো তাঁর এই প্রাণপ্রাচুর্যভরা মোহন নবীনতা।

অচিরে কবিতা রচনায়ও তিনি মন দিলেন। তখন জানা ছিলো না, কবিতা রচনায়, বিশেষ করে উর্দু ও বাংলা পদ মিশানো কবিতা রচনায় বালক বয়সেই তিনি অভ্যস্ত হয়েছিলেন। করাচী সেনানিবাসে এক পাঞ্জাবী হাফিজ-ভক্তের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে

হাফিজের ও ব্যাপকভাবে ফার্‌সী সাহিত্যের চর্চা করেন; হাফিজে কবিতার কিছু কিছু অনুবাদ এ সময়ে তিনি করেন। দেশে এই সম শুরু হয় খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। সে-আন্দোলনে তীব্রতা বেড়ে চললো, নজরুলের রচনা-শক্তিরও উৎকর্ষ লাভ হ লাগলো। তাঁর প্রথম যে কবিতাটি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করলে সেটির নাম 'সাত্‌-ইল্‌-আরব'—১৩২৭ সালে জ্যৈষ্ঠের 'মোসলে ভারতে' প্রকাশিত হয়। বিনয় সরকার মশায় (তিনি বোধ হয় তখ ইউরোপে ছিলেন) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কবিতাটির একা স্তবক এই :

'দুষ্‌মন্‌-লোহু ঈর্ষায় নীল
তব তরঙ্গে করে ঝিলমিল্‌।
বাঁকে বাঁকে রোষে মোচড় খেয়েছে পীয়ে নীল খুন পিণ্ডারীর!
জিন্দা বীর
'জুলফিকার' আর হায়দারী হাঁক হেথা আজো হজরত আলীর
সাতিল্‌-আরব! সাতিল্‌-আরব!! জিন্দা রেখেছে তোমার তীর।

প্রবলভাবে ভালবাসার বা ঘৃণা করবার কাল যৌবন অত্যাচারীর প্রতি নবীন কবির সেই প্রবল সহজ ঘৃণা অদ্ভুত র পেয়েছে এর ক'টি ছত্রে। এর পরে তাঁর যে কবিতাটি ব্যাপক প্রশং লাভ করলো সেটি 'খেয়া-পারের তরণী'—শ্রাবণের 'মোসলেম ভারতে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রেরই ভাদ্রের সংখ্যায় মোহিতলাল মজুমদা মশায় তাঁর উচ্চ প্রশংসা করেন। 'মোসলেম ভারতে'র ভাদ্রে সংখ্যায় প্রকাশিত 'কোরবানী' কবিতাটিও জনপ্রিয় হলো; কিন্তু উ পত্রের আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত কবির 'মোহররম্‌' কবিতা বেদনায় গভীরতায় আর ছন্দ ও মিলনের অপূর্ব চাতুর্যে বাংলা রসিক-সমাজের চিত্ত একেবারে জয় করে নিলো। এর প্রথম দু স্তবক এই :

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,—
'আম্মা লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া'
কাঁদে কোন্ ক্রন্দসী কার্‌বালা ফোরাতে,
সে কাঁদনে আঁসু আনে সীমারেরও ছোরাতে!
রুদ্র মাতন ওঠে দুনিয়া—দামেশ্‌কে—
'জয়নালে পরালে এ খুনিয়ারা বেশ কে?'
'হায় হায় হোসেনা' ওঠে রোল ঝঞ্ঝায়।
তলওয়ার কেঁপে ওঠে এজিদের পাঞ্জায়?'

লক্ষ্য করবার আছে 'খেয়াপারের তরণী'র ও মোহররম' এর রূপ ল্পনায় মুসলমান সমাজের প্রচলিত ধারণার রদবদল করতে তিনি কছুমাত্র চেষ্টা করেন নি, শুধু তাঁর ভাবাবেগের গাঢ়তা ও অপূর্ব শব্দ-যোজনা-সামর্থ্য তাঁকে এমন অভাবনীয় সাফল্য দান করেছে। 'মোহররম' বিতাটি এক অতিশয় শক্তিশালী মর্সিয়াগীতি, তার সঙ্গে তাতে প্রকাশ পেয়েছে সেই খেলাফত আন্দোলনের যুগের মুসলমানের দিগ্‌ভ্রান্ত নসিকতা। এই অধুনা-পরিত্যক্ত শেষ দুটি চরণ লক্ষণীয়:

'দুনিয়াতে দুর্মদ খুনিয়ারা ইসলাম।
লোহু লাও নাহি চাই নিষ্কাম বিশ্রাম॥'

এই তিনটি কবিতা পেয়ে বাংলার রসিক সমাজ সেদিন যেরূপ কৃত্রিম অনুরাগে নজরুলের শিরে কবি-যশের মুকুট পরিয়ে য়েছিলেন তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে খুব বেশী নেই। কিন্তু এমন ঝদারির পরিচয় দিয়ে বাংলার রসিক-সমাজ সেদিন অবিবেচনার রিচয় দেন নি। এই তিনটি কবিতায় বাস্তবিকই রয়েছে নজরুল-তিভার এক বিশিষ্ট পরিচয়—অপূর্ব বীর্যবন্ত তরুণ কবির শিল্প-তিভার পর্যাপ্ত পরিচয় যা পরবর্তীকালে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর তিভার মহত্তর পরিচয়ের মধ্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে বিরলভাবেই। দ্যর ক্ষেত্রে তাঁর এই শিল্প-প্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় বহন করেছে র এই যুগের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা'।

'প্রভাতী' কবি নজরুল

সুখলতা রাও

নজরুলের ছোটদের কবিতার কথা কিছু লিখতে বলেছেন। ছোটদের কবিতা নজরুল খুব বেশী লেখেন নি। তবে যে ক'টি লিখেছেন, তার মধ্যে বিশেষ করে একটি কবিতার কথা আমি বলবো। সেটি হলো তাঁর 'প্রভাতী' কবিতা। এই কবিতাটিকে আমি ছোটদের মনে সুন্দরভাবে ছাপ ফেলতে দেখেছি। ছোটদের কবিতা আবৃত্তি শেখানো আর ছন্দের কান তৈরী করতে এমন কবিতা বাংলা শিশু সাহিত্যে খুব বেশী নেই, এ-কথা আমি বলতে পারি।

মানুষের জীবনে প্রত্যেক দিনই প্রভাত আসে। ভোর হয়। সুন্দর একটি সকাল দিয়ে প্রতিটি দিনের কাজ হয় শুরু। তা নজরুল তাঁর এই 'প্রভাতী' কবিতা দিয়ে সব শিশুদের চোখের সুমুখে যেন এক চির-চেনা প্রভাতকে নতুন সাজে এনে মেলে ধরেছেন। তাঁর এই কবিতায় নানা রঙে রাঙা প্রভাতের ছবিটি কী মনোমুগ্ধকর! পাহাড়ী ঝর্নার মতো শীর্ণ, অথচ চঞ্চল গতিতে চলছে এগিয়ে :

ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে!
ঐ ডাকে জুঁই শাখে ফুল খুকি ছোটো রে!
খুকুমণি ওঠো রে!
রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ,
দারোয়ান গায় গান শোনো ঐ, রামা হৈ।

আকাশে রবি মামা রাঙা জামা গায়ে দিয়ে দেখা দিয়েছে জুঁই-ডালে ছোটো ফুল খুকির ডাক, ওদিকে সাত-সকালে ইয়া চও গোঁফো দারোয়ান 'রামা হৈ রামা হৈ' করে গান জুড়েছে—এ সব ছোটোদের চিত্ত অকর্ষণ করার মতো টুকরো রঙিন ছবির মেলা।

এই শুধু নয়, খুকু জেগে উঠলে পরে কবি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রাভাতিক কর্তব্য :

নাই রাত মুখ হাত ধোও, খুকু জাগো রে!
জয় গানে ভগবানে তুষি' বর মাগো রে!

আগেকার দিনে, যুগে যুগে ছোটরা কবিতা-পাঠ শিখতো 'পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল' দিয়ে। এখন সে জায়গা নিয়েছে নজরুলের এই 'ভোর হলো দোর খোলো' কবিতা।

ছোটদের খেলার রাজ্যে তাদের মন জয় করার এমন কবিতা আমাদের শিশু-সাহিত্যে আজকাল আর লেখা হয় না বললেই হয়।

অনেকদিন আগে উড়িষ্যার এক বাঙালী শিশু-অনুষ্ঠানে নজরুলের এই 'প্রভাতী' কবিতা দিয়ে তৈরী একটি নৃত্যানুষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সেই দিনই বুঝেছিলাম, ছোটদের মনে এই কবিতা কতখানি ছাপ ফেলতে পেরেছে। সে নাচের অনুষ্ঠানে ছোট ছোট অনেকগুলি চরিত্র তারা তৈরী করেছিলো—ফুল খুকি, রবিমামা, গান গাওয়া দারোয়ান, আর বিছানায় শোয়া খুকুমণি তো ছিলই।

শুধু এই 'প্রভাতী' নয়, নজরুল আরো কয়েকটি খুব ভালো ছোটদের কবিতা লিখেছেন—ঝিঙেফুল, খুকু ও কাঠবেড়ালী, খাঁদু দাদু, লিচু চোর—এই সব। কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয়েছে—তাঁর অন্য সব কবিতা পড়ে ছোটরা আনন্দ পেতে পারে, কিন্তু তাদের মনে সত্যিকারের সাড়া জাগাবার মতো কবিতা ঐ একটিই—ঐ 'প্রভাতী'। আর এমন কবিতা অন্য কেউ লিখতেও পারলেন না। তাই এ জায়গায় নজরুল ইসলাম সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কল্পতরু কাজিদা

অখিল নিয়োগী

যে সময়ের কথা বলছি তখন কাজিদা সঙ্গীত-সাগরে নিত্য ভাসমান।

প্রত্যহ গ্রামোফোন রিহার্সেল রুমে সকাল থেকে কাজিদা রাশি রাশি গান রচনা করতেন, তাতে সুর দিতেন, আবার বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে সেই গানগুলি তুলে দিতেন। কারো জন্যে লিখতেন গজল, কারো দেশাত্মবোধক গান, কারো শ্যামাসঙ্গীত, আবার কারো জন্যে ইসলামী সঙ্গীত। একাসনে বসে তিনি সঙ্গীত রচনা করে যেতেন।

এই সময়ে পল্লী অঞ্চলের জন্যে আমার লেখা একটি পালা রেকর্ড এইচ. এম ভি. থেকে প্রকাশিত হল। গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন হেম গুহ মশাই। তিনি আমাকে 'নৌকোবিলাস' পালাটি রচনা করতে বলেন। যথা সময়ে আমি পালাটি রচনা করে হেমবাবুর হাতে তুলে দিই। সুরশিল্পী ধীরেন দাসের ওপর ভার দেয়া হয় গানগুলিতে সুর সংযোজনা করে 'নৌকোবিলাস' পালাটি রেকর্ড করার। তিনি বহু পরিশ্রম করে পল্লী অঞ্চলের ছেলেদের এনে তাদের শিখিয়ে পালাটি রেকর্ড করান। যেদিন গ্রামোফোন রিহার্সেল রুমে সবাইকে সেই পালা রেকর্ড শোনানো হল—কাজিদাও আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কাজিদা পালাটা আগাগোড়া মাথা নেড়ে নেড়ে শুনলেন, তারপর আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বল্লেন, অখিল, তোমার পালাটা লেখা বেশ ভালই হয়েছে। মনে হচ্ছে চলবে। তবে আমায় যদি একবার দেখিয়ে নিতে তা হলে কয়েকটি লাইন আমি বদলে দিতাম। তা হলে এই 'নৌকোবিলাস' নিখুঁত হত।

আমি ক্ষোভ প্রকাশ করে উত্তর দিলাম, কাজিদা, এত লোক আপনাকে সব সময়ে ঘিরে থাকে যে আমি আমার এই নাটকটি আপনাকে দেখাবার সুযোগই পাইনি।

কাজিদা হো-হো করে হেসে উঠে বল্লেন, আরে চক্রব্যূহ যতই শক্ত হোক—তোমার জন্য আমি নিশ্চয়ই সময় করে নিতাম।

কাজিদা সকল ব্যাপারেই বন্ধুদের কাজ আগে সমাপন করতেন। এই সময়ে আমি তাঁর কয়েকটি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটও এঁকে দিয়েছিলাম। তিনি সব সময়ে তার প্রশংসা করে বেড়াতেন। নতুন কাজ হলেই আমায় ডেকে পাঠাতেন।

আর একবারের ঘটনার কথা মনে পড়ে।

ফজলুল হক্ সাহেব তখন অবিভক্ত বাঙলার প্রধানমন্ত্রী।

তিনি 'নবযুগ' নামে একটি দৈনিক কাগজ প্রকাশ করলেন। তার সম্পাদক আবার কে হবে—কাজি নজরুল ইসলাম ছাড়া?

সারকুলার রোডে—(বর্তমান প্রাচী সিনেমার কাছে) এক বিরাট বাড়ি ভাড়া নেয়া হল। কবি কাজি নজরুল তাঁর গৈরিক রঙের উত্তরীয় দুলিয়ে এসে হাজির হলেন। সেই সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগে এলেন আমাদের আর একজন বন্ধু—কালিপদ গুহ রায়। আমিও গুটি গুটি এসে হাজির হলাম—ছোটদের বিভাগটি পরিচালনার জন্য। আমাকে কিন্তু এক সঙ্গে দুটি বিভাগ দেখতে হত। সিনেমা বিভাগ আর ছোটদের বিভাগ।

কাজিদাকে মাঝখানে রেখে আমাদের সান্ধ্য-আসর দিব্যি জমে উঠল।

কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া আর চা-পর্ব চলতে লাগলো। পান ত' প্রচুর।

সে কী আনন্দের দিনগুলিই না গেছে। আমাদের কাজিদা আর কালিদা (কালিপদ গুহ রায়) ছিলেন দুই জনেই গুপ্ত সাধক। কাজেই এই দুটি আত্মভোলা মানুষ 'নবযুগে' এসে খুব জমে গেলেন।

কাজিদা এই সময়ে কবিতাতে সম্পাদকীয় লিখতে সুরু করে দিলেন। দৈনিক কাগজে সম্পাকীয়—একেবারে কবিতাতে লেখা! চারিদিকে অদ্ভুত সাড়া পড়ে গেল। এই জাতীয় বিস্ময়কর ঘটনা

ভারতের কিম্বা পৃথিবীর সাংবাদিক ইতিহাসে আর কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায় নি।

আমি হয়ত গিয়ে বলতাম, ছোটদের বিভাগের একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছি। এক্ষুনি একটা কবিতা লিখে দিন।

কাজিদার কিছুতে না নেই—।

হাসিমুখে অনুরোধ পালনে এগিয়ে এসেছেন।

কেউ বলছেন, সম্পাদকীয় বিভাগের জন্য নতুন ধরনের বড় টাইপ চাই।

—তথাস্তু!

কারো আব্দার,—নতুন ঝক্‌ঝকে ব্লক করাতে হবে।

—তথাস্তু!

কেউ এসে বল্লে, কর্মীদের অনেক কাজ,—কেউ খেয়ে আসে নি। ওবেলাও ডিউটি। কাজিদা মৃদু হেসে সকলের জন্যে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করতে বল্লেন। বন্ধু ও সুহৃদের দল ত' কোনো অনুরোধ করেই বিফলমনোরথ হয় নি। কাজিদা সব ব্যাপারেই প্রায় কল্পতরু ছিলেন।

নজরুল কাব্যের মূল্যবিচার   প্রমথনাথ বিশী

কবিদের খ্যাতির অদৃষ্ট বড় বিচিত্র। একবার কপালে এক রকম ছাপ প'ড়ে গেলে আর মুছতে চায় না। ইংরাজি গীতাঞ্জলির সুবাদে পাশ্চাত্য জগতে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মিস্টিক কবি। গেল সোনার তরী, চিত্রা চৈতালি, ক্ষণিকা, কল্পনা, কর্ণ কুন্তী সংবাদ, নরক বাস। মিস্টিক ছাপ আর ঘুচলো না।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ছান্দসিক'—যেন ছন্দের কারসাজিতেই তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। "একটি নূতন তন্ত্র" বঙ্গ-ভারতীর বীণায় পরাবার জন্যে কবি এসেছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথ এই ভুল ধারণার সমর্থন ও পুষ্টিসাধন ক'রে গিয়েছেন। ফুলের ফসল ও কুহু ও কেকায় এমন অনেকগুলি কবিতা আছে যা বঙ্গ-ভারতীর শিরোভূষণ। কিন্তু হলে কি হয়, তিনি যে 'ছান্দসিক'। এই ভুল ইঙ্গিতের প্রেরণাতেই সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সঞ্চয়ণ গ্রন্থে চার্বাক ও মঞ্জুভাষা নামে কবিতাটি বাদ পড়েছে। এটি সত্যেন্দ্রনাথের তথা বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। উক্ত গ্রন্থের সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যরসিক বিশিষ্ট বন্ধু।

কাজী নজরুল ইসলামের কপালে ছাপ পড়ে গিয়েছে বিদ্রোহী কবি বলে। প্রেম ও ভক্তির কবিতা ও গানগুলি যে তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তা একরকম চাপা পড়ে গেল। যৌবনের ও রাজনীতির উন্মাদনায় যে-সব কবিতার সৃষ্টি হয়েছিল সাময়িক প্রয়োজন মিটিয়ে দিয়েও তাদের মধ্যে অবশ্যই কিছু অবশিষ্ট আছে, কিন্তু এখন আর সেই ছাপ দিয়ে কবিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা শুধু নিরর্থক নয়, কবির খ্যাতির পক্ষে ক্ষতিকর।

এমন যে হয়ে থাকে তার কারণ অধিকাংশ মানুষ জহুরি নয়;

সোনার মূল্য বুঝবার ক্ষমতা তাদের নেই; সোনার উপরে রাজার মুখের ছাপ দেখতে পেলে তারা নিশ্চিন্ত হয়। সোনার ক্ষেত্রে যা সত্যোপম কাব্যের ক্ষেত্রে তা সত্য। প্রাকৃত জন কাব্যান্ধ, নিজেদের বিচার করবার শক্তি না থাকায় ফরমূলার সন্ধানে থাকে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে সেইজন্য ফরমূলার বড় আদর। রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক (কাব্যে মিস্টিসিজম সোনার পাথরবাটি), সত্যেন্দ্র দত্ত ছান্দসিক, নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী।

নজরুলের বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলির মূল্য অস্বীকার না ক'রেও বলা চলে যে সে মূল্য দিয়ে তার চূড়ান্ত বিচার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত বাঙালী রচিত সবচেয়ে সুপরিচিত গান। কিন্তু গানটিকে কি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টিপাথর রূপে ব্যবহার করা উচিত? বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলি নজরুলের সাহিত্যমূল্য বিচারের কষ্টিপাথর নয়। তবে কিনা সাহিত্যের বাজারে সকলে তো মূল্যবিচারের উদ্দেশ্যে যায় না: নানা কারণে যায়—যার সঙ্গে সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত পরোক্ষ।

নজরুলের যে সব গুণগ্রাহী ও অনুরাগী এখনো বিদ্রোহাত্মক কবিতাগুলিকেই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে ঘোষণা করেন, রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের আশায় অন্য কবিতাগুলিকে আড়ালে ফেলে রাখেন, তাঁরা আর যাই হোন, কবির যথার্থ বন্ধু নন। রাজনৈতিক উন্মাদনার দিনে যে-সব কবিতা লিখিত হয়েছিল তার প্রাপ্য সম্মান ও খ্যাতি কবি লাভ করেছেন। তবে তা লাভ করেছেন একটা বিশেষ কালের হাত থেকে। তারপরে অর্ধ শতাব্দী প্রায় গত হয়েছে, এখন দেখা উচিত কবি যাতে পরবর্তী কালের, যা নাকি চিরকালের অগ্রদূত, হাত থেকে কবি স্থায়ী সম্মান লাভ করতে পারেন। কবি এখন জীবন্মৃত। আমাদের মধ্যে বাস ক'রেও যেন নেই। তিনি সক্রিয় ও সতেজ থাকলে কি বলতেন জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে রূঢ় দেশাত্মবোধক উন্মাদনার ঊর্ধ্বে উন্নীত হতেন, সমকালের

সাধনাকে চিরকালের অভিমুখে প্রেরিত করতেন। এই বিশ্বাসের সমর্থনের হেতু তাঁর পরবর্তী রচনাসমূহের মধ্যে আছে। নজরুলের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সম্পদ তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতা নয়—ভক্তি ও প্রেমের কবিতা ও গান, যার অনেকগুলিই বাংলা ভাষার অমূল্য সম্পদ। তবে যে আমরা এখনো উন্মাদনার কবিতাগুলি নিয়ে মাতামাতি করছি তার কারণ অদ্যাবধি আমরা পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে আছি, কবি এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর ও আমাদের মধ্যে কম ক'রে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত প্রভৃতি বহু কবি সাময়িক প্রয়োজনে স্বদেশী গান রচনা করেছেন; সাময়িক প্রয়োজন মিটে গেলেও যদি তাদের মূল্য থাকে তবে তা সাহিত্যমূল্য। সেই ক্ষয়িত সাহিত্যমূল্য দিয়েই কি তাঁদের বিচার করতে হবে? নজরুলের অনেক স্বদেশী গান ও কবিতার কিছু সাহিত্যমূল্য অবশিষ্ট আছে। সেই ক্ষয়াবশিষ্ট মূল্য দিয়েই কি আমরা কবির প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তাঁর প্রতি দায়িত্ব শোধ করতে চাই? আশঙ্কা হচ্ছে সাহিত্য বিচারের মধ্যে রাজনীতির স্থূল হস্ত প্রবিষ্ট হওয়াতেই এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। যাঁরা এই কাজটিতে নেমেছেন, জানেন যে কবির বাধ্যতামূলক নীরবতা। কাজেই তাঁরা নিজেরাই উতোর চাপানের ভার নিয়েছেন। কবির পক্ষে অবস্থাগতিকে—'অন্য সবাই কইবে কথা তুমি রইবে নিরুত্তর'। অসহায় কবিকে নিয়ে সাহিত্য বিচারের নামে যারা সঙ্কীর্ণ রাজনীতির খেলায় মেতেছেন তাঁরা না কবির অনুরাগী না সাহিত্যের।

নজরুল যে কেন বিদ্রোহী কবি, অর্থাৎ শুধুই বিদ্রোহী কবি হিসা
চিহ্নিত হয়ে গেলেন, বোঝা শক্ত। এটা অবশ্য খুবই সত্যি কথা যে
তাঁর চারপাশের ঘটনাবলীকে বিনাবাক্যে মেনে নেবার মতন মানু
তিনি ছিলেন না। তাঁর কবিতা প্রশ্নে মুখর; প্রতিবাদে ক্লান্তিহীন
এমন মানুষকে সভাকবি হিসেবে পেলে সেটা যে-কোনও রাজার প
খুবই অস্বস্তির ব্যাপার হত। সভাকবি হতে হলে 'এস্টাব্লিশমেন্ট'
স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু নজরুল কখনও 'এস্টাব্লিশমেন্ট'-এ
কাছে মাথা নোয়াননি। অচলায়তনকে তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন
প্রচলিত রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সংস্কার ইত্যা
সবকিছুর বিরুদ্ধেই তিনি সর্বদা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বলা বাহুল
এই-সবই বিদ্রোহের লক্ষণ। কিন্তু তাই বলেই যদি তাঁর একমা
পরিচয় এই দাঁড়ায় যে, তিনি 'বিদ্রোহী কবি', তাহলে তাঁর কবিকৃতি
প্রতি খুব সুবিচার করা হয় না।

নজরুল ইসলামকে তো আমরা অনেক দিন ধরে এই খণ্ড-পরিচ
জানলুম। এখন খুব স্পষ্ট গলায় বলা দরকার যে, বিদ্রোহ তাঁ
কবিতার একটি বৃহৎ লক্ষণ বটে, কিন্তু একমাত্র লক্ষণ নয়। তাঁ
কবিতার আর-একটি প্রধান উপাদান ভালবাসা। তাঁর মতন এত
জোরালো রোল তুলে সম্ভবত আর কেউ কখনও বিদ্রোহের দামা
বাজাননি। ঠিক কথা। কিন্তু প্রেমের কথাই বা তাঁর মতন এম
মধুর গলায় আর ক-জন কবি বলতে পেরেছেন? অনেকের ধার
বিদ্রোহী কিংবা যোদ্ধার গলায় প্রেমের কথা ঠিক মানায় না। খুব
ভুল ধারণা। যোদ্ধারাই সম্ভবত শ্রেষ্ঠ প্রেমিক। পৃথিবীর যাবতী
মহাকাব্য তার প্রমাণ দেবে।

মাস কয়েক আগেকার কথা। রেডিয়োতে 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতি শুনছিলাম। দু রকমের গানই সেদিন গাওয়া হল। বীরত্বব্যঞ্জক এমন গান, যা শুনলে কাপুরুষের রক্তেও আগুন ধরে যায়। তার পাশাপাশি এমন মিঠে গজল, যা শুনলে বীরপুরুষের চক্ষুও একটি ললিত স্বপ্নের নেশায় আপনা থেকেই বুজে আসে। এই হল নজরুলের ষোল-আনা পরিচয়। আট-আনা বিদ্রোহ, আট-আনা ভালবাসা।

গিরিবালা দেবী

মৈত্রেয়ী দেবী

শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের রচিত 'নজরুল জীবনী'-খানা কল্যাণীয় কাজী সব্যসাচী আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন—বইখানি আদ্যপ্রান্ত প্রায় এক নাগাড়ে পড়ে ফেললাম—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা নিয়ে নিরুত্তাপ যুবিপ্রবণ এই রচনা কিন্তু আমার মনে গভীর-বিস্ময় ও আবেগ সঞ্চারিত করলো। এই বিস্ময় কবি নজরুলের সৃষ্টি-শক্তির অপূর্বতায় নয়, যা আমাদের পূর্বেই জানা, এই বিস্ময় নজরুলের জীবনে এক অভূতপূর্ব আবির্ভাব তাঁর শ্বশ্রুমাতা গিরিবালা দেবীর কাহিনীতে। এই মহিমময়ী নারী ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় স্থান লাভের যোগ্য—কিন্তু ক'জন বা তাঁর কথা জানে। গিরিবালা দেবী বৈদ্য জাতি সম্ভূতা। আমাদের বাল্য-কালে বৈদ্যরা খুব সংঘবদ্ধ ছোট সম্প্রদায় বলা চলতো, কিছু-না-কিছু আত্মীয়তা পরস্পরকে যুক্ত রাখতো; আমার কোনো আত্মীয়া এঁদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে প্রমীলা দেবীর বিবাহের রোমান্সের গল্প শুনেছিলাম—শুনেছিলাম সমাজে সেজন্য তাঁর মাতাও নির্যাতিতা হয়েছিলেন। কিন্তু রোমান্সের রঙীন চিত্রটিই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রাধান্য পাওয়ায় অন্যদিকটি তেমন করে ভেবে দেখিনি। সে বয়সও তখন নয়।

উল্লিখিত জীবনী-গ্রন্থে একটি সুগ্রথিত ছবি পাওয়া গেল। আজ থেকে ৪০।৪৫ বৎসর পূর্বে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিধবার পক্ষে এ যে কতদূর বৈপ্লবিক কর্ম তা বোধ হয় আজকের যুগে বসে অনুমান করা যায় না। যদি প্রমীলা দেবী সমাজ ও আত্মীয়-স্বজনের মতামত অগ্রাহ্য করে কবিকে বিবাহ করে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করে চলে যেতেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকত না, যৌবনে, আবেগে প্রেমের প্রবলতা বহু

মানুষকেই যুগে যুগে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করবার শক্তি দিয়ে থাকে। প্রেমের আহ্বানের অনিবার্যতার মুখে ভেসে যায় মানুষের মনগড়া বাধা, যৌবনের আহ্বান সমাজের মুখে তুড়ি মেরে বলতে পারে 'বিধির বাঁধন কাটবে তুমি, তুমি কি এমন শক্তিমান ?'

কিন্তু গিরিবালা দেবীর মাতৃস্নেহ—সে কি করে এমন সর্ববাধা-বিজয়ী অজেয় শক্তি লাভ করলো, চিরন্তন মানব ধর্মে কোন্ গভীর বিশ্বাস এই শত বাধা কণ্টকিত সঙ্কীর্ণ হিন্দু সমাজের পল্লী পরিবেশের মধ্যে তাঁর চিত্তের গহনে চির জাগ্রত ছিল, যা নজরুলের কবি মানসকে সর্ব জাতি সম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে তুলে দেখতে পেরেছিলো ?

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি গোরার আনন্দময়ী কল্পিত চরিত্র, একমাত্র সেই কল্পনার সঙ্গেই যেন তাঁর তুলনা মেলে, জানি না রবীন্দ্রনাথ এই মহিমময়ী নারীর কোনো সংবাদ জানতেন কি না, জানলে অবশ্যই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে যেতেন।

গিরিবালা দেবীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি নিজ সমাজ পরিত্যাগ করে আসেন নাই, তাঁর আচার-অনুষ্ঠান ও ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় নাই। একমাত্র কন্যা ও জামাতাকে নিয়ে ভাসুরের সংসার ত্যাগ করে এলেন কলকাতায়, কোনো সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে এই উদ্দাম বিদ্রোহী কবির-সংসারে পাবেন না, এ সংসার যে তাঁকেই অক্লান্ত পরিশ্রমে ধারণ করে রাখতে হবে, এ তাঁর অজানা ছিল না নিশ্চয়ই। কিসের জোরে তিনি দুই সমাজের তীব্র প্রতিকূলতার মুখে অটল থেকে তাঁর কন্যা-জামাতার সংসার সাজিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন তা জানি না। যখন কন্যা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে পড়লেন, জামাতা জ্ঞান হারালেন, তখন এই দুই রুগীর সমস্ত পরিচর্যা ও সন্তানগুলির দায়িত্ব তিনিই বহন করে চলেছিলেন। হিন্দু সমাজ ভ্রূকুটি করেছে কিন্তু মুসলমান জামাতার সমস্ত সেবা নিজ হাতে করে তিনি নিজের পূজার্চনা ও স্বপাক আহার ইত্যাদি চালিয়ে গেছেন। আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে যে মানবধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, মানবতা

যে এ সমস্তের ঊর্ধ্বে, তা কোনও যুক্তিতর্ক ও দর্শনশাস্ত্র দিয়ে না বুঝলেও যে অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা যায় তা এমন সব জীবন না থাকলে বিশ্বাস হত না। এই জীবনখানি তাই একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

গোঁড়া মুসলমান সমাজ যখন রাজনৈতিক দলাদলিকে আশ্রয় করে উগ্র হয়ে উঠেছিল তারা নজরুলের গৃহে হিন্দু আচার নিরত এই হিন্দু মাতার প্রভাব সহ্য করতে পারে নাই, তাঁর নামে নানাভাবে নিন্দা রটিয়েছে। তারপর এল ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা, সেই ভয়াবহ দাঙ্গা তিনি চোখে দেখলেন, শুনেছি, তাঁদের পাড়ার হত্যাকাণ্ডে তিনি বাধা দিতে চেষ্টা করেও পারেন নি।

এই দাঙ্গার অব্যবহিত পরেই কাউকে কিছু না বলে একদিন এই মহিয়সী নারী গৃহত্যাগ করে এক বস্ত্রে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর সন্ধান পায় নাই। তিনি কি অকৃতকার্যতার বেদনা নিয়ে গেলেন, সারা জীবন দিয়ে যে সত্য তিনি অনুভব করেছিলেন সেই মানব ঐক্যের রূপ কি তাঁর চোখের সামনে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল? না অতি প্রিয় জামাতার এই নিদারুণ ব্যাধির দৃশ্য সহ্য করতে পারলেন না—তা জানা যায় না। নজরুল জীবনীকারও সে সম্বন্ধে স্পষ্ট মত দেন নাই। তা ছাড়া এই সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ চরিত্রের বিশ্লেষণ ও তাঁর ভাবনা ও অনুভূতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা সহজ নয়। তাঁর সমস্ত জীবনের মধ্যে যে এক দুর্জ্ঞেয় গভীরতা রয়েছে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই।

কবি নজরুলের ভাবনায় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির দুই ধারা যে গভীর ভাবসঙ্গমে মিশে ছিলো তা হয়তো গিরিবালা দেবী ও তাঁর বড়জা বিরজাসুন্দরী দেবী, যাঁকে নজরুল 'মা' বলতেন, তাঁদের স্নেহ না পেলে এত সত্য হতো না। তা হয়তো মূল-হারা আশ্রয়হীন হয়ে যেতো।

হিন্দু-মুসলমান উভয়ে এক দেশের মানুষ হয়েও তীব্র বিরুদ্ধতা

ধর্ম নিয়ে রয়ে গেছে এবং বার বার নানা কারণে তা তীব্রতর হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও এই বিরুদ্ধতার সমন্বয় সাধনে উভয় সম্প্রদায়ের মাহাত্মা যাঁরা জন্মেছেন তাঁরা চেষ্টা করেছেন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সমস্যা যতই কঠিন ততই পরমাশ্চর্য তাদের প্রকাশ। বিধাতা এমনি করেই দুরূহ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের ভিতরকার শ্রেষ্ঠকে উদ্‌ঘাটিত করে আনেন।...যে সব উদার চিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ-ধারা মিলিত হতে পেরেছে সেই সব চিত্তে, সেই ধর্মসঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানসতীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেই সব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, তা অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত, রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতির চরিত্রে এই সব তীর্থ চির প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল।'

এই ক'টি নামের সঙ্গে আরও বহু নামও যোগ করা যায়, ইতিহাসে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে রইলেন তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের নামও হবে গাঁথা।

কিন্তু গিরিবালা দেবীর সমগ্র জীবনখানির মধ্যে যে মানব ঐক্যের জয়বার্তা বেজেছিল তা কারু মনে থাকবে না।

এ সেই চির-অনাদৃত উপেক্ষিত বাঙালী মেয়ের জীবন যা মরুভূমির মধ্যে রস সঞ্চার করে মরুকে করে উর্বর কিন্তু তার সকল বিশেষ পরিচয় যায় লুপ্ত হয়ে। ইতিহাস যাহাদের ভোলে অনায়াসে —সভাঘরে যাহাদের স্থান নাই।

যে অশান্ত আর অদম্য প্রাণশক্তি কাজী সাহেবকে কাব্যসৃষ্টিতে প্রণোদিত করেছিলো সেই একই অস্থিরতা আর প্রাণপ্রাচুর্য তাকে সুরের ক্ষেত্রেও টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। তাঁর ভিতর সুরবোধ ছিলো সহজাত। সহজাত সুরবোধ যাঁর আছে, এমন কবির পক্ষে কাব্য-জীবনের কোনো-না-কোনো পর্যায়ে সঙ্গীত অনুশীলনে আত্মনিয়োগ অবধারিত। কাজী সাহেবের বেলায়ও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। তিনি কাব্য এবং সঙ্গীত উভয়ত্র স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে বিচরণ করেছেন।...

কাজী সাহেবের কবি-প্রকৃতির দুই দিক—প্রথমতঃ, তিনি নির্যাতিত শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের প্রতি অপরিমেয় দরদ প্রকাশ করে বাংলা কবিতার প্রচলিত সংস্কারকে আঘাত করেছেন; দ্বিতীয়তঃ, তিনি...কৃত্রিম বিধিনিষেধ আর অনুশাসনের নিগড় ভাঙতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় প্রবৃত্তির একটা প্রচণ্ড উদ্দামতা লক্ষ্য করা যায়।...

কাব্যজীবনের একটি বিশেষ পর্বে এসে কবি আর বাণীরূপেই শুধু তৃপ্ত থাকতে পারেন নি, তিনি সুররূপের ধ্যানেও নিবিষ্ট হলেন। কবি অসি ছেড়ে বাঁশী ধরলেন। সুর-রূপী নর্মবাঁশীর লীলা তাঁর মন কেড়ে নিলো। সে বাঁশীর সুর যে পরবর্তী অধ্যায়ে কতো বিচিত্র ভঙ্গিমায় আর ঢঙে প্রকাশিত হয়েছে তা কবি রচিত অজস্র গানের শ্রেণী-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। এতো বেশি সংখ্যক গান [কাজী নজরুল ইসলাম সবশুদ্ধ আনুমানিক তিন হাজার গান রচনা করেছেন। পৃথিবীর সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে এইটেই বোধহয় সর্বোচ্চ রেকর্ড। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার।] আর এত বিবিত্র ঢঙের গান বাংলা দেশের অন্য কোনো সুরকার

আজ পর্যন্ত রচনা করেন নি। এ থেকে এই কথা এক প্রকার বিনা দ্বিধায়ই বলা চলে যে, সঙ্গীত আর কবিতার মধ্যে সঙ্গীতই নজরুলের ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিক সহায়ক ছিলো, তাঁর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত-তর মাধ্যম ছিলো। সঙ্গীতে তিনি দেশপ্রেম, যৌথচেতনা, প্রেম, ভক্তি, নিসর্গ প্রীতি, নারীর মর্যাদায় বিশ্বাস, গণমুক্তির প্রতি আস্থা প্রভৃতি বিচিত্র মনোভাবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর কাব্যেও এ সকল ভাবেরই প্রাধান্য, তবে সঙ্গীতে সে প্রকাশ অধিকতর নিপুণতার সঙ্গে সংসাধিত হয়েছে সে-কথা বলা দরকার। কেন না এ ক্ষেত্রে বাণীর মাধুর্যের উপর অতিরিক্ত একটি গুণ আরোপিত হয়েছে—সুর-সৌন্দর্য। বাণী আর সুরে মিলে কাজী নজরুলের অদম্য প্রাণের আবেগ চমৎকার এক সুসমঞ্জস শিল্পরূপ লাভ করেছে :

নজরুল সঙ্গীতজীবনের সূত্রপাত করেন বাংলা গজল রচনার দ্বারা। বাংলা ভাষায় এ জিনিস একেবারেই অভিনব ;···

উর্দুতে এই ধরনের গান অনেক আছে। উর্দু কবি গালিবের একাধিক গজল রচনা বিদ্যমান। নজরুল গজল গান বাংলায় বিধিবদ্ধভাবে প্রবর্তন করেন। এক সময় বাংলার আকাশে-বাতাসে নজরুলের গজল গান ভেসে বেড়িয়েছে।···আজ অবশ্য সে-সব গান কারও মুখে শোনা যায় না, তবে এক সময়ে মুটে-মজুর, গাড়োয়ান, রিক্সাওয়ালা প্রভৃতি খেটে-খাওয়া মেহনতী মানুষের মুখেও এই সকল গানের কলি সদাসর্বদা সঞ্চরণ করে ফিরেছে। এ থেকেই গানগুলির ব্যাপক জনপ্রিয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল,'
'আমারে চোখ-ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী,'
'চেয়ো না সুনয়না, আর চেয়ো না ওই নয়ন পানে,'
'এত জল ও কাজল চোখে পাষাণী আনলে বল কে,'
'কেন আন ফুলডোর আজি এ বিদায় বেলায়,'
'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখিজল,'

প্রভৃতি তাঁর বহু খ্যাত গানগুলির কয়েকটির প্রথম পদ। এ সকল গান এক সময়ে দিলীপকুমার রায়, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, শচীন দেববর্মন প্রমুখ প্রসিদ্ধ গায়কগণ জনসমাজে প্রচার করেছেন।

বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুক্তি-সংগ্রামের অধ্যায়ে নজরুল রচিত 'কোরাস' গান যৌথ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান যোজনা। অত্যাচারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ গণমানবের প্রতিরোধ-স্পৃহা আর সংগ্রাম-চেতনা এই সকল কোরাস গানের দ্বারা যে কতখানি অনুপ্রাণিত হয়েছিলো তা বলে বোঝানো যায় না। নজরুলের আগেও অবশ্য বাংলায় কোরাস গান রচিত হয়েছে—দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ প্রখ্যাত কবি-গীতিকারগণ কোরাস গান রচনা করেছেন, তবে এ ক্ষেত্রে নজরুলের দানও বড়ো কম নয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কোরাস 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানের সত্যিই তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার। এটি বাংলা দেশের একটি অত্যুৎকৃষ্ট কোরাস সঙ্গীত। এ গানটি কবি, সুভাষচন্দ্রের দ্বারা উপরুদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ উপলক্ষ্যের জন্য রচনা করেছিলেন, তাঁর সে রচনা সর্বাঙ্গ সার্থক হয়েছিলো তা ছাড়া কোরাস গানের একটি বিশেষ ধারা—'মার্চ সঙ্গীত'—এ গানে নজরুলের জুড়ি নেই। নজরুলের মার্চ সঙ্গীত, যথা, উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল' ইত্যাদি, কিংবা 'টলমল টলমল পদভরে বীরদল চলে সমরে' ইত্যাদি গান কে না শুনেছেন?

কাজী সাহেব নানা শ্রেণীর আর নানান্ ধরনের গান রচনা করেছিলেন। এই সব গানের মধ্যে আছে—ইসলামী সঙ্গীত, নবীর গান, ছাদ-পেটানো গান, ঝুমুর, ভাটিয়ালি, লাউনি, গীত, আরবী সঙ্গীত, দক্ষিণ সমুদ্র দ্বীপের গান, চীনা সঙ্গীত; কতো নাম করবো। এ ছাড়া শেষ বয়সে তিনি আধ্যাত্মভাবের প্রেরণায় শ্যামাসঙ্গীত আর কীর্তনও অনেক রচনা করেছেন।

চিৎপুরের বিষ্ণুভবনে ছিলো আমাদের গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল ঘর। কাজীদা ছিলেন আমাদের বাংলা গানের ট্রেনার। কাজীদার ঘরে থাকতো সদাসর্বদাই নানা লোকের ভীড়। কাজের লোকই শুধু নয়, নানান্ অকাজের লোকও এসে ভীড় জমাতো। তা এজন্য তাঁকে বিরক্ত হতে কোনদিন দেখিনি।

একদিন তাঁর ঘরে লোকজনের ভীড় ছিলো কম। কাজীদা তাঁর প্রিয় পান আর জর্দার কৌটো সামনে নিয়ে বসেছিলেন। মুখে এক-মুখ পান। সামনে খোলা গানের খাতা।

আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর তাঁর নিজস্ব কায়দায় হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন এমন হাসি, যা আমার মনে হয়েছে কাজীদা ছাড়া আর কেউ হাসতে পারেন না কোনদিন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আয় ইন্দু, বোস্।' তারপর আমি তাঁর পাশটিতে বসতেই বললেন,'আচ্ছা,তোর ঐ অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে'-এর উল্টো পিঠের গানটা কি লিখি বল্‌তো?'

আমি চট্ করে কোনো জবাব দিলাম না। কাজীদা মহান কবি, শ্রেষ্ঠ গীতিকার। তাঁর এ-কথার জবাব দিতে যাওয়া আমার মতো মানুষের পক্ষে মূর্খামী ছাড়া আর কি?

তাই একটুখানি চুপ করে থেকে শুধু বললাম, 'কাজীদা, এই গানটার সঙ্গে ঐ নতুন গানটাও যেন খুব ভালো হয়।'

কাজীদা আবার হা হা করে সারা ঘর হাসিতে ভরিয়ে তুলে বললেন, 'আচ্ছা দাঁড়া, চুপটি করে বোস্।' বলে এক মুখ পান ঠেসে খস্ খস্ করে কাগজে লিখে দিলেন সেই আমার গাওয়া বিখ্যাত গানটি—'দোলা লাগিল দখিনার বনে বনে'।

কাজীদা এতো বড়ো ছিলেন, এতো মহান্ ছিলেন তবু তিনি আমাদের সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে বন্ধুর মতো আলোচনা করতেন। এমন কি, যে গানের জন্য তাঁর এতো খ্যাতি, এতো দেশজোড়া নাম, সেই গানের বাণী তৈরীর সময়েও তিনি জিজ্ঞেস করতেন আমাদের মতামত।

কাজীদার একটি জিনিস দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। শুধু আমি কেন, আমার মতো অনেকেই হতো। রিহার্সাল ঘরে খুব হৈ-হুল্লোড় চলছে, নানা জনে করছে নানা রকম আলোচনা। কাজীদাও সকলের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করছেন, হঠাৎ চুপ করে গেলেন। একধারে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন খানিক। অনেকে তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্যই করলো না হয়তো। কাজীদার সেদিকে খেয়াল নেই। এতো গোলমালের মধ্যেও তিনি একটুক্ষণ ভেবে নিয়েই কাগজ-কলম টেনে নিলেন। তারপর খস্ খস্ করে লিখে চললেন আপনমনে।

মাত্র আধঘন্টা; কি তারও কম সময়ের মধ্যে পাঁচ-ছ'খানি গান লিখে পাঁচ-ছ'জনের হাতে হাতে বিলি করে দিলেন। যেন মাথার মধ্যে তাঁর গানগুলি সাজানোই ছিলো, কাগজ-কলম নিয়ে সেগুলো লিখে ফেলতেই যা দেরী।

কাজীদা এইরকম ভীড়ের মধ্যে, আর অল্প সময়ের মধ্যে, এমন সুন্দর গান লিখতে পারতেন।

আর শুধু কি এই?

সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে সেই পাঁচ-ছ'জনকে সেই নতুন গান শিখিয়ে দিয়ে তবে রেহাই দিতেন তিনি। গান লেখার সাথে সাথে সুরও তৈরী করে ফেলতেন কাজীদা। অপূর্ব সব সুর। —যার তুলনা হয় না।

কাজীদা ছিলেন সুরের রাজা।

কাজীদা'-র কথা

আব্বাসউদ্দীন আহ্‌ম্মদ

বাংলা গানে গজল সুরের প্রথম আমদানী করেন নজরুল ইসলাম, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে। প্রথম গান—'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'। তারপর দেশে আসে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ। কবি লিখে চলেন—'ঘোর ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর,' 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে'।

এই গানগুলি লেখার পর বাইরে যখন তাঁর যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো তখন হলো কবির সাথে আমার প্রথম পরিচয়। কুচবিহার কলেজের ছাত্র আমি, স্কুলে-কলেজে মিলে প্রতি বৎসর মিলাদ করতাম। সেই মিলাদ মহ্‌ফিলে কবিকে আমন্ত্রণ করি। সেই থেকে পরিচয়ের সূত্রপাত। তিনি আমার গান শুনে আমাকে উৎসাহ দিলেন, বললেন, 'সুন্দর মিষ্টি কণ্ঠ, কলকাতায় চলো, তোমার গান রেকর্ড করা হবে।'

১৯৩০ সনে প্রথম গান রেকর্ড করে কুচবিহারে চলে আসি। ১৯৩১ সনে আবার কলকাতা যাই এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল-ঘর তখন চিৎপুর রোডে। শুনলাম কাজী সাহেব সেখানে রোজই যান। এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাজী সাহেব কোথায়?' তিনি বললেন, 'পাশের ঘরে গান লিখেছেন।' আমি ঢুকলাম। তিনি মহা উৎসাহে বলে উঠলেন, 'আরে আব্বাস, তুমি কবে এলে? বস বস।' সর্বনাশ, এই কি কাজী সাহেব! চেহারায় কি পরিবর্তন। এক বৎসর আগে কুচবিহারে যে কাজী সাহেবকে দেখেছি তিনি যে এমনভাবে বদলে যেতে পারেন স্বপ্নেও ভাবিনি। তখন ছিলো ইয়া বড় গোঁফ, দোহারা চেহারা, মাথায় ঢেউ-খেলানো বাব্‌রি। তাঁর মাথার চুল ঠিকই

আছে—গোঁফজোড়া অদৃশ্য হয়েছে আর বপুখানি হয়েছে নাদুস নুদুস। চোখে আগে জ্বলতো বিদ্রোহের আগুন, এখন সেখানে এসেছে শ্রাবণের ঢল। সামনে এগিয়ে গিয়ে কদমবুছি করলাম। তিনি বললেন, 'সবাই আমাকে কাজী সাহেব বলে, তুমি কিন্তু কাজীদা বলে ডাকবে আমাকে। হ্যাঁ, তোমার জন্যে গান লিখতে হয়। আচ্ছা ঠিক হবে।'

'আচ্ছা ঠিক হবে' তো বললেন, কিন্তু যতবারই যাই গ্রামোফোন ক্লাবে ততবারই দেখি তাঁকে ঘিরে রয়েছেন অনেকে। আমি সঙ্কোচে কিছুই বলতে পারি না। পাশের ঘরে পিয়ারু কাওয়াল রিহার্সাল দিচ্ছেন উর্দু কাওয়ালী গানের বাজারে সে-সব গানের কী বিক্রী! আমি কাজীদাকে বললাম, 'এমনিভাবে বাংলা কাওয়লী গান লিখে দিতে পারেন আমার জন্যে?' গ্রামোফোন কোম্পানীর বাঙালী সাহেব বললেন, 'না না, ও ধরনের বাংলা গান বিক্রী হবে না।' অবশেষে প্রায় এক বৎসর পরে সাহেব রাজী হলেন। কাজীদাকে বললাম, 'সাহেব রাজী হয়েছেন।' কাজীদা তখুনি আমাকে নিয়ে একটা কামরায় ঢুকে বললেন, 'কিছু পান নিয়ে এসো।' পান নিয়ে এলাম ঠোঙা ভর্তি করে। তিনি বললেন, 'দরজা বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাক। ঠিক ১৫-২০ মিনিটের মধ্যে লিখে ফেললেন 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।' সুর-সংযোগ করে তখুনি শিখিয়ে দিলেন গানটা। বললেন, 'কাল এসো রেকর্ডের অপর পৃষ্ঠার জন্যে আর একখানা লিখে দেবো।' পরদিন লিখলেন 'ইসলামের ঐ সওদা নিয়ে এলো নবীন সওদাগর।' রেকর্ড করলাম চারদিন পরে। সে গান বাংলার আকাশে-বাতাসে তুললো এক নব আলোড়ন। তারপর লিখে চললেন এইভাবে বহু ইসলামী গান।

দু'তিন বৎসর পরে। একদিন রিহার্সাল রুমে বসে একাকী আমাদের দেশের একখানা পল্লী গান ভাওয়াইয়া গাইছিলাম। কাজীদা কখন এসে যে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপ করে শুনছিলেন, টের পাইনি। গান শেষ করা মাত্র তিনি ঢুকে বললেন, 'আহা, কী সুন্দর

কী মিষ্টি সুর! আব্বাস, গাও—আর একবার গাও তো।' আমি গাইলাম :

'নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোঙ ছ্যাকা পাড়া।'

কাজীদা বললেন, 'গাও, আবার গাও।' পাঁচ-ছ'বার গাইলাম। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, চুপ করে বসো।' তিনি কাগজ কলম নিয়ে গান লিখতে বসলেন। ১০ মিনিট পরে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখো তো, তোমার সুরের সাথে আমার এ গান ঠিক মিলে যায়নি?' আমি তাঁর লেখা গান গাইলাম :

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।'

এর পর তিনি ভাওয়াইয়া গান শুনলে অস্থির হয়ে পড়তেন। গান গাইতে গাইতে গলা ভাঙার মাধুর্যে তিনি আত্মহারা হয়ে 'আহা-আহা' করে উঠতেন। আর একটা গান লেখার কথা মনে পড়ছে। আমি একদিন কাজীদাকে গেয়ে শোনালাম :

'তেরষা নদীর পারে পারে ও
দিদি লো মান্‌সাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও।'

কাজীদা সেই সুরে লিখলেন :

'পদ্মদীঘির ধারে ধারে ও'

ভাওয়াইয়া সুরে লিখলেন :

'কুচ বরণ কন্যা রে তার মেঘ বরণ কেশ,
আমায় নিয়ে যাও রে নদী সেই সে কন্যার দেশ।'

পল্লী-সঙ্গীত লেখার অনুপ্রেরণা তিনি এইভাবে পেলেন। তখন আমার জন্য আট-দশখানা পল্লী-সঙ্গীত লিখেছিলেন; তার মধ্যে বেঁচে রইলো 'বন্ধু আজো মনে পড়ে আম-কুড়োনো খেলা', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কই', 'ওরে কে বলে আরবে নদী নাই', 'আরে ও দরিয়ার মাঝি, মোরে নিয়ে যা রে মদিনা' এবং 'উঠুক তুফান পাপ দরিয়ায়, আমি কি তায় ভয় করি।'

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে কাজীদা এবং আরো অনেকে মিলে জোর আড্ডা বসে গেছে। আমি গেলাম। কিছুক্ষণ পরে খুব ঘটা করে মেঘ এলো, এলো বাদল। কাজীদা অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। কখন যেন কাগজ-কলম ধরেছেন, আধ ঘণ্টা পরে হারমোনিয়ামটি টেনে নিয়ে গুন্‌গুন্ করে সুর ভাঁজতে শুরু করলেন। আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন, বললেন, 'নাও, সুরটা তুলে নাও—বর্ষা আসছে, বর্ষার আবাহন-গীতি লিখলাম।' গান হলো:

'স্নিগ্ধ শ্যাম বেণী বর্ণা
এস মালবিকা!
অর্জুনমঞ্জরী কর্ণে
গলে নীপ মালিকা।
মালবিকা!!'

কাজীদার বাড়ীতে একদিন বসে আছি। কারমাইকেল হোস্টেল থেকে চার-পাঁচজন ছাত্র এসে কাজীদাকে বললেন, 'কাজী সাহেব, আমাদের হোস্টেলে আসছেন তুরস্ক থেকে হালিদা এদিব হানুম, তাঁকে আমরা অভ্যর্থনা জানাবো, আপনাকে সভাপতি হতে হবে।' কাজীদা বললেন, 'আচ্ছা যাবো, আপনারা যান।' ছেলেরা চলে গেলে কাজীদা আমাকে বললেন, 'জানো আব্বাস, এই হালিদা এদিব হচ্ছেন তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতী। এঁর অভ্যর্থনা-সভায় নিশ্চয়ই যাবে কিন্তু। ওরা তোমাকে বললো না, হয়তো চেনে না, কিন্তু আমি বলছি—নিশ্চয়ই যাবে।' আমি বললাম, 'কাজীদা, যাবো নিশ্চয়ই।

কিন্তু আপনি যাবেন আপনার কবিতার সওগাত নিয়ে, আমি কী নিয়ে যাবো ?' তিনি বললেন, 'ওঃ—আচ্ছা।' তারপর কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কী অপূর্ব গানই না লিখে দিলেন! বললেন, 'এ গানে তুমি নিজে সুর দেবে।' গান তো নিয়ে এলাম। কাজীদার গানে আমি সুর দেবো, এতোবড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। অথচ তাঁর আদেশ। বাসায় হারমোনিয়াম নিয়ে বসলাম। সৌভাগ্যক্রমে আমার বাসায় এলো ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁর ছেলে মরহুম আবদুল করিম খাঁ ওরফে বালী। বললাম, 'ভাই, উদ্ধার করো—এ যে বিরাট পরীক্ষা; কাজীদার গান, আমাকে সুর দিতে বলেছেন।' বালী প্রথম স্তবকে সুর সংযোগ করলো, তারপর বললো, 'এইভাবে করতে থাকো।' পরদিন সমস্ত গানটা যখন গেয়ে শোনালাম, কাজীদা মহা খুশী। গানটা হচ্ছে: 'গুণে গরিমায় আমাদের নারী।'

মুসলমানদের এক একটা পর্ব আসতো আর আমি কাজীদাকে অনুরোধ করতাম, 'কাজীদা, মোহর্‌রম মাস আসছে, মর্সিয়া লিখে দিন।' তিনি লিখেছেন, 'মোহর্‌রমের চাঁদ এলো ঐ কাঁদাতে ফের দুনিয়ায়', 'ওগো মা ফাতেমা ছুটে আয়, তোর দুলালের বুকে হানে ছুরি', 'ফোরাতের পানিতে নেমে ফাতেমা দুলাল কাঁদে অঝোর নয়নে রে।' আসে ফাতেহা-দোহাজদাহাম; কবি লেখেন:

> 'নিখিল ঘুমে অচেতন সহসা শুনিনু আজান,
> শুনি সে তক্‌বীরের ধ্বনি আকুল হল মনপ্রাণ।
> বাহিরে হেরিনু অসি বেহেশ্‌তী রৌশনীতে রে
> ছেয়েছে জমীন ও আসমান;
> আনন্দে গাহিয়া ফেরে ফেরেশ্‌তা হুর গেলেমান—
> এলো কে—কে এলো ভূলোকে
> দুনিয়া দুলিয়া উঠিল পুলকে।'

জাকাত সম্বন্ধে কবিকে লিখতে বলেছি; তিনি তৎক্ষণাৎ লিখে দিয়েছেন:

'দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত—
তোর দিল্ খুলবে পরে, ওরে আগে খুলুক হাত।'

হজ সম্বন্ধে লিখেছেন :

চল্ রে কাবার জিয়ারতে, চল্ নবিজীর দেশ ;
দুনিয়াদারীর লেবাস খুলে পর রে হাজীর বেশ।

একদিন কাজীদা বলেন, 'আব্বাস, সুন্দর একটা গান লিখেছি, গানটা শেখো, খুব তাড়াতাড়ি রেকর্ড করতে হবে। গানের কথা হচ্ছে :

'ত্রাণ কর মওলা মদিনার—
উম্মত তোমার গুনাহ্‌গার কাঁদে
তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার
পড়েছে আবার গোনাহের ফাঁদে।
নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ ফাঁসে
মাতিয়াছে সবে বিভবে বিলাসে ;
বসিয়াছে জালিম শাহী তখ্‌তে তব,
মজ্‌লুমের এ ফরিয়াদ আর কারে কব—
তলোয়ার নাহি নাহি আর
পায়ে গোলামীর জিঞ্জির বাধে।'

গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সাল রুমে তাঁর গানের বড়ো বড়ো খাতাগুলো পড়ে থাকতো। সেই খাতা থেকে কোনো কোনো নতুন কবি গান লিখে নিয়ে কাজীদার লাইন শুদ্ধ প্রায় হুবহু নকল করে নিজের লেখা বলে গ্রামোফোনে চালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। কাজীদাকে বললাম সে-কথা। তিনি হেসে বললেন, 'দূর পাগল, মহাসমুদ্র থেকে ক'ঘটি পানি নিলে কি সাগর শুকিয়ে যাবে? আর নবাগতের দল এক-আধটু না নিলে হালে পানিই বা পাবে কী করে?'

বিশ বৎসর প্রায় কাজীদার সাহচর্যে ছিলাম ; এর মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে পরনিন্দা শুনিনি।

একটি করুণ কাহিনী

আঙুরবালা দেবী

গ্রামোফোনের রিহার্সাল রুমে মাঝে মাঝে কাজীদা হাত দেখার বই যোগাড় ক'রে তাই নিয়ে মেতে থাকতেন। আমরা এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করতাম প্রায়ই।

কাজীদা কিন্তু রাগ করতেন না।

তাঁর এই হাত দেখা নিয়ে একটা খুব করুণ গল্প আছে।

আমাদের সময়ে গ্রামোফোনে একজন তবলা বাজিয়ে ছিলেন। নাম রাসবিহারী শীল। খুব গুণী লোক। রাসবিহারীবাবুর তবলা সঙ্গত না থাকলে আমাদের গান যেন জমতেই চাইতো না।

একদিন শোনা গেলো, জ্ঞানেন্দ্র গোস্বামী মশাই নৌকাযোগে কোথায় যেন গান গাইতে যাবেন, আর তাঁর সঙ্গে তবলা বাজাবার জন্য যাবেন সেই রাসবিহারীবাবু।

সেদিন যথারীতি রিহার্সাল রুমে কাজীদার সঙ্গে আমরা গান বাজনা নিয়ে মেতে রয়েছি। রাসবিহারীবাবু আমাদের সঙ্গে তবলা সঙ্গত করছেন। গান-বাজনার ক্ষণিক বিরতিতে তিনি কাজীদার সামনে ডান হাতটি মেলে ধরলেন:

'কাজীদা, আমার হাতটা একটু দেখুন না।'

এটা তাঁর জ্ঞানবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার আগের দিনের ঘটনা।

কাজীদার মুখে সব সময়েই হাসি লেগে থাকতো। সেই হাসি-মুখেই তিনি রাসবিহারীবাবুর হাত দেখায় মন দিলেন। দেখতে দেখতে তাঁর মুখ ক্রমশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। এক সময় রাসবিহারী-বাবুর হাত ছেড়ে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি।

সবাই চুপচাপ। হঠাৎ কাজীদার এই ভাবান্তর দেখে আমরাও অবাক না হয়ে পারলাম না।

রাসবিহারীবাবু হাসিমুখে বললেন, 'কই কাজীদা, হাতে কি দেখলেন বললেন না তো!'

কাজীদা তবুও নিরুত্তর।

রাসবিহারীবাবু আবার বললেন, 'বলুন না কাজীদা, কি দেখলেন। খারাপ কিছু?'

এবার কাজীদার মুখে মৃদু মৃদু করুণ হাসি ফুটে উঠলো। রাসবিহারীবাবুকে তাঁর গুণের জন্য কাজীদা খুবই স্নেহ করতেন। তাই ধীরে ধীরে তাঁর পিঠ চাপড়ে বললেন, 'দূর পাগল, খারাপ কেন হবে! ভালোই তো, সব ভালো।'

এই কথার পর কাজীদা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

তখনকার নাম-করা গায়ক ধীরেন দাস সেদিন ঐ ঘরে উপস্থিত ছিলেন। রাসবিহারীবাবু চলে যাবার পর ধীরেনবাবু কাজীদাকে চেপে ধরলেন, 'বলুন না কাজীদা, ওর হাতে কি দেখেছেন?'

কাজীদা বললেন, 'একটু খারাপ জিনিসই দেখলাম।'

ক'দিন পর জ্ঞানবাবু গান গেয়ে আবার ফিরে এলেন, কিন্তু রাসবিহারীর দেখা নেই।

আমরা তাঁর খোঁজ করতেই শোনা গেলো, রাসবিহারীর জ্বর হয়েছে। এর ক'দিন পরে খবর এলো তাঁর সামান্য জ্বর নিমোনিয়ায় দাঁড়িয়েছে।

অনেক চিকিৎসা করা হলো। কিন্তু তাঁর সে নিমোনিয়া আর ভালো করা গেলো না। মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রাসবিহারী শীল মারা গেলেন।

ধীরেনবাবু কাজীদাকে ধরে বললেন, 'কাজীদা, এই জন্যেই আপনি হাত দেখে রাসবিহারীকে কিছু বলেননি, না?'

কাজীদা বেদনার হাসি হেসে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, আমি সেদিন ওর হাতে মৃত্যু-যোগ দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম, খুব শীগ্‌গিরই হয়তো রাসবিহারীর মহা বিপদ আসছে। আর সেই জন্যেই আমি কিছু বলিনি সেদিন।' কাজীদার গানের ক্লাশ ভালো জমলো না সেদিন।

কাজীদা

শচীন দেববর্মণ

কাজীদা, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কাজী নজরুল ইসলাম যে কতোবড়ো গুণী, জ্ঞানী, কতবড়ো স্রষ্টা, কবি ও শিল্পী, তাঁর ব্যক্তিত্ব যে কতো মহান্, তাঁর বৈশিষ্ট্য যে কতোখানি এবং তাঁর স্থান যে কতো উঁচুতে তা দেশে বিদেশে কারো অজানা নেই।

তবে আমার পুরোনো দিনে, কাজীদার সঙ্গলাভ করার যথেষ্ট সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর ঐ সদাহাস্যময় মুখ, দিল-খোলা হাসি, মধুর ব্যবহার, সরলতা ও আপন-হারা ভাব কোনদিনই ভুলতে পারবো না। ছোটোখাটো হাসির কথা নিয়ে তিনি হাসির রোল তুলতেন—সেই সঙ্গে তাঁর ভিতরের গভীর ভাবও প্রকাশ পেতো।

একদিন রাত্রে তিনি আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। কী যেন একটা প্রসঙ্গে আমাদের বেশ গল্প জমে গেলো। হঠাৎ দেখি কাজীদার মনটি আর যেন এ-জগতে নেই—আপন আনন্দে আপনি বিভোর হয়ে গেছেন।

আমি তো প্রথমে এই দেখে অবাক!

তারপর দেখি কি, ঘরের এক দেওয়ালে একটু অন্ধকারে একটা জোনাকি পোকা জ্বলছে—নিভছে, আমরা কেউ সেদিকে খেয়ালই করিনি। কিন্তু কাজীদার দৃষ্টি সেদিকে চলে গেছে আর তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাই দেখে প্রাণভরে উপভোগ করছেন ও 'আহা আহা' বলছেন।

অনেকক্ষণ এভাবে কাটলো।

আমিও মুগ্ধ হয়ে কাজীদার ঐ আনন্দ আস্বাদন করতে লাগলাম।

সেদিন কিন্তু আগের প্রসঙ্গে আর ফিরে যাওয়া হলো না।

এরকম অনেকবার তাঁর সান্নিধ্যে যা যা ছোটোখাটো ঘটনার সৃষ্টি

হয়েছে তার মাধ্যমে কাজীদাকে আরো বেশী করে পেয়েছি ও জেনেছি। তাঁর যে ক'খানা গান আমি রেকর্ড করেছি—তার প্রতিটিতেই কাজীদার স্নেহের স্পর্শে আমার গান সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

তাঁর গান গেয়ে যে আনন্দ ও তৃপ্তি পেয়েছি তা আমার মনে সর্বদাই গেঁথে আছে ও থাকবে।

তাঁর গান গেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।

কবি নজরুল

জগৎ ঘটক

প্রায় ৪৪।৪৫ বৎসর পূর্বেকার কথা। বহরমপুরে কবির এক সংবর্ধনা সভায় তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এই পরিচয় শুধু ব্যক্তিগত পরিচয়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে পরিচয় আত্মীয়তায় নিবিড় হয়ে উঠেছিলো একদিন।

কর্মসূত্রের টানে কিছু দনের মধ্যে যখন আমাকে কলকাতায় চলে আসতে হয় তখনই কবির পরিবার ও আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গভীরতর হয়ে ওঠে। তিনি তখন হতেই অগ্রজের স্থান গ্রহণ করেন এবং অভিভাবকের ন্যায় আমাদের সুখে-দুঃখে অংশ গ্রহণ করেন। কোন্ অদৃশ্য হস্তের সোনার ছোঁওয়ায় এ মিলন-সেতু রচিত হয়েছিলো জানি না, তবে বোধ হয় প্রয়োজন ছিলো। প্রয়োজন ছিলো কবির —প্রয়োজন ছিলো আমাদেরও।

এরপর যখন তিনি 'মেগাফোনে' সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে যোগদান করেন, আমার কনিষ্ঠ সহোদরকে তিনি সহকারীরূপে সঙ্গে নেন। অপরিসীম স্নেহে সযত্নে তিনি নিতাইকে [নিতাই ঘটক] গড়ে তুলতে থাকেন এবং মেগাফোন ছেড়ে গ্রামাফোন কোম্পানীতে যোগদানকালে তিনি তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

কাজী নজরুল কবি, সাহিত্যিক। কিন্তু সঙ্গীত ছিলো তাঁর প্রাণ। তিনি নানা বিষয়ে নানা শ্রেণীর অসংখ্য গান তো লিখেছেন। কতো গান যে হারিয়ে গেছে এবং কতো গান যে লুপ্ত হবার পথে—তা বলা যায় না। তিনি নিজেও সে-কথা পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যদিও পূর্বে তিনি তাঁর গানের কিছু স্বরলিপি আমাকে দিয়ে করিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে তাঁর গানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য স্বরলিপির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই স্বরলিপির ভার

তিনি সম্পূর্ণ আমার উপরেই দিয়ে রেখেছিলেন এবং প্রায়ই তার জন্য আমায় তাগিদ দিতেন। উত্তর কালে যখন মার্গ সঙ্গীত উদ্ধারকল্পে গান রচনা করতে থাকেন, তখন অধিকাংশ সময়েই আমাকে সঙ্গে নিয়ে বসতেন আর সঙ্গে সঙ্গে স্বরলিপি করিয়ে নিতেন। এর ফলে সৃষ্টি হলো 'হারামণি', 'নবরাগ' প্রভৃতি গানের। দুঃখের বিষয়, হারামণি একদিন হারিয়ে গেলো কবির কাছ থেকেই, আর তার আঘাত কবির প্রাণে যেভাবে বেজেছিলো তা সত্যই মর্মস্পর্শী। কবি বলেছিলেন, 'যা হারিয়ে গেলো, তা আর কোনো দিনই ফিরে আসবে না।' এ-কথা আমার চিরদিনই মনে থাকবে। আঘাত আমার প্রাণেও কম বাজেনি—কবির সৃষ্ট গান ও সুর আর আমার সমস্ত গানের স্বরলিপি। অবশ্য পরে কয়েকটি গান ছিন্ন-কাগজের টুকরো খুঁজে উদ্ধার করেছি—তবে কয়েকটি মাত্র। 'নবরাগের' গানগুলি ও আমার স্বরলিপি অক্ষতই আছে। 'নবরাগ' কবির সৃষ্ট-রাগ।

স্বরলিপি সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব মতামত ছিলো। স্বরলিপিতে গানের সুরের কাঠামোটাকেই শুধু প্রকাশ করলে যেমন সুরের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় না, স্বরলিপির জটিলতাও তেমনি গাওয়ার পরিপন্থী হয়ে পড়ে। তাই স্বরলিপির ভাষাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে প্রকাশ করে গানের সুরকে মূর্ত করে তুলতে পারলেই সেই স্বরলিপি সার্থক হয়ে ওঠে। তিনি পূর্বেই লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর গানের সুর কিছু কিছু অদল-বদল হবার উপক্রম হতে চলেছে এবং এ বিষয়ে তিনি এক-আধজনকে সাবধানও করেছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরের বিকৃতি তিনি পছন্দ করতেন না।

কবি ও শিল্পীর জনপ্রিয়তার জন্য একই সঙ্গে চাই দুটো জিনিস—বৈচিত্র্য আর গভীরতা। বাংলা দেশের বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, এক সময়ে প্রায় সব সেরা কবিই গান লিখতেন। তাতে গানের বৈচিত্র্য ও গভীরতা দুই-ই ফুটতো। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত, নজরুল—সকলে নিজেদের গানের বেশীর ভাগ সুর নিজেরাই দিয়ে গেছেন। ফলে, গানের ভাবের দিকটা, যা কথা দিয়ে ফোটান চলে, তা যেমন তাঁরা নিজেদের আইডিয়া অনুযায়ী দিয়ে গেছেন, তেমনি সেই আইডিয়ার সুরগত প্রকাশের দিকটাকেও নিজেরাই পূর্ণ করে রেখেছেন। ফলে, সে-সব গান সৃষ্টির দিক থেকে পূর্ণরূপে কবি ও গীতিকারের প্রতিভার পুণ্যস্পর্শে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে; এবং সেই একই কারণে তাঁদের গান মানুষের চিরকালের আনন্দের উৎস এবং গোটা দেশের চিরদিনের সম্পদরূপে গণ্য হতে পেরেছে।

উনবিংশ শতকের বাংলা দেশের গান মোটামুটিভাবে উত্তর ভারতের এবং মার্গ সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবিত ছিলো। কাব্য সঙ্গীত যদিও এই সময় অনুপস্থিত ছিলো না তবু তা যেন ততখানি আভিজাত্য লাভ করেনি। রবীন্দ্রনাথই বুঝতে পেরেছিলন কেবল মার্গ সঙ্গীতের গণ্ডীতে বদ্ধ থাকলে বাংলা গান প্রাণ পাবে না। তাই একদিকে কথায় কাব্য-সঙ্গীতের ধারা এবং অপর দিকে দেশী ও বিদেশী সুরের উদার অভ্যর্থনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তকে মেলে ধরলেন। নজরুল এসে সেই ধারাকেই আরও অনেক দূরে ও বিবিত্র পথে টেনে নিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি বিদেশী সুরের মধ্যে ইউরোপ ও আমেরিকার ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিলো।

কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের বিরাট সঙ্গীত-জগৎ যেন তাঁর সুরগীতির অঙ্গনে আমন্ত্রণ পায়নি। নজরুলের গানে সেই অনিমন্ত্রিত অতিথির প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুল এলেন বিদ্রোহীর বেশ ধরে, কিন্তু বাংলা গানের ক্ষেত্রে তিনি যেন মধ্যপ্রাচ্যের সুরা ও সাকী; খেজুর গাছ, প্রখর রৌদ্র এবং ওয়েশিসের শ্যামলিমা নিয়ে হাজির হলেন। বাঙালীর কাছে এর স্বাদ নতুন, সুর নতুনতর। তাঁর প্রেমের (গজল) গানের কলি অনেক মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগলো।

আর কি তার বৈচিত্র্য! বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁরা রাধাকৃষ্ণের বাল্যলীলা প্রেমলীলা ও গোষ্ঠলীলায় সুর-চিত্র দর্শনের দুর্লভ সুযোগ লাভ করবেন নজরুলের রচনায়। শাক্ত যিনি, তিনি শ্যামা মায়ের পায়ের তলায় নিজের মনটিকে একটি রাঙা-জবা করে ধরে দিতে পারেন নজরুলের শ্যামা সঙ্গীতের খেয়ায় ভেসে: মুসলমান যিনি, তিনি ঈদ মুবারকের বাঁকাচাঁদ প্রথম দেখার আনন্দে আত্মহারা হবার ভাষা খুঁজে পাবেন এই নজরুল-গীতির ভাণ্ডার থেকেই। প্রেমিক যিনি, তিনি প্রেমের বিভিন্ন স্তরের সুখের ও শোকের সাড়া পাবেন নজরুলের গানে। তাঁর হাসির গানের সংখ্যাও কম নয়। তাঁর দেশাত্মবোধক গান সারা বাংলা তথা ভারতের নিপীড়িত জনগণের অন্তর-মথিত বাণী।

বিদেশী সুরে লেখা গানের পরিমাণ নজরুলের বিরাট গীতি ভাণ্ডারের তুলনায় খুব বেশী নয় বটে, কিন্তু নজরুলকে জানতে গেলে এর মূল্য আছে। কয়েকটি গানের নাম করছি—'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি', 'হে আমারই বাংলা দেশ' (হাওয়াইয়ান সুর), 'রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ খেজুর পাতার নূপুর বাজায়ে কে যায়' (আরবি সুর) 'শুকনো পাতার নূপুর পায়ে' (ইরাণী ও তুর্কী), 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে' (মিশরীয়) প্রভৃতি। দুঃখের বিষয় নজরুলের এই সব সুরে রচিত গানগুলির ঠিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে খুব বেশী প্রচলিত

করবার চেষ্টা এখনও হচ্ছে না। প্রতিভাবান এবং জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্র-সঙ্গীত শিল্পীদের দিয়ে এই ধরনের গান আরও বেশী করে রেকর্ড করানো দরকার। রেকর্ড করবার সময় যন্ত্র-সঙ্গীতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলে তাঁর সঙ্গীতের অনেক দিক স্পষ্ট হবে, যেটা তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

ঝুমুর ও ভাটিয়ালী গানের সুরে, পদাবলী ও শ্যামা সঙ্গীতের সুরে, কিংবা খাঁটি বাংলা সঙ্গীতের অনুসরণে নজরুল যে সব গান লিখেছেন তাতে নতুনত্ব যতখানি, তার চেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সুরে রচিত গানগুলিতে নতুনত্ব অনেক বেশী। তাঁর সুরের মধ্যে রাগ-সঙ্গীতের ধারা, লোক-সঙ্গীতের ধারা, বিদেশী সুরের ধারা, এবং সবার শেষে নিজস্ব সুরের ধারার সন্ধান মেলে। খুঁজলে গবেষকরা আরো দু-একটা নতুন ধারার খবর পেতে পারেন। বাংলা দেশে 'গজল' (প্রেম-সঙ্গীত)-এর বহুল প্রচলন (বিশেষ করে বাংলা ভাষায়) নজরুলের দ্বারাই হয়।

নজরুলের গান

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৩০ সালে আমি শান্তিনিকেতন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দিই। প্রথমবার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এক নূতন অভিজ্ঞতা হয়। রবীন্দ্রনাথ বড়ো কবি, না, নজরুল বড়ো কবি এই নিয়ে দু'দলের তর্ক হাতাহাতি, শেষে থালাবাটি ছোঁড়াছুঁড়িতে পরিণতি লাভ করে। আমার মুখে সেই ঘটনার বিবরণ শুনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সেই থালাবাটির আঘাত আমারই গায়ে লাগবে—আমার ভক্তেরা বোধহয় সে কথা ভুলে গেছল!'

সত্যাগ্রহ যুগে গ্রামে গ্রামে বহু স্থানীয় গ্রাম্যকবির গান চলেছিল রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদের গানের সঙ্গে। চব্বিশ পরগণার মহিষবাথান থেকে ভাঙ্গড় পর্যন্ত নানাগ্রামে মাদকদ্রব্য, বিদেশী কাপড় ও চৌকিদারি ট্যাক্স বর্জন প্রভৃতি আন্দোলন উপলক্ষ্যে আমরা নজরুলের গানও গেয়েছি। করাচী কংগ্রেসে ভোরের বৈতালিকে আমরা বাঙ্গালী সদস্যেরা দল বেঁধে নজরুলের গান গেয়েছি। বুকুৎসা প্রজা আন্দোলনে আত্মীয়ের জমিদারীতে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে যেতে হয়েছিল। সেই সময়কার একটি দিন আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। পুলিশ বুকুৎসায় যেদিন আমায় গ্রেপ্তার করে সেই রাত্রেই আমার অনেক সঙ্গীকে ধরে তালঘরিয়ায়। তারপর হাঁটাপথে এবং নৌকোতে প্রায় দেড়দিন কাটিয়ে আমরা আট-দশজন রাজসাহী শহরে ঢুকি। সেটা ১৯৩১-এর শেষদিক, শীতের সকাল। আমাদের কোমরে দড়ি বাঁধা, আগে-পিছনে-পাশে পুলিশ। হঠাৎ মনে হ'ল 'জেলে ঢোকবার আগে একবার শহরের লোককে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে আমরা এলুম।' সঙ্গে সঙ্গে সকলে মিলে সুরে বেসুরে উচ্চকণ্ঠে গান ধরলুম 'শিকল পরা ছল, মোদের এই শিকল পরা ছল।'

তার পর একে একে চলল 'উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল,' 'বলো ভাই, মাভৈঃ মাভৈঃ, নবযুগ ঐ এল ঐ,' 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' ইত্যাদি। ঐসব গান আমরা সভায় শুনেছি আগে, খাস নজরুলের কণ্ঠে শুনে মুগ্ধও হয়েছি, কিন্তু ওর প্রকৃত শক্তি এবং মর্যাদা জানতুম না তখন পর্যন্ত, হঠাৎ প্রত্যক্ষ করলুম সেদিন। আমরা যে পথ দিয়ে জেলের দিকে যাচ্ছিলাম, তার দু'পাশে রাস্তায় ভিড় জমে গেল, ছাদে ছাদে লোক দাঁড়িয়ে গেল, চারিদিকের গলি দিয়ে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ ছুটে আসতে লাগল দূর থেকে আমাদের ঐক্যতান সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে। সারা শহর তোলপাড় হয়ে গেছল সেদিন নজরুলের গানে।

কলিকাতায় বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রেরা সেবার একটা শিল্প প্রদর্শনী করেছিলেন। সম্পাদকরূপে আমার উপর ভার পড়েছিল উদ্বোধনে প্রধান অতিথিরূপে সুভাষবাবুকে নিমন্ত্রণ করে আনবার। সুভাষবাবু উদ্বোধনী বক্তৃতায় হঠাৎ নজরুলের নাম করেন, স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকরা তাঁর গানের সুরে মার্চ করবে বলে আশা জানান। কথাটা উপস্থিত অনেকের কাছে সেদিন অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিলো, বিশেষ করে রবীন্দ্রশিষ্যদের সভার সেই পরিবেশে; তবে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, দল বেঁধে মার্চ করবার উপযুক্ত গানের অভাব নজরুলই পূরণ করেছেন এদেশে, 'তাঁর উর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল' এদিক দিয়ে অতুলনীয়। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র ও অতুলপ্রসাদের গান সভায় যেমন জমে, পথে তেমন জমে না, সৈনিক এবং পথিক ছাড়া ও গান কারও পক্ষে লেখা কঠিন।

নজরুলকে যেমন দেখেছি

বেগম শামসুন্‌নাহার মাহ্‌মুদ

নজরুলের আবির্ভাব অত্যন্ত আকস্মিক। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র পাতায় পাতায় তাঁর আগুন-ঝরানো লেখা হঠাৎ চমক লাগালো বাঙালী পাঠক সমাজের মনে। কে এই সৈনিক কবি?...'উঃ কী আগুন বৃষ্টি। আর কী ভয়ানক শব্দ—গুড়ুম-দ্রুম—দ্রুম। আকাশের একটুও নীল দেখা যাচ্ছে না। যেন সমস্ত আসমান জুড়ে আগুন লেগে গেছে। বাস্তবিক এ গোলা বারুদের রঙে আসমান-জমীন লালে লাল হয়ে গেছে। সব চেয়ে বেশী লাল, ঐ বুকে বেয়োনেট-পোরা, হতভাগাদের বুকে রক্ত। লালে লাল! শুধু লাল আর লাল! এক একটা সেপাই শহীদ হয়েছে, আর যেন বিয়ের নওশার মতো লাল হয়ে আছে।' এই ধরনের লেখা, সত্যি বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু। মেসোপোটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সৈনিক-কবি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের চমক-লাগানো লেখা প্রায়ই দেখা যেতে লাগলো মাসিক পত্রিকার পাতায়। বাঙালীর মনে ধাক্কা লাগলো তাঁর মর্মভেদী সুর—'ওরে আয়, ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে ঘন রণভেরী শোনা যায়।'

মহাযুদ্ধের শেষে ফিরে এলেন নজরুল। তাঁর রচনা তখন পুরোদমে চলেছে আর আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে যেন বাঙালীর মনে। 'মোসলেম ভারতে' মাসের পর মাস বেরুতে লাগলো 'বিদ্রোহী,' 'কামাল পাশা' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা। বাঙালীর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হলো:

'ঐ বল বীর—বল উন্নত মম শির।
শির নেহারি আমারি, নতশির ওই শিখর হিমাদ্রির!'...
'ঐ ক্ষেপেছে পাগলী মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই
অসুর পুরে শোর উঠেছে জোরসে সামাল সামাল তাই।'

যেখানেই গেছেন নজরুল, যে কাজেই হাত দিয়েছেন, ঝরেছে তাঁর উপচে-পড়া প্রাণের প্রাচুর্য। তাঁর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি দিয়ে তিনি সজীব করে তুলেছেন চারিদিক। জেলখানার ভিতরে বসে তিনি গান রচনা করতেন, গাইতেন আর দল গড়তেন। তাঁর আশেপাশে এসে জুটতেন ঘরছাড়া রাজনৈতিক বন্দীর দল। তাঁদের হাত-পায়ের শিকল ঝন্‌ঝনিয়ে বাজতো। নজরুলের সুরে সুর মিলিয়ে মহা উন্মাদনায় তাঁরা গাইতেন :

'শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল।'

এভাবে কয়েদখানার আবহাওয়াকে কি করে তাঁরা উতরোল করে তুলতেন, অতিষ্ঠ করে তুলতেন জেল কর্তৃপক্ষকে—এ-সব গল্প আমরা নজরুলের নিজের মুখে শুনেছি। তাঁর ১৯২৯ সালের চট্টগ্রাম সফরের কথা বলছি। আমাদের বৈঠকখানায় দাদার (জনাব হবীবুল্লাহ্ বাহার) সঙ্গী ছাত্রদল, অন্যান্য সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের মজলিস জমজমাট করে তুলতেন নজরুল—তাঁর গান, গল্প ও আবৃত্তি দিয়ে।

দেখতে দেখতে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান' প্রভৃতি পুস্তকের গান ও কবিতা দেশের মাঠে-ঘাটে ছড়িয়ে পড়লো। দেশের মুক্তি আন্দোলনে একটা প্রেরণার উৎস সৃষ্টি করলো নজরুলের সাহিত্য ও জীবন। রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়ালেন ঐটুকুই বিদ্রোহী কবির সব নয়। তাঁর বিদ্রোহ শুধু বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধেই নয়। সমাজের মধ্যে মানুষে মানুষে বিভেদ, অর্থনীতিক বিভেদ ও সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য—এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর বিদ্রোহের মূল সুর। দেশের লাঞ্ছিত, ভাগ্যাহত, চাষী, মজুর, ধীবর—সকলেই মর্যাদা পেলো তাঁর কাব্যে। তাদের করুণ কাহিনী রূপ পেলো তাঁর কবিতার ছন্দে, তাঁর গানের সুরে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের হট্টগোলের মাঝখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যবাদ প্রচারের উত্তেজনার ভিতরে একই সময়

পাশাপাশি বিশ্ব-প্রকৃতি কি করে তাঁকে হাতছানি দিতো তা আমরা স্বচক্ষে দেখেছি। সারাদিন সভা-সমিতি, বক্তৃতা-মজলিস নিয়ে মেতে থাকবার পর রাত্রিবেলা গভীর অন্ধকারে প্রকৃতি তার রূপের ঐশ্বর্য মেলে ধরতো তাঁর কাছে। চট্টগ্রামের গিরিনদীবন তাঁর মনকে উতলা করে তুলত। রাত্রির পর রাত্রি অবিরাম তিনি লিখে যেতেন —'সিন্ধু'র প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তরঙ্গ, 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি'। এই সময়েই তিনি লিখেছেন 'অনামিকা', 'গোপনে প্রিয়া' প্রভৃতি 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতাগুলি। তিনি লিখেছিলেন আমাকে একটা চিঠিতে—'আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর, সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ। আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সঙ্ঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে—দু'ধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারে গ্রামবাসীদের জন্য—তা তার এক আনা; বাকি পনেরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে—সৃষ্টি-দিন হতে—আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যতো বলা সেই বিপুলতরকে নিয়ে—আমার সেই প্রিয়তম, সেই সুন্দরতমকে নিয়ে।' রাজনৈতিক হট্টগোলের মাঝেও তিনি সেই সুন্দরের স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেতেন।

নজরুলের অল্প কয়েক বছরের কবি-জীবন। শেষের দিকে তাঁর প্রতিভার সেই আবেগ ও উন্মাদনা অনেকটা স্থিতি লাভ করলো। এ সময় তিনি গান ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা করেন নি। গান তিনি রচনা করেছেন অসংখ্য। তার মধ্যে বহু গান সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে থাকবার দাবী রাখে। তাঁর প্রথমবার চট্টগ্রাম অবস্থান-কালে যেমন তিনি মজলিস জমাতেন স্বদেশী গান দিয়ে—তেমনি দ্বিতীয়বারে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করতেন গজলের সুরে সুরে। আমানের বৈঠকখানায় বসতো গানের মজলিস। কবি-কণ্ঠে ঝরে ঝরে পড়তো সঙ্গীতের আনন্দ ও বেদনা।

মুক্তির ডাক যখন যেভাবে এসে পৌঁছেছে তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছে নজরুলের বিদ্রোহী মন। মহাযুদ্ধের সৈনিক ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক হয়ে সার্থকনামা হয়ে উঠলো। নজরুলের কাব্যসাধনার সেই চারণ-যুগ অবিস্মরণীয়। তাঁর হাতে ছিলো বিষের বাঁশী। যে-বিষ তিল তিল পান করে ভারতবর্ষ নীলকণ্ঠ, সে বিষেরই বিষাক্ত কণ্ঠে ভারতবর্ষের মুক্তিমন্ত্র পাঠ করেছিলেন তিনি। শুনতে পেয়েছিলেন 'রক্ত নিশি ভোরে,' 'বন্দীশৃঙ্খলে,' মুক্তি কোলাহল'। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, সৈনিকের ঐতিহ্য সাগ্নিকতা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নি:

'ওরে হত্যা নয়, এ সত্যাগ্রহশক্তির উদ্বোধন'—এ বিশ্বাসের বর্ণে-ই তাঁর মনের তন্তুগুলি রঞ্জিত ছিলো, যদিও 'বন্দিনী মা'র আঙিনায়,' 'পাগল পথিক' গান্ধীজীকে দেখেও মন তাঁর গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠেছে:

'কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে যায়—।'

অসহযোগ আন্দোলনের অধ্যায় সমাপ্ত হলো, কিন্তু চারণ-কবি নজরুলের মনে সামাজিক মুক্তির আন্দোলন নীরব হয়ে এলো না। বৈদেশিক শাসন আর শোষণই তো শুধু নয়, নিজেরাই নিজেদের শাসন-শোষণ করে চলেছি আমরা অবিরত, আর তারই দরুন মানুষ পূর্ণ-মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। 'নরনারায়ণে' আমরা পদাঘাত করি, 'জাতের নামে বজ্জাতি' করি, অবমাননা করি স্ত্রীজাতির—কোথায় আমাদের মনুষ্যত্ব? নজরুলের মানবীয় অনুভূতির রং সাম্যবাদের অরুণাভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো আবার। পুরোনো দেশে

পুরানো জীবনের চারপাশে যে অসার জঞ্জাল জড়ো হয়েছে—তার আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়া চাই। সমাজের সচেতন শ্রেণীর এই আশঙ্কা কবিতা হয়ে উঠলো নজরুলের ভাষায়—নজরুলের সদাজাগ্রত অনুভবশক্তি সমাজের এই মূক অনুভূতিকে স্পর্শ করে গেলো। দারিদ্র্যের তীব্র কশাঘাতে সমাজ-মনের শাপ-মোচন অবশ্য মন্থর গতিতে সব সময়েই হয়ে এসেছে, অসহযোগ আন্দোলনের আলোড়ন সে গতিকে খানিকটা ক্ষিপ্র করে তুলেছিলো মাত্র। এই ক্ষিপ্রতার ছন্দেই ছন্দিত হয়েছে নজরুলের কবিতা, তিনি এক তিলও পিছনে পড়ে থাকেন নি।

বন্ধন-মুক্তির যে প্রেরণা কবি নজরুলের মনে সক্রিয় ছিলো তা একটি আসন্ন সাহিত্যিক আন্দোলনেরই অগ্রদূত। প্রাচীন সংস্কারের বলয়-বেষ্টন ভেঙে দিয়ে সমাজ-মানসের একটি ধারা তখন নতুন জগতের স্পর্শ পাবার জন্য ব্যাকুল—নজরুলের সর্বতোমুখী বিদ্রোহের উদাহরণে সে নবধারা একটি প্রশস্ত পথ কেটে নেবার উৎসাহ লাভ করলো। দেখা গেলো এই মনোভঙ্গীর ধারক ও বাহক তখন আর একা নজরুল ইসলাম নন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্তের মতো প্রতিভাবান কবিসম্প্রদায়ও। বাংলা-সাহিত্যে এই কবি-সম্প্রদায়ের দান অসামান্য আর কবি নজরুলের সবচেয়ে সার্থকতা এই যে, তিনি এঁদের অগ্রজ।

জীবনের অবারিত অভিযানে সমাজের ও সাহিত্যের বন্ধন-মুক্তিই সেদিন শেষ কথা ছিলো না, দ্রুত পদক্ষেপে দেশ এগিয়ে চলছিলো আবার রাষ্ট্রিক বন্ধন-মুক্তির জয়যাত্রায়। আইন অমান্য অন্দোলনে ভারতবর্ষের জনসমুদ্র আবার গর্জে উঠলো। কবি নজরুল আবার ফিরে এলেন চারণের ভূমিকায়—নূতন করে জন্ম নিলো তাঁর বিদ্রোহ সত্তা :

> 'কারার এই লৌহ কপাট
> ভেঙে ফ্যাল্ কর্ রে লোপাট
> রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণবেদী—'

—গেয়ে উঠলো তাঁর কণ্ঠ, দুর্গম গিরি, দুস্তর পারাবার পার হবার আহ্বান জানালেন তিনি—জিজ্ঞেস করলেন :

'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেলো যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান ?'—

তারপর সত্যিকারের চারণের মতোই দুঃসাহসিক আশ্বাস দিলেন :

'এই গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।'

চারণ-কবি হয়ে পুনরায় ফিরে আসাই হয়তো সত্যিকারের নজরুল ইস্‌লাম। হয়তো নজরুল ইস্‌লামই বাংলার শেষ চারণ-কবি। চারণ-কবির কণ্ঠ থেকেই বিদ্রোহী বিদ্রোহের সুর শিখে নেয়, কবি খুঁজে নেয় কবিতার উপাদান, রক্ত নেচে ওঠে সৈনিকের ধমনীতে। আর তারই স্মৃতি বহুদিন, বহুযুগ ঘুরে বেড়ায় আমাদের মনে।

উপন্যাস রচনায় নজরুল

মুহম্মদ আবদুল হাই

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের খ্যাতি কবি ও সুরশিল্পী হিসাবে। কবিতা ও গানের অনুপাতে গদ্য-রচনা তাঁর অনেক কম। তিনি গোটা-আঠারো গল্প লিখেছেন আর উপন্যাস লিখেছেন তিনটি। আঠারোটি গল্প তাঁর 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' এবং 'শিউলি-মালা' গল্প-সংগ্রহে স্থান পেয়েছে। উপন্যাস তিনটি যথাক্রমে 'বাঁধনহারা', 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'।

বাংলা সাহিত্যে নজরুল ইসলাম একটা ব্যতিক্রম। নেতিয়েপড়া সুরের দেশে কাব্যে এবং সঙ্গীতে তিনি প্রলয় নিনাদ তুলেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের গদ্য রচনাতেও ব্যতিক্রমের সুর সুস্পষ্ট। সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ডে উপন্যাসে দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে কাহিনী নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, ঘটনা সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে যে ঐক্য ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে তা নেই।

সমালোচনার শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হাতে নিয়ে ঔপন্যাসিক হিসাবে নজরুলকে বিচার করলে একদিকে যেমন তাঁর অনেক ত্রুটি পাওয়া যাবে, তেমনি এ ত্রুটিগুলোই যে তাঁর ব্যতিক্রম এবং বৈশিষ্ট্য-নির্দেশক হয়ে রয়েছে, সমালোচককে তাও স্বীকার করতে হবে।

একটা যুগের স্রষ্টা হিসাবেই নজরুল বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারায় একটা ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছে। নজরুল প্রতিভার ছোঁয়া সাহিত্যের যে ধারায় লেগেছে, তাতেই বৈচিত্র্যেরও সৃষ্টি কম হয় নি। উপন্যাস রচনাতেও তাই দেখা যায়, তিনি গতানুগতিকতার পথে পা বাড়ান নি।

প্রথম যুদ্ধের পর থেকে বাংলার বিপ্লব বা সন্ত্রাসবাদের কাল পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৩০—৩২ সাল পর্যন্ত নজরুল, রবীন্দ্রনাথের যুগেই

রবীন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করে একটা স্বতন্ত্র যুগের সূচনা করেছিলেন। এ-যুগ বাংলা দেশের তথা অবিভক্ত ভারতের মানস-চাঞ্চল্য ও অস্থিরতার যুগ। প্রথম মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি জয়ী হলেও বৃটিশ রাজ-শক্তির পতনোন্মুখ রূপ এ উপমহাদেশের অগণিত তরুণ-মনে আশার সঞ্চার করে। এ দেশ স্বাধীন না হলে দেশের আত্মা জাগ্রত হবে না। বুভুক্ষু মানুষের ক্ষুধারও অবসান হবে না। তাদের এ বিশ্বাসকে আরও দৃঢ়ীভূত করেছিলো এ কালের নতুন সমাজবাদ-ভিত্তিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা। গান্ধীজীর অহিংস অন্দোলনের পথে এদেশবাসী আকৃষ্ট হলেও বাংলার তরুণদের প্রাণে তার আবেদন তেমন প্রবল হয় নি। বাংলার তরুণেরা অহিংস পথ অবলম্বন না করে দেশের মুক্তির জন্য বিপ্লব ও সন্ত্রাসের সহিংস পথই বেছে নিয়েছিলো। এ যুগের মানস-চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বেদনাকে যুগের চারণ-কবি হিসাবে নজরুল তাঁর কাব্যে ও গানে মুখরিত করে তুলেছিলেন আর তাঁর উপন্যাসত্রয়ীতে এঁকেছিলেন এ যুগেরই জীবন্ত প্রতিরূপ। বাংলার যে অক্ষয় যৌবন সে-সময় মুক্তিকামী ভারতবাসীর নেতৃত্ব করেছে, দেশের আজাদীকে ত্বরান্বিত করার জন্য যে তরুণ-তরুণীরা ফাঁসিমঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, দেশ-প্রেমিক সেই সর্বহারার দলের জীবনালেখ্য রচনা করেছেন নজরুল তাঁর 'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসে। এদের পণ ছিলো দৃঢ়, বাসনা ছিলো অদম্য। দেশোদ্ধারই ছিলো তাদের একটি মাত্র 'প্লট'। ষড়যন্ত্র যতই করুক না কেন, তাতে কোনো জটিলতা ছিলো না। দিনের আলোর মতই তা ছিলো সুস্পষ্ট। 'কুহেলিকা' উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝুলুল আর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারকে তাই জীবনের সকল দেনা-পাওনার বাঁধন দু'হাত দিয়ে ছাড়িয়ে এক প্রলয়-নেশায় মেতে উঠতে দেখি। মায়ের স্নেহ, আত্মীয়-আত্মীয়ার আদর-যত্ন অবহেলা করে দেশের স্বাধীনতার দুরূহ ব্রতে জীবনকে বারংবার এরা বিপ্লব-বহ্নির করাল কবলে সমর্পণ করেছে, তবু পরাজয় স্বীকার করে নি।

'মৃত্যুক্ষুধা'ই নজরুলের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। পেটের ক্ষুধা মানুষকে তিলে তিলে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তার ধর্ম-বিশ্বাস এবং জন্মার্জিত সংস্কার কিভাবে শিথিল হয়ে ওঠে, অত্যন্ত বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে নজরুল তার ছবি এঁকেছেন এ উপন্যাসে। কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের একটি দরিদ্র মুসলমান পরিবার ক্ষুধার তাড়নায় কিভাবে ধুঁকে মরেছে তার নিখুঁত এবং জ্বলন্ত বর্ণনা দিয়েছেন নজরুল। এ কাহিনীর সঙ্গে সুগ্রথিত হয়েছে বিপ্লবী আনসারের দেশসেবা, কারাবরণ ও আত্মত্যাগের করুণ ইতিহাস।

'কুহেলিকা' এবং 'মৃত্যুক্ষুধা'য় নজরুলের জীবন-দর্শন রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন চরিত্রে এবং তাদের দেশমাতৃকার মুক্তিপণের জন্য জীবন বলিদানে। কিন্তু নজরুলের সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচয় বোধ হয় আমরা পাই তাঁর 'বাঁধনহারা' পত্রোপন্যাসে। 'বাঁধনহারা' নামটি এ উপন্যাসের প্রকৃতি এবং গ্রন্থকারের মানসেতিহাসের পরিচয় বহন করছে।

উল্কা এবং ঝঞ্ঝার বেগে নজরুল বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছিলেন। পূর্ণিমার চাঁদের মতো ধীরে ধীরে ষোলকলায় তিনি বর্ধিত ও বিকশিত হন নি। যুদ্ধক্ষেত্রে গোলা-গুলি তলোয়ার সঞ্চালন করতে গিয়ে মসীযুদ্ধেও তিনি হাত পাকিয়েছেন।

নজরুলের উপন্যাসত্রয়ীতে কাহিনীর গাঢ় বিন্যাস এবং উজ্জ্বল চরিত্র চিত্রণ আমরা পাইনে সত্য, কিন্তু তাঁর কবি-জীবনের স্বপ্ন ও সাধ, কবিতা ও সঙ্গীতে যেমন, এগুলোতেও তেমনি বিধৃত হয়েছে। ভাষার উপরে নজরুলের যে কতোবড়ো দখল ছিলো তাও জানা যায় তাঁর এ উপন্যাসগুলিতে।

তাঁর উপন্যাসে আমরা নজরুলের পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত দেখতে পাই।

মনে পড়েছে—গ্রামের স্কুলে পড়ি তখন। বাঙলা পরীক্ষায় বিশেষ পুরস্কার পেলুম। হেডমাস্টার মশাই বললেন—তোমার ইচ্ছেমতো বাঙলা বই পুরস্কার দেওয়া হবে তোমাকে। অন্য কয়েকখানি বইয়ের সঙ্গে নজরুলের 'অগ্নিবীণা'ও ঢুকিয়ে দিয়েছিলুম লিস্টে।

কিছুদিন পরে বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হলো 'অগ্নিবীণা' বইটি। নিষিদ্ধ বইখানির সন্ধানে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সকলের বাড়ির আনাচে-কানাচে। আমাদের বাড়িও বাদ যায় নি সেদিন। ব্রিটিশ সরকারের পেনশনভোগী বৃদ্ধ পিতামহ আমার কোন্ এক অজ্ঞাতস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমার বইখানি সুদক্ষ ম্যাজিসিয়ানের মতো, কোনোদিনই সন্ধান পাইনি তার।

গ্রামের স্কুল থেকেই ম্যাট্রিক পাস করে পড়তে এলুম কলকাতার কলেজে। গল্প, কবিতা লেখবার চেষ্টা করছি একটু একটু। সৌভাগ্যক্রমে এমন একজন মানুষের সংস্পর্শে এলুম যিনি হচ্ছেন সেই 'অগ্নিবীণা'র কবিরই আবাল্য অকৃত্রিম বন্ধু। তিনি হচ্ছেন বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

এই শৈলজানন্দের কাছেই শুনেছি নজরুলের কতো অন্তরঙ্গ কথা। শুনতে শুনতে অভিভূত হয়ে পড়েছি। তাঁকে চাক্ষুষ দ্যাখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থেকেছি দিনের পর দিন। কিন্তু এমনিই দুর্ভাগ্য আমার যোগাযোগ হয়ে ওঠে নি কোনো দিন।

আইনজীবী পিতার কর্মস্থলে—এই দার্জিলিং শহরে—আসতে হলো আমাকে ল' পাস ক'রে। মনে তখনও রয়ে গিয়েছে নজরুলকে না-দ্যাখা সেই অপূর্ণ বাসনা। অল্প কিছুদিন পরেই খবর পেলুম উনি এসেছেন এখানে এবং অজ্ঞাতবাস করছেন কোনো একটি স্থানে।

আনন্দে উৎসাহে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো আমার মন। কলকাতার জনারণ্যে ছাখা পাইনি যাঁর, হিমালয়ের নির্জনতায় ছাখা পাবো নিশ্চয়ই

বিনা দ্বিধায় গিয়ে হাজির হলুম তাঁর কাছে। পরিচয় দিতেই কি প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলেন আমার দিকে, সস্নেহে টেনে নিলেন নিজের কাছে। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন—প্রখ্যাত গায়ক আব্বাসউদ্দিন সাহেব। অনেক গল্প, অনেক স্মৃতিচারণ।

স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছায় অনুরোধ করলুম ওঁকে—আসতে হবে একদিন আমাদের নৃপেন্দ্রনারায়ণ হিন্দু পাবলিক হলে। এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন উনি। কী উদার, কী মহৎ।

তারপর—সেই সন্ধ্যাটি, অবিস্মরণীয় হয়ে আছে আজও যেটি লোকে লোকারণ্য, 'হলে' তিলধারণেরও স্থান নেই, অথচ নিস্তব্ধ একটির পর একটি আবৃত্তি করে চলেছেন কবি তাঁর স্বরচিত কবিতা গেয়ে চলেছেন একটির পর একটি স্বরচিত গান। কী উদ্দাম, সে কী উত্তাল প্রলয়মাতাল, পাগল মূর্তি! সমস্ত মঞ্চ পদভারে কম্পমান।

উদাত্ত কণ্ঠের সে কী অভিব্যক্তি :

'মহা-বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ
ভীমরণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।'

মনে হলো—হিমালয়ে নটরাজের যে-রূপ দেখলুম, আর কি তা দেখবো। আবার খুঁজে পেলুম আমার হারানো 'অগ্নিবীণা'কে, যার আগুন-সুর ব্রিটিশ শাসকের বুদ্ধি এড়িয়ে রক্তের রূপে প্রবাহিত হ'লো আমাদের ধমনীতে।

মধুমালার গোড়ার কথা

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

১৯৪৫ সালের কথা—রঙমহল রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা কয়েকজন হ্যারিসন রোডে এ্যাল্‌ফ্রেড্‌ রঙ্গমঞ্চে নাট্যভারতীর উদ্বোধন করি। এখন এই রঙ্গমঞ্চ প্রেস্‌ সিনেমায় রূপান্তরিত হয়েছে। নাট্যভারতীর মালিক ছিলেন শ্রীরঘুনাথ মল্লিক ও রঙ্গমঞ্চের তত্ত্বাবধান করতেন তাঁর শ্বশুর স্বর্গীয় গদাধর মল্লিক। গদাধরবাবু এক সময়ে আর্ট থিয়েটারের অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন ও তাঁর নাট্য-প্রীতি ছিলো অসাধারণ। তাই গদাধরবাবু ও তাঁর পুত্র শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক ও জামাতা শ্রীরঘুনাথ মল্লিক একত্রে যখন একটি খুব ভালো নাটক মঞ্চস্থ করবার সঙ্কল্প করলেন, তখন আমাদের হাতে প্রযোজনা করার মতো কোনো নাটক ছিলো না।

নাট্যভারতীর যিনি নামকরণ করেছিলেন সেই স্বনামখ্যাত নাট্যকার স্বর্গীয় শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তখন নতুন নাটক রচনায় ব্যাপৃত, কিন্তু ইতিমধ্যে একটি ভালো নাটক কোথায় পাওয়া যায় তার জন্য অনুসন্ধান চলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে একদিন বন্ধুবর কাজী নজরুল আমায় বললেন যে, 'মধুমালা' নামে তাঁর একটি ভালো গীতিনাট্য লেখা আছে, সেটি যদি আমি পরিচালনার জন্য গ্রহণ করি, তাহলে তিনি খুশী হবেন।

আমি বললাম, তুমি ভাই আমায় পাণ্ডুলিপি পড়তে দাও, যদি মনে করি যে, তার প্রযোজনা করা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে সম্ভবপর, তাহলে আমরা অবিলম্বে তোমার নাটক নিয়েই কাজ শুরু করবো। নজরুল তার পরদিনই নাটকটি আমার হাতে দিলেন এবং সেই দিনই তা পড়ে আমি গদাধরবাবুকে শোনালাম। তিনিও গীতিনাট্যের রচনা প্রণালী দেখে মুগ্ধ হলেন। পরের দিনই বন্ধুবরকে আমি নিয়ে গেলাম তাঁর

কাছে এবং মধুমালাকে রঙ্গমঞ্চের উপযোগী করে তোলার জন্য নানারূপ পরিকল্পনা শুরু হয়ে গেলো।

কাজী স্বয়ং তাঁর গানের রচনায় সুর সংযোগ করতে এগিয়ে এলেন—তাঁর সুর শুনে গায়ক-গায়িকারা মুগ্ধ হলো এবং রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

গীতিনাট্যের প্রযোজনা করা বাংলা রঙ্গমঞ্চের পক্ষে খুবই কঠিন। কারণ, সাজ-পোশাক, দৃশ্যপটের চমৎকারিত্ব, সঙ্গীতের বিপুল আয়োজন, সব কিছুর জন্য যে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন, অনেক রঙ্গমঞ্চের মালিকের পক্ষে অতো টাকা ব্যয় করা সব সময় সাধ্যায়ত্ব হয়ে ওঠে না। তবে গদাধরবাবু ও তাঁর জামাতা রঘুনাথবাবু বললেন যে, খরচ করতে আমরা কার্পণ্য করবো না। সত্যি, খরচ করতে তাঁরা পিছপাও হন নি। সে সময় সুপ্রসিদ্ধ মঞ্চশিল্পী মণীন্দ্রনাথ ঘোষ (নানুবাবু) মহাশয়কে তাঁরা দৃশ্যপট ও আলোক নিয়ন্ত্রণের ভার দিলেন, পোশাক-পরিচ্ছদ নতুনভাবে তৈরী করালেন, শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীমতী হরিমতিকে তাঁরা মূল গায়িকা হিসাবে নিযুক্ত করলেন, তাছাড়া সে যুগের নৃত্যগীত-কুশলা অভিনয়দক্ষা শ্রীমতী সাবিত্রীকে মধুমালার ভূমিকায় অবতীর্ণ করাতে মনস্থ করলেন। রাজপুত্রের ভূমিকায় স্বর্গীয় জহর গাঙ্গুলী ও অন্যান্য ভূমিকায় স্বর্গীয় রথীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ সিংহ ও আরও কয়েকজন অবতীর্ণ হলেন। গানের ও নেপথ্য সুরের মূর্ছনায়, দৃশ্যপটের অভিনবত্বে মধুমালা অপরূপ রূপ নিয়ে আবির্ভূত হলো।

কাজী স্বয়ং সুরের দিক ও আমি অভিনয়ের দিকে দেখতে লাগলাম। সমস্ত দর্শক মুক্তকণ্ঠে মধুমালার প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ সময় অপেরার বিপুল ব্যয়ভার গ্রহণ করার জন্য যে দর্শকের সমাগম হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিলো তা হলো না। গীতিনাট্য চিরদিন লোকে অন্য নাটকের সঙ্গে দেখে এসেছে, কিন্তু এককভাবে গীতিনাট্য দেখতে লোকে উৎসাহ বোধ করলে না। অথচ সাধারণ যে-কোনো নাটকের

দ্বিগুণ পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে এই ধরনের আড়ম্বরপূর্ণ নাটক রঙ্গমঞ্চে চলে না। এ ছাড়াও সে সময় বর্তমানকালের মত এতখানি রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রীতিও লোকের ছিলো না—তাই চল্লিশ রাত্রি অভিনয়ের পর আমাদের আবার অন্য নাটক প্রযোজনা করতে হয়।

তবে এ-কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি বিদগ্ধ সমাজ কাজী সাহেবের এই গীতিনাট্য দেখে বিমুগ্ধ হয়ে আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা করে গেছেন এবং সে সময় সঙ্গীত-রসিক ও শিল্পবোধসম্পন্ন দর্শকমহল অজস্র অভিনন্দন দিয়েছিলেন আমাদের।

মধুমালার কথা, পরীদের গান, সংলাপের ভাষা—সব কিছু মিলিয়ে এক মোহময় স্বপ্নাবেশের সূচনা হতো প্রেক্ষাগৃহে। কবির রচনা যে সার্থক হয়েছিলো তা সকলেই স্বীকার করে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন

আমার জীবনে নজরুল

ইব্রাহিম খাঁ

নজরুল ইসলামের প্রতিভার ছটা, তাঁর প্রাণের আগুন তরুণ বাংলার আকাশে-বাতাসে এমনভাবে ছেয়ে গেছিলো যে, তার প্রভাব হতে মুক্তি পাওয়া অনেকের পক্ষেই সুকঠিন ছিলো। আবহাওয়া মানুষকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাবিত করে, হাতের আঙুল দিয়ে কড়ায়-ক্রান্তিতে গননা করে অথবা ছটাক-তোলার তৌল-দণ্ডে তুলে, কিংবা গজ-হাত-ইঞ্চির ফিতায় মেপে তা প্রমাণ করা সহজ নয়। নজরুল ইসলামের প্রভাবও তেমনি অল্পাধিক এতো সূক্ষ্ম মাত্রায়, এতো বিভিন্ন লোককে, এতো বিচিত্ররূপে প্রভাবিত করেছে যে, সব স্থলে তা হাতে-কলমে প্রমাণ করা কঠিন। কিন্তু সে প্রভাবের পরিচয় আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করে থাকি।

আমার জীবনে নজরুল ইসলামের প্রভাব কতখানি পড়েছে, স্পষ্ট বলতে পারি না। তবে প্রভাব যে পড়েছে তাও অস্বীকার করার উপায় দেখি না। কারণ আমার অন্তরের আনন্দ-মহলে নজরুল ইসলাম তাঁর স্থায়ী আসন গেড়ে বসে আছেন। আনন্দ হতে সৃষ্টি; কাজেই আনন্দের সাথে যিনি অংশতঃ মিশে বসে আছেন, সৃষ্টির মধ্যেও তিনি অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করে আছেন—এই-ই স্বাভাবিক।

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজ-ফরাসী-ইটালী-আমেরিকার রণ-ক্লান্ত সৈন্যরা গৃহে ফিরেছে; পথে-ঘাটে, হাটে-মাঠে, শহরে-বন্দরে, বিজয়-অভিনন্দনে তাদেরকে অভ্যর্থনা করা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের আশা-উন্মেষ বুকে নিয়ে প্রতীক্ষমান এই উপমহাদেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চেয়ে আছে: হিন্দু-মুসলমান মিলে জগতের দিকে দিকে লড়াইয়ের বিভিন্ন ময়দানে ইংরেজ পক্ষে জয়ের জন্য যে-অর্থ, যে-রক্ত

যে প্রাণ দিয়েছে তার বিনিময়ে চায় তারা দেশের স্বাধীনতা—ষোল আনা না হয় অন্ততঃ আংশিক। আর মুসলমানরা আরো চায় যে, তুর্ক সাম্রাজ্য রাখা হোক অক্ষুণ্ণ—যেমন জবান দেওয়া হয়েছিলো। ইংরেজ এর কোনটাতেই রাজী হতে পারলো না। তখন ধূমায়িত হতে শুরু করলো দেশের স্বাধীনতা-সাধকদের অসন্তোষের অনির্বাণ বহ্নি।

দেশের এই ক্ষুব্ধ মুহূর্তে সহসা নজরুল ইসলামের কলমে নব-জীবনের বাণী মূর্ত হয়ে উঠলো। মনে আছে, আমাদের বিদ্যালয়ের এক হিন্দু পণ্ডিত একদিন মহোল্লাসে এসে আমাকে বললেন: দেখুন দেখুন, একটা নতুন রকমের কবিতা—এ যেন রামধনুর বিচিত্র রূপসজ্জার জায়গায় জ্বলন্ত পাখা-প্রহারে ঝিলিক দিয়ে বেড়াচ্ছে এক প্রদীপ্ত বিদ্যুতের দুরন্ত বলাকা! দেখলাম, তিনি 'শাতিল আরব' কবিতাটি নিয়ে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আমারও কাছে এ-কবিতা তখন অদ্ভুতই লেগেছিলো। তখন সাকুল্য কবিতাটাই মুখস্থ হয়ে গেছিলো। এখনও দু-চার লাইন মনে পড়ে:

'শাতিল আরব! শাতিল আরব! পূতঃ যুগে যুগে তোমার তীর
শহীদের লহু, দিলীরের খুন ঢেলেছ যেখানে আরব বীর।'

....

শমশের হাতে আঁসু আঁখে হেথা মূর্তি দেখেছি বীর নারীর।'

আমাদেরই এক ভাই লিখতে পারে, আগুনের ভাষায় লিখতে পারে, মুসলমানের নিত্য-ব্যবহার্য শব্দ দিয়ে অপরূপ সুন্দর করে লিখতে পারে, মুসলমানের অতীত কীর্তি মহিমার কথা রক্তাশ্রুময় দরদ দিয়ে লিখতে পারে, এই একটি কবিতায় তা প্রমাণিত হলো। সেদিন এ কবিতার বিজলী জীবনের তরুণ পাতায় আগুনের অলিখিত আখরে যা লিখেছিলো তা কি আজ সম্পূর্ণ মুছে গেছে? সবখানি যে মুছে যায়নি তা মনে করি এই জন্য যে, আজো তো এ কবিতা পড়ে মন নেচে ওঠে, আজো কবির সাথে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলি আর বলি:

'শহীদের দেশ! বিদায় বিদায়! এ অভাগা আজ নোয়ায় শির।

তরীকুল আলম বলে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট 'কোরবানী'কে বর্বর যুগের চিহ্ন বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তরীকুল আলম ভালো লেখাপড়া জানতেন এবং সে পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর দাবীও ছিলো, গর্বও ছিলো। অতি আধুনিকদের ভাষায় 'কোরবানী' সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখে তাতে তিনি যা বলেছিলেন, যতদূর মনে হয়, তার মর্ম এই যে: কোরবানী বর্বর যুগের হত্যারীতির চিহ্ন বই আর কিছুই নয়; আল্লাহ্ দয়াময়, তিনি এ হত্যায় খুশী হতে পারেন না। এ প্রবন্ধ পড়ে নজরুল ইসলামের কলম গর্জে উঠলো। নব্য তুর্করা তখন স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জান কোরবান করছিলো। সেই ব্যাপারের সাথে মিলিয়ে তিনি লিখলেন:

'ওরে হত্যা নয়, আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন!
দুর্বল ভীরু চুপ রহো, অহো খামখা ক্ষুব্ধ মন!!
ধ্বনি ওঠে রণি' দূর-বাণীর
আজিকার এ খুন কোরবানীর
দুম্বা-শির
রুম-বাসীর.
শহীদের শির সেরা আজি—রহমান কি রুদ্র নন?
ব্যস, চুপ খামোশ রোদন।

*

এইদিন মীনা ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে খুন ক্ষরিয়ে নে
রেখেছে আব্বা ইব্রাহীম সে আপনা রুদ্র পণ;
ছি ছি, কেঁপো না ক্ষুদ্র মন।'

এই জোরের কথা, এই যে প্রচণ্ড শক্তির ভাষায় ইসলামের অনুষ্ঠানের সমর্থন, আধুনিক বাংলা ভাষায় এ নতুন। এ কবিতাটিও

পড়তে পড়তে আমার মুখস্থ হয়ে গেছিলো। আমার 'কামাল পাশা' নাটকে তলোয়ারধারী তুর্ক বালকের মুখ দিয়ে আমি সমর-সঙ্গীতরূপে এই গান গাইয়েছি।

এলো তার পর 'খেয়াপারের তরণী'। পড়লাম:

'কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান 'লা-শরীক আল্লাহ্!'

আমি মুগ্ধ হলাম। যে পড়লো সে-ই মুগ্ধ হলো। ইসলামী শব্দকে বাংলা ভাষায় এমন চমৎকার রকমে হীরের টুকরোর মতো বসিয়ে দেওয়া যায়, এ যেন কারো ধারণাই ছিলো না।

নজরুলের লেখায় এমনিভাবে বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিয়ে তরুণ মুসলিম বাংলার মনকে মুগ্ধ করে ফেললো:

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া,
আম্মা লাল তেরী খুন কিয়া দুনিয়া।'

এ উর্দু, না বাংলা? আর এতো সুন্দর এ! তারপর চললো—

'বাজিছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য,
হুঁসিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য!'

অজ্ঞাতসারে পাঠকের কণ্ঠে উচ্চারিত হলো: মারহাবা নজরুল, মারহাবা।

'ওমর ফারুক,' 'খালেদ', কামাল পাশা,—কবিতার স্রোত বয়ে চললো। খালেদের শেষ লাইন মনে আছে; মনে থাকবে:

'খোদার হাবিব বলিয়া গেছেন: আসিবেন ঈশা ফের,
চাই না মেহেদী, তুমি এসো বীর হাতে লয়ে শমশের।'

কিন্তু কোন্‌টা ফেলে কোন্‌টার কথা বলবো? এই যে তাঁর কবিতা, তাঁর গজল, তাঁর গান, তাঁর কাব্যময় বক্তৃতা, তাঁর সাম্যবাদ, তাঁর কারাবরণ—এ সমস্তই সে-আমলের মুসলিম যুবকদের মনে করেছিলো সুস্পষ্ট রেখাপাত। আমার মনের পাতায়ও যে তার ছায়া পড়েনি কেমন করে বলবো?

'আমি চির দুরন্ত, দুর্দম'

এম আবদুর রহমান

জগতে যাঁরা বড়ো হয়েছেন, নিজের বুদ্ধি, প্রতিভা, সেবা এবং সাধনা বলে সৃষ্টি করেছেন ইতিহাসের নব নব অধ্যায়, তাঁদের অনেকেই ছোটবেলায় ছিলেন দুরন্ত এবং চঞ্চল। আবার তাঁদের কেউবা ছিলেন শান্ত, গম্ভীর, আপন-ভোলা এবং মৌনী স্বভাবের। ছোট্ট নজরুলের মধ্যে এই দোষ এবং গুণের সমাবেশ ছিলো সমানভাবে।

পীরের মাজারে, পুকুরের পাড়ে, নদী ও খাল-বিলের ধারে, বৃক্ষলতা ও ফুলের সমারোহের মাঝে, প্রকৃতির রূপসজ্জার মাঝে বালক ও কিশোর নজরুলকে যেমন ধ্যান-মৌনী শান্ত গম্ভীররূপে দেখা যেতো, খেলাধুলোয়, উৎসব অনুষ্ঠানে, মৎস্য শিকারে, আম পাড়ায়, গাছে চড়ায় এবং প্রয়োজন হলে ব্যক্তি বিশেষকে জব্দ ও জ্বালাতন করার ব্যাপারে তেমনই নজরুলের দুরন্তপনা প্রবল হয়ে উঠতো।

তাঁর ঐ সময়ের কয়েকটি দুরন্তপনার কাহিনী উল্লেখ করছি।

চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের এক নিকট সম্পর্কীয়া ভাগিনেয়ী কন্যার 'আকিকা' বা নামকরণ উৎসব হচ্ছিলো সেদিন। বাড়ীতে তাঁদের এসেছিলেন অনেক আত্মীয় কুটুম্ব মেহমান। চলেছে খানাপিনা, হাসি আনন্দ। এমন সময় নজরুল তাঁদের বাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'মাইজি গো—মাইজি, শিগ্‌গির মিঠাই-ফিরনী আনো, দেখ দেখ, কেমন বর এনেছি তোমার মেয়ের।'

নজরুলের ডাক শুনে ছুটে এলো ছেলে-মেয়েরা, এলেন ভাগিনেয়ী এবং আত্মীয়া মহিলারা দরজার কাছে। দেখে তাজ্জব বনে গেলেন তাঁরা। বদ্‌খত্ চেহারার এক পশ্চিমা আদমী সওয়ার হয়ে আছে একটা প্যাকাটে মার্কা রোগা ঘোড়ার পিঠে। ময়লা মলিন ছিন্ন

তার বেশ। সেই ঘোড়ার লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নজরুল। মুখে তাঁর প্রাণখোলা হাসি। পাগল দুখুর কাণ্ডকারখানা দেখে হাসছে মেয়েরা। ভাগিনেয়ী কিন্তু রাগ করলেন। তাঁর জামাই হবে কিনা এক বিশ্রী চেহারার রাহী মুসাফির!

আর একদিনের ঘটনা। পাড়ায় জামাই এসেছে। ভালোমানুষ, নতুন জামাই। জামাই-এর বাপের অবস্থা নাকি ভালো। নজরুল তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে ফন্দি আঁটলেন—মিঠাই খাওয়ার টাকা আদায়ের। দলের পাণ্ডা 'দুখু' দলবল নিয়ে হাজির হলেন জামাই-এর কাছে। বললেন, 'নতুন জামাই আপনি, পীরের আস্তানায় যেতে হবে, সালাম দিতে হবে, 'সিন্নি' দিতে হবে; নইলে অকল্যাণ হবে আপনার।'

পীরের দরগায় 'সিন্নি' দেবার নাম করে প্রথমেই কয়েক সের মিষ্টির দাম আদায় করে নিলেন নজরুল। তারপর তাঁকে নিয়ে গেলেন—পীর হাজি পাহ্‌লোয়ানের আস্তানায়। সেখানে সালাম করিয়ে নিয়ে জামাইকে সঙ্গে করে চললেন সবাই 'দরমা পীরের দরগায়'।

একটা পড়ো বাড়ী। সে বাড়ীতে ছিলো একটা আধ-ভাঙা 'দরমা' অর্থাৎ কিনা হাঁস-মুরগী রাখার ছোটো ঘর। আকার-আয়তনে বড়ো টবের বাক্সের মতো। সেটিকে আগেভাগে ঢেকে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন নজরুলের সঙ্গীরা। সেখানে নিয়ে নজরুল জামাইকে বললেন, 'সালাম করুন'। জামাই সালাম করলেন এবং নির্দেশ মতো সালামী নজরানা বাবদ দিলেন কিছু নগদ তঙ্কা। তারপর মিছিল করে জামাইকে নিয়ে গেলেন তাঁরা তাঁর শ্বশুরবাড়ীতে। বাড়ীর বাইরে থেকে ডাকলেন নজরুল জামাই-এর শাশুড়ীকে। শাশুড়ীর বুঝতে দেরী হলো না যে, তাঁর ভালোমানুষ জামাই পড়েছে পাড়ার দস্যিদলের পাল্লায়। এগিয়ে এলেন তিনি। নজরুল বললেন—

'মাসী গো মাসী
তোমার জামাই-এর দেখ হাসি
দরমা-পীরে সালাম দেওয়ালাম
খাওয়াও মোদের খাসী।'

দুষ্টু ছেলেদের কাণ্ড দেখে শাশুড়ী রাগে তেতে উঠলেন। নতুন বউ হলো বেজার, কিন্তু শালা-সম্বন্ধীর দল হলো খুশী। ছেলের দল হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে। নজরুল ততক্ষণে কেটে পড়েছেন দল থেকে।

গ্রীষ্মকাল। দু'চারটে করে আম পাকতে শুরু হয়েছে। এমন দিনের একটি ঘটনা। চুরুলিয়া থেকে বীরভূমের শিকারপুরে কুটুম্ব-বাড়ী যাচ্ছেন নজরুল। গরুর গাড়ীতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়ীতে ছিলেন নজরুলের এক আত্মীয় এবং কয়েকজনা নিকট-আত্মীয়া মহিলা আর গাড়ীর গাড়োয়ান।

পথের ধারে মস্তবড়ো একটা পুকুর, কাকের চোখের মতো কালো জল তার টলটল করছে। পাড়ে তার আমবাগান। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে গাড়ী রওয়ানা করিয়ে দিয়ে নজরুল চুপটি করে বসে থাকলেন পুকুর ঘাটের কাছে। সঙ্গীদের বললেন, 'তোমরা গাড়ী নিয়ে রওনা হও, আমি একটু পরে দুটো আম নিয়ে যাচ্ছি।'

গাড়ী বেশ কিছুদূর চলে গেছে। বাগানে আম আগলাচ্ছিলো তখন একটি ত্রিশ-বত্রিশ বছরের মেয়ে আর তার এক ছোট্ট ছেলে। মেয়েটির স্বামী গেছে বাগানের মালিকদের আম দিতে, আর আপন বাড়ীতে ভাত খেতে। কথায় কথায় নজরুল সে খবর মেয়েটির কাছে জেনে নিয়েছেন আর জেনে নিয়েছেন বাগানটি গাঁয়ের বড়োমিয়াদের। খানিক চুপচাপ থেকে সেই মেয়েটিকে সম্বোধন করে বললেন, 'হ্যাঁগো মাসী, তোমরা বড়োমিয়াদের বাগানে আম আগলাও

আর আমাকে চিনতে পারলে না! আমি যে বড়োমিয়াদের ছোটো জামাই-এর ভাই।'

মেয়েটি খানিকটা হকচকিয়ে গেলো। বললো, 'না বাবা, চিনতে পারিনি তো। তা আপনি কবে এলেন?'

'এসেছিলাম আজই গো মাসী, চলে যাচ্ছি, আর এক কুটুম্ব-গাঁ, জরুরী কাজ আছে কিনা, কাল আবার ফিরে আসবো তোমাদের গাঁয়ে। স্বমুদমা (ভাইয়ের বা বোনের শাশুড়ী) বললেন—বাগান দিয়ে যাও দুটো আম নিয়ে, তাই এলাম। তা মাসী, কোন্ গাছটার আম মিষ্টি বলতো?'

মাসী দেখিয়ে দিতে-না-দিতে টপ করে গাছে উঠে পড়লেন নজরুল। তারপর বেশ কতকগুলো পাকা আম পেড়ে নিয়ে গামছায় বেঁধে বললেন, 'মাসী চললাম, কাল আবার আসবো।'

নজরুল আম নিয়ে দ্রুতপদে সরে পড়লেন। গাড়ী ধরতে বেশ খানিক সময় লাগলো। যখন গাড়ীতে পৌঁছলেন তখন গাড়ীর সবাই অতোগুলো আম দেখে অবাক। 'হ্যাঁরে, কি করে যোগাড় করলি এতো আম?'

'মাসী পাতিয়ে আর মিয়াদের জামাই-এর ভাই সেজে'—হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন নজরুল।

নজরুলের কিশোর জীবনের এই শ্রেণীর বহু রসালো কাহিনী আছে।...নজরুল ইসলামের দুরন্তপনার কাহিনীর মধ্যে রস-রঙ্গ আছে, আছে উপস্থিত জ্ঞান ও দুষ্টু-বুদ্ধির পরিচয়, আছে ঠাট্টা আর তামাশার ব্যঞ্জনা। আর আছে সতত সঞ্চরমান এবং সজীব প্রাণের বহিঃপ্রকাশ। তাতে আর যাই থাক, হৃদয়হীনতার ছবি নেই, ক্রূর আচরণের অভিযোগ নেই।

'দারিদ্র' কবিতাটি লেখার মাস চারেক পরে ১৯২৭-এর এপ্রিলে নজরুলের প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম হয়। কৃষ্ণনগরে এর পর আর বেশিদিন তিনি থাকেন নি। বোধ করি সাংসারিক প্রয়োজনের চাপে পড়ে তাঁকে কলকাতায় চলে আসতে হয়েছিল। আগে থেকে কিছু ঠিক ছিল না, তাই প্রথমে সপরিবার নলিনীকান্ত সরকারের বাসাতেই তিনি উঠেছিলেন। এর পর কিছুদিন এখানে-ওখানে থেকে শেষে তাঁর 'ধূমকেতু'র একদা ম্যানেজার এবং মূলতঃ কবির অনুরাগী শান্তিপদ সিংহের চেষ্টায় নজরুল পানবাগান লেনে বাসা করলেন। এই বাড়িতে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র 'সানি' অর্থাৎ সব্যসাচীর জন্ম হয়।

পানবাগানের বাড়িতে আসার পর সুরলোকে নজরুলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল—তাঁর দেওয়া সুরের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকল। গানের মজলিসে, সভা-সমিতির অনুষ্ঠানে অনেকেই নজরুলের রচিত গান এবং তাঁরই সুর-বন্দেজে গাইছেন—অথচ গ্রামোফোন কোম্পানীর তরফ থেকে নজরুলের কোনো গান রেকর্ড করার অনুরোধ পর্যন্ত আসে না। শোনা যায়, বিভিন্ন মহলে এই নিয়ে প্রশ্নের গুঞ্জনে বৃটিশ গ্রামোফোন কোম্পানীর টনক নড়ল। যেহেতু নজরুল রাজনীতি করতেন সেই হেতুই ইংরেজ রেকর্ড কোম্পানী নজরুলকে এতদিন এড়িয়ে চলতেন। যাই হোক, বেনিয়া বুদ্ধির তাড়নায় গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলকে চিঠি দেবার জন্য ঠিকানা যোগাড় করতে গিয়ে টের পেলেন যে তাঁদের অজ্ঞাতসারেই নজরুলের গান রেকর্ড হয়ে বসে আছে। রচয়িতার নাম গোপন করে শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নজরুলের লেখা দুটি কবিতার কিছু কিছু অংশ বেছে নিয়ে সুর দিয়ে রেকর্ড করেছেন। এর পর কোম্পানী ধাক্কা সামলে উঠে গান রচয়িতার

প্রাপ্য রয়্যালটির টাকা পাঠিয়ে ভদ্রতা দেখালেন। এই ভাবেই গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে কবির প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাঁর রচিত গান রেকর্ড করার জন্য কোম্পানী অনুমতি চাইল। তারপর থেকে তাঁর লেখা, সুর-দেওয়া এবং স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের অজস্র রেকর্ড গ্রামোফোন কোম্পানীর আদরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

ছোটবেলা থেকেই নজরুলের ঝোঁক ছিল গানের দিকে। শিয়ারসোলের স্কুলের শিক্ষক সতীশ কাঞ্জিলাল মশাই ছাত্রের এই দিকে প্রবণতা লক্ষ্য ক'রে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তালিমও দিতেন। কাঞ্জিলাল মশাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করতেন। নজরুল যখন পল্টনে ছিলেন তখন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম পেয়েছিলেন সহকর্মীদের কাছে। আর গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে নিয়মিত তালিম নিতে থাকেন। এক কথায় বলা যায় নজরুল সুরের সাগরে গা ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর রচিত গানের সংখ্যা তিন হাজারের চেয়ে কিছু বেশিই হবে। জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেবের মৃত্যুর পর কবিকে তাঁর শূন্য আসনে গ্রামোফোন কোম্পানী সাদরে বসিয়েছিলেন—পদটি ছিল 'ট্রেনার' ও 'হেড কম্পোজার'।

১৯৩০-এ নজরুল পুত্রশোক পেলেন, বৈশাখ মাসে তাঁর নয়নমণি বুলবুলের মৃত্যু হ'ল। ওইটুকু বয়সেই সে জমীরুদ্দীন খাঁ সাহেব এবং নজরুলের সঙ্গীত চর্চার মধ্যে থেকে নির্ভুল সুরে গান গাইতে শিখে ফেলেছিল। তার অকালমৃত্যু পরিবারের উপর গভীর বিষাদের ছায়া ফেলল। নজরুলের আধ্যাত্মিক দিকে ঝুঁকে পড়ার কারণই সম্ভবতঃ বুলবুলের মৃত্যু। এর আগে শোক থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তিনি হাসির গান লিখতে গিয়ে একা একা বসে কেঁদেছেন, এও তাঁর বন্ধুদের কেউ কেউ দেখেছেন। আধ্যাত্মিক দিকে পা ফেলার কারণই ছিল, বুলবুলকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়া। সেই আশায় তিনি লালগোলা স্কুলের হেড্‌মাস্টার বরদাচরণ মজুমদারের

কাছে যান নলিনীকান্ত সরকার মশাইকে সঙ্গে নিয়ে। সিদ্ধযোগী বলে মজুমদার মশাই-এর খ্যাতি ছিল—তবে তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি গৃহী যোগী। শোনা যায় যে বরদাচরণ নজরুলের এই কামনা চরিতার্থ করেছিলেন—নজরুলের চোখের সামনে বুলবুল এসে দাঁড়িয়েছিল। এর পর স্বভাবতঃই নজরুল মজুমদার মশাই-এর সঙ্গে হামেশা দেখা করতে লাগলেন। মজুমদার মশাই শ্মশানে গিয়ে কালী-সাধনা করতেন। তবে তিনি আত্মপ্রচার-বিমুখ ছিলেন এবং সাধনক্ষেত্রে অন্য কাউকে টানা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। বরং তিনি অনধিকারীকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সম্পর্কে আমি তাঁর ভাগিনেয়। কবি অধ্যাত্ম-সাধনমার্গে কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, তা বলার অধিকার আমার নেই, তবে এই পথে জোর করে পা দিতে গিয়ে বরদাচরণের মাসতুতো ভাই [নিবন্ধকারের আপন মামা] হরেন সান্যাল মশাই-এর সাময়িক মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটেছিল, এটা আমি ছেলেবেলায় দেখেছি। হরেন মামা বরদাচরণের নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে অমাবস্যার রাতের অন্ধকারে গোপনে দাদার পিছু পিছু শ্মশান অবধি গিয়েছিলেন—তারপর কী ঘটেছিল তা কেউ জানে না, তবে তিনি দু-হাত চোখের সামনে তুলে "রক্ত—রক্ত—রক্ত" আর্ত চিৎকারে সকলকে উচ্চকিত ক'রে বাড়ি ফিরেছিলেন। সে যা-ই হোক, নজরুল যে অধ্যাত্মশক্তি সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়েছিলেন এবং এর প্রভাব তাঁর বাস্তব জীবনকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করেছিল এটুকু নির্ণয় করা যাচ্ছে।

১৯৪২-এর জুলাই মাসে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রামে অনুষ্ঠান করতে গিয়ে কবি টের পেলেন তাঁর জিহ্বা কাজ করছে না—কথা বলতে গিয়ে গলা আটকে আসছে। তার আগে থেকেই তিনি নিজের অসুস্থতা বুঝতে পেরেছিলেন, তবে তেমন গ্রাহ্য করেননি। রেডিওর প্রোগ্রাম করা সম্ভব হ'ল না, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ঘোষণা

করলেন,—কবি অসুস্থ। এর পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে বাড়ি নিয়ে এলেন। এই সময়ে কবি দৈনিক 'নবযুগ'-এর সম্পাদক ছিলেন। লুম্বিনী পার্কের হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসার পর মধুপুরে বায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্রামের জন্য পাঠানো হ'ল।

অন্যের কাছে প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নজরুলের অসুখটা দেহে আত্মবিস্তার লাভ ক'রেছিল। কাজেই যখন তাঁর চিকিৎসা শুরু হ'ল তখন তা উপশমের বাইরে চলে গেছে। অন্যান্য দেশে কী হয় তা আমার জানা নেই, তবে আমাদের এদেশে শিল্পী, সাহিত্যিক শ্রেণীর মানুষদের ভাগ্যে যশ-খ্যাতি যতোই জুটুক, আর্থিক ক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই-এরও বেশি জন তাঁরা উপেক্ষিত রয়ে যান—এটা অস্বীকার করা চলে না। নজরুলও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁর প্রথম বই 'ব্যথার দান' মাত্র দুশো (?) টাকায় স্বত্ব বিক্রয় করতে হয়েছিল। হয়ত তখনকার দিনে দুশো অনেক টাকা। 'কপিরাইট' না বেচলে হয়ত তখন তাঁর অতি-বড় বন্ধুও গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য হাতে নিতেন না। তাঁর দ্বিতীয় কপিরাইট বিক্রিটা ঘটে ওই একই বছরে অর্থাৎ ১৯২১-এ—এবার 'রিক্তের বেদন' এবং আরও দুটি বই মাত্র চার-শ' টাকায় স্বত্ব বিক্রি করলেন তিনি। 'অগ্নি-বীণা' এবং 'যুগবাণী' প্রথম দিকে কপিরাইট বিক্রি করা হয় নি। যাঁরা নজরুলের লেখার অনুরাগী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রন্থ প্রকাশকের সমস্ত ব্যয় বহন করলেও, সরকারী ঝামেলার ভয়ে প্রকাশক হিসেবে নিজের নাম ছাপাতে রাজী হন নি—আর্য পাবলিশিং হাউস থেকে যুগবাণী এবং অগ্নিবীণা প্রকাশক হিসেবে নজরুলের নামাঙ্কিত হয়েই বেরিয়েছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য 'অগ্নিবীণা'র কপিরাইট কেনেন ডি-এম লাইব্রেরী। ডি-এম লাইব্রেরী নজরুলের অধিকাংশ বই-ই প্রকাশ করেছেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তির আগে নজরুল-পরিবারের জীবনযাত্রা প্রধানতঃ তাঁর লেখার রয়্যালটির উপরেই নির্ভরশীল ছিল। তাঁর 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' সরকার থেকে

বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত বইগুলি অনেকে গোপনে কিনতেন এবং সেই বিক্রির টাকা নজরুল পরিবারের আর্থিক দুর্দিনে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। কেন না, কোনো চাকরিতেই তিনি স্থিরভাবে বেশিদিন টিকে থাকতে পারতেন না।

অনেকের ধারণা, নজরুলের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু ব্যয়ে হাতখানা তাঁর এমনই দরাজ যে, টাকা যেমন এসেছে তেমনি হাওয়ার আগে উড়ে গিয়েছে। এর খানিকটা অস্বীকার করা চলে না—বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে অথবা তাঁদের নিয়ে বেড়ানোর পিছনে তাঁর কম খরচ হয় নি। হিসেব ক'রে চললে হয়ত স্ত্রী প্রমীলার অসুখের সময়ে 'এইচ-এম-ভি'র সমস্ত গানের রয়্যাল্‌টি বন্ধক রেখে তাঁকে চার হাজার টাকা ধারও করতে হত না। এমনি আরও অনেক অসুবিধের হাত থেকে নজরুল এবং তাঁর পরিবার নিষ্কৃতি পেতেন হয়ত—কিন্তু তাতে ক'রে নজরুল হয়তো কবি নজরুল হতে পারতেন না, কাজীই রয়ে যেতেন হয়ত। নজরুল—নজরুলই।

তবে আক্ষেপ এই যে, নজরুলের মতো শক্তিধর প্রতিভার লেখনী হঠাৎ স্তব্ধ হ'ল, তারও আগে কণ্ঠ! বহুদিন হ'ল তাঁর মস্তিষ্ক কোনো কাজ করে না। ভারত ও পাকিস্তান সরকার কবিকে রোগমুক্ত করার আশায় দেশ-বিদেশে সম্ভাব্য সকল প্রকার চিকিৎসার সুযোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কবি-জায়া ১৯৩৯-এর অসুখে শয্যাগ্রহণ করেন—তারপর থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। কবির দুই পুত্র কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ আবৃত্তি এবং বাদ্যযন্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

নজরুলের কবিতা, তাঁর গান আজও বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন হিসেবে সমাদৃত। দিন যত যাচ্ছে তার আদর ততই বাড়ছে। এই একটি ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী বিরোধ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে নি—এ কী কম কথা! কবি নিজে যে স্বপ্নকে জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর সৃষ্টিও সেই হিন্দু ও মুসলীমের বিরোধকে অগ্রাহ্য ক'রে আপন দীপ্তিতে ভাস্বর।

আমার জীবনে নজরুল — বেগম সুফিয়া কামাল

আমার জীবনে 'অগ্নিবীণা'র বিদ্রোহী কবি নজরুল এসেছিলেন অনাবিল আনন্দ-আলোকের মতো, তাঁর মমতা-মধুর স্নেহোজ্জ্বল দৃষ্টি আমার দিকে পড়েছিলো বলে আমি আজ সকলের কাছে পরিচিতা হতে পেরেছি ; নয়তো সেই পরদানশীন খান্দানী ঘরের অন্তরাল হতে বাইরে আসার পথ আমি বুঝি পেতাম না।

ঢাকা থেকে তখন 'অভিযান' নামে একটি পত্রিকা বের হতো। আমার ছোটোমামা নওয়াবজাদা সৈয়দ ফজলে রব্বি সাহেব তখন ঢাকায় পড়তেন। তিনি জানতেন আমার বাল্যের লেখা-লেখা খেলার কথা। ছুটিতে বাড়ী গিয়ে আমার লেখা থেকে তিনি দু'তিনটি কবিতা নিয়ে আসেন। সে কবিতাগুলি 'অভিযানে' প্রকাশিত হয়। তখন নজরুল ঢাকায় মুকুটহীন সম্রাট, ছাত্রমহলে তিনি প্রিয় হতে প্রিয়তম। আমার লেখা তাঁর চোখে পড়ে। হঠাৎ বরিশালে বসে আমি অচেনা হাতের লেখা একখানা চিঠি পাই। লেখকের নাম দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। নজরুল ইসলাম। তারপর চিঠিতে আলাপ হয়ে গেলো। কবি হলেন আমার দাদু-ভাই। দাদুকে লিখে দিলাম কলকাতা যাচ্ছি। তিনি লিখলেন, এবারে নিশ্চয় দেখা হবে। হয়েও ছিলো। মাসিক পত্রিকায় তখন প্রথম প্রথম আমার লেখা বের হতে শুরু হয়েছে। দাদু এসেছেন এক পত্রিকা অফিসে, শুনে লোক পাঠালাম ; আমার চিঠি পেয়েই তিনি চলে এলেন। আমরা তখন সারেং লেন-এ থাকি। তখনও পর্দার বাঁধন যায়নি, একটু শিথিল হয়েছে মাত্র। আমি গিয়ে তাঁর কদমবুসী করলাম। কী আনন্দে যে তিনি আমাকে দেখে চীৎকার করে উঠলেন ; বললেন, 'তোমাকে আগে দেখিনি—তুমি এতটুকু। তোমাকে আমি জুকব্।' ঘরশুদ্ধ

সবাই হেসে উঠলেন, দাদু অনর্গল আমাকে বলে চলেছেন, 'এত কেন, বেগম সাহেবা—আরে মিসেস-টিসেস হয়েছো, একটু ওজনে তো ভারী হবে, আগে জানলে একটা দোলনা আনতাম।' আমি প্রথম এই একেবারে বাইরের লোকের সামনে এসেছি যদিও, তবুও তাঁকে পর বলে মনে হলো না, কোনো কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ করতে পারলাম না। তিনি কাছে বসিয়ে মাথায় হাত দিয়ে আদর ও দোয়া করলেন। আমি ধন্যা হলাম।

এরপরে তিনি প্রায়ই আসতে লাগলেন। একদিন—তখন শীতের দিন, আমি ও আমার বড়ো ভাই সন্ধ্যার আগে বসে দাবা খেলছি। দড়াম করে দরজা খুলে একটা কম্বল গায়ে দাদু এসে পড়লেন। দেখলেন, আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। ভাইয়াকে বললেন, 'দাবা খেলছিলে সুফিয়ার সাথে? ও জানে দাবা খেলা?' ভাইয়া ও আমি বললুম, 'এই একটু একটু।' দাদু যেন একটু অবাক হয়েই বললেন, 'মেয়েরা দাবা খেলে! আমি তো দেখিনি। আমি খেলবো তোমার সাথে—নিয়ে এসো পান।' দাদু দাবা খেলবেন আমার সাথে—শুনেই তো আমার বুক শুকিয়ে গেছিলো—পান আনতে গিয়ে পালিয়ে বাঁচলাম। পান দিয়ে, চায়ের যোগাড় করে এসে দেখি, দাদু ও ভাইয়া দাবা পাত্ছেন। ভাইয়া খুব ভালো খেলতে পারেন। দাদু বললেন, 'তুমি ভাবছো তোমাকে ছেড়ে দেবো? এক বাজী খেলে নিই, ততক্ষণ তোমার নমাজ সেরে এসো, খেলতেই হবে।' কিন্তু মগরেব গেলো, এশা গেলো; পেয়ালার পর পেয়ালা চা, বাটার পর বাটা পান যুগিয়ে চললাম—বাজী আর শেষ হয় না।

রাত ১২টা বেজে গেলো; অতো রাত্রে কে আর ভাত খায়! রুটি, গরম পরোটা তৈরী করে ভাইয়া ও দাদুকে মুখে তুলে খাইয়ে দিলাম; কিন্তু তাঁরা পরোটা-গোশত খেলেন, না কাগজ খেলেন, বোঝা গেলো না। সারা রাত কেটে গেলো। পরদিন সকাল ৭ টার সময় দেখি দাবার ছক উল্টে দিচ্ছেন আর হো হো করে হেসে ভাইয়ার হাত ধরে

ঝাঁকুনি দিয়ে দাদু বলছেন, 'নাঃ, খেলে সুখ পাওয়া গেলো, জিত্‌তেও পারলাম না, হারলামও না, ড্র হয়ে গেলো—সত্যিই খেলতে জানো; আমাকে আর এতক্ষণ কেউ বসাতে পারেনি এক কাজী মোতাহার হোসেন ছাড়া।'—বলে আমার কৃশাঙ্গ ভাইয়ার হাতে যে ঝাঁকি দিলেন সেই আনন্দিত ঝাঁকুনির ব্যথা বেশ কয়েকদিন ছিলো।

দুপুর বেলায় খেতে খেতে দাদু বললেন, 'সুফ্, তোমার রান্নার তারিফ করবো, না কবিতার তারিফ করবো?'

আমি বললাম, 'দুটোরই।'

দাদু বললেন, 'তা না করলে তো মিথ্যে বলে কাজীর বিচারের দুর্নাম হবে।'—বলেই বললেন, 'রাত্রে তুমি আমাদেরকে খাইয়ে দিয়েছিলে, না?'

আমি বললাম, 'তা কি তোমার মনে আছে?'

বললেন, 'মনে পড়েছে। তোমার মতো বোন যার নেই, সে সত্যিই দুর্ভাগা।'

আমাদের কাছে রোজ আসাটা পুলিশের চোখে পড়লো। তাঁরা দাদুর পিছু নিলেন। একদিন দাদু বসে আছেন—এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। আমাদের কাছে আসেন কবি, তাঁকে দেখতে পাড়ার অনেক লোকই আস্‌তো। দাদু তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, 'তুমি টিকটিকি, জানি ঠিক ঠিকই'—আরো একটা লাইন কী বলেছিলেন আজ আমার মনে নেই। লোকটি মুখ লাল করে উঠে চলে যেতেই আমি এসে বললাম, 'কী করে তুমি চিনলে দাদু?'

হেসে দাদু বললেন, 'গায়ের গন্ধে। বড়ো কুটুম্ব যে।' তাঁর এমনি হাজারো পরিহাসের খুঁটিনাটি আজও মনে পড়ে। হাসিতে খুশীতে আনন্দে উজ্জ্বল জীবন আজ কী হয়ে আছে, ভাবলে মন ব্যথায় ভরে ওঠে।

ছোটো-গল্পে নজরুল

মিহির সেন

কবি নজরুল ইসলাম জনসমাজে আজ এক বাঁধ-ভাঙা বেপরোয়া বিদ্রোহী যৌবনের প্রতীক। তাঁর বিদ্রোহাত্মক কবিতাই এই ভাব-রূপের নির্মাতা। কিন্তু তাঁর কবিতায় আচ্ছন্ন অনেক পাঠকই হয়তো অবহিত নন যে, সাহিত্যে নজরুলের প্রথম আত্মপ্রকাশ ছোটো-গল্পের মাধ্যমেই। প্রায় একই সময়ে কাব্য-চর্চায় হাত দিলেও কবি হিসাবে আত্মপ্রকাশে বেশ কিছুদিন কুণ্ঠিত ছিলেন তিনি, এবং পাঠকদের কাছেও গাল্পিক হিসাবেই তিনি সমধিক খ্যাত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কবি নিজেও বলেছেন—'আমার সুন্দর প্রথম এলেন ছোটো-গল্প হয়ে, তারপর এলেন কবিতা হয়ে।'

নজরুলের প্রথম গল্প 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'। গল্পটি করাচী সৈন্য শিবির থেকে প্রেরিত, এবং ১৩২৬-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছাপার হরফে প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম রচনা। ঐ বছরই বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'হেনা' ও 'ব্যথার দান', এবং এখান থেকেই তাঁর গল্পের যাত্রা শুরু।

অবশ্য অজস্র ধারায় রচিত কবিতা ও গানের তুলনায় তাঁর গল্পের সংখ্যা খুবই নগণ্য। মোট আঠারোটি। তাঁর কবিখ্যাতি তাঁকে গল্পে শেষ পর্যন্ত স্থিত থাকতে দেয় নি, এবং এ-কথাও স্বীকার্য, কবি ও গীতিকার হিসাবে তাঁর যে স্ফুরণ ও সিদ্ধি, গল্প-উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত। হতে পারে চর্চার অভাবে; অথবা তাঁর শিল্প-প্রতিভা হয়তো সার্থক আধার হিসাবে কাব্য ও গীতেরই আশ্রয় খুঁজছিলো, তবু একজন অনস্বীকার্য সাহিত্য প্রতিভার স্বাক্ষর হিসাবে তাঁর সৃষ্টির প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথক বিচার ও বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

নজরুলের ছোটো-গল্প বিচারের প্রারম্ভেই একথা স্বীকার করে

নেওয়া ভালো যে, বাংলা ছোটো-গল্পের ক্ষেত্রে তিনি কোনো স্থায়ী অবদান রেখে যেতে পারেন নি। বিশেষ করে তাঁর পূর্বেই ছোটো-গল্পের আঙিনায় রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শক্তিশালী গল্প-লেখকেরা এসে যাওয়ার পাথকৃৎ-এর প্রাপ্য সহানুভূতিও সমালোচকের কাছে প্রত্যাশিত নয়।

কিন্তু নজরুলের গল্প বিচারের নিরিখ ভিন্ন। সাহিত্যের এক শাখায় কৃতী শিল্পীর, অন্য শাখার পরিপূরক রচনা হিসাবে তার পৃথক মূল্যায়ন। শিল্পীর সামগ্রিকতা ও সৃষ্টির পরম্পরা বিচারই যার লক্ষ্য।

আঙ্গিক ও চরিত্র বিচারে নজরুলের গল্পকে দুই পর্বে ভাগ করা যায়। 'রিক্তের রোদন' ও 'ব্যথার দান' গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলি প্রথম পর্ব-ভুক্ত। দ্বিতীয় পর্ব—তুলনামূলকভাবে পরিণত বয়সে রচিত 'শিউলি-মালা' গ্রন্থভুক্ত গল্প ক'টি।

নির্মোহ বিচারে নজরুলের প্রথম পর্বের অনেক গল্পেই ছোটো-গল্পের প্রত্যাশিত ধর্ম রক্ষিত হয়েছে বলা যায় না। সার্থক ছোটো-গল্পের জন্য যে পরিধি, পরিমিতি বোধ, সংযম, ভাব ঐক্য ও গভীর ব্যঞ্জনা প্রয়োজন, তা অনেক গল্পেই অনুপস্থিত, তা ছাড়াও লেখক বহু গল্পেই নির্মোহ জীবন-দ্রষ্টার ভূমিকায় থাকতে পারেন নি ; ভবঘুরে, বন্ধনহীন, ভাবপ্রবণ ব্যক্তি-নজরুলের আত্মক্ষেপণ ঘটেছে সে-সব ক্ষেত্রে। এমন কি হাবিলদার নজরুলের ছায়াও বহুক্ষেত্রে অস্পষ্ট নয়।

এ পর্বের গল্পগুলির বৈচিত্র্য কম। গল্পগুলি একই ভাবধারার বিচ্ছিন্ন ক'টি স্রোত যেন। প্রতিটি গল্পের ভিতর দিয়ে একই উদাস ব্যথিত বিরহীর মূর্ত হাহাকার প্রবাহিত। অথচ বহু ক্ষেত্রেই এ বিরহ বা বিচ্ছেদ যে ঘটনার পরম্পরায় অপরিহার্য ছিলো, তা নয়। কিছু ক্ষেত্রে তা বন্ধন-ভীরু নায়কের স্বেচ্ছাকৃত মনে হয়। অথবা হয়তো, জীবন ও প্রেম প্রসঙ্গে, পাপ-পুণ্য, প্রেয় ও শ্রেয়র প্রশ্নে বিধ্বস্ত দিশাহারা ভাবপ্রবণ নায়কের ক্ষেত্রে এও এক অমোঘ ভবিতব্য।

বিশেষ করে 'অতৃপ্ত কামনা', 'ঘুমের ঘোরে', 'ব্যথার দান' প্রভৃতি গল্প প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য।

নজরুলের প্রথম দিকের প্রায় প্রতিটি গল্পেই যুদ্ধের উল্লেখ থাকলেও গল্পগুলি আদৌ যুদ্ধ বিষয়ক নয়। বরং বলা যেতে পারে, যুদ্ধক্ষেত্র এ-সব গল্পে প্রেমাহত পলায়নপর বিবাগী নায়কদের নিভৃত আশ্রয়।

লেখক নিজেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং তিন বছর করাচীর সৈন্য শিবিরে ছিলেন, এবং সেখানেই তাঁর সাহিত্যচর্চা শুরু। সুতরাং তাঁর তরুণ ভাবপ্রবণ মনে যুদ্ধ যে গভীর রেখাপাত করবে, এবং গল্পে তা প্রতিফলিত হবে, সে তো স্বাভাবিক।

কিন্তু বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবেই বোধ হয় যুদ্ধের ভয়াবহতা, নৃশংসতা বা অমানুষিকতা তাঁর গল্পে আসে নি। যেমন এসেছিলো এরিখ মারিয়া রেমার্ক প্রমুখ ইউরোপীয় সৈনিক-লেখকদের সাহিত্যে।

বরং নজরুলের গল্পে মহাযুদ্ধ যেন কিছুটা ধর্ম-যুদ্ধের গৌরব নিয়ে উপস্থিত। 'ব্যথার দান'-এর অনুতপ্ত খল-নায়ক সয়ফুল-মুল্‌কের জবানীতে যা আংশিক প্রতিফলিত—'আমায় আদর করে এদের দলে নিয়ে এরা বুঝিয়ে দিলে যে কতো মহাপ্রাণতা আর পবিত্র নিঃস্বার্থপরতা প্রণোদিত হয়ে তারা উৎপীড়িত বিশ্ববাসীর পক্ষ নিয়ে অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আমিও সেই মহান্ ব্যক্তি-সঙ্ঘের একজন।'

অবশ্য লেখকের এই দৃষ্টিভঙ্গী, প্রথম মহাযুদ্ধ প্রসঙ্গে তৎকালীন জাতীয় নেতাদের সাহচর্যমূলক নীতি স্মরণে রাখলে, খুবই স্বাভাবিক এবং যৌক্তিক বলেই মেনে নিতে হয়।

কিন্তু যতই ত্রুটি থাক, এ গল্পগুলির অনস্বীকার্য আকর্ষণ—কাব্যময়তা, অনাবিল আবেগ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা, যা সহজেই

পাঠককে অভিভূত করে। বিশেষ করে ভাষা বহু ক্ষেত্রেই যেন গদ্য-শরীরে নিটোল কবিতা। অথচ প্রয়োজন বোধে এরই ভিতর তিনি অবলীলাক্রমে এবড়ো-খেবড়ো দিক, হাজার ফ্যাচাং, খামখা ধুমসুনী, মার-হাট্টা হাত, ডুকরে ডুকরে কাঁদা, বোকা ভ্যাবাকান্ত ইত্যাকার আটপৌরে ঘর-চলতি শব্দও ব্যবহার করেছেন।

চেহারা ও চরিত্র বিচারে নজরুলের দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি সম্পূর্ণ পৃথক, এবং নিঃসন্দেহে এগুলিকে সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প বলা যেতে পারে। বিশেষ করে 'পদ্ম-গোখরো', 'জিনের বাদশা,' 'অগ্নিগিরি', 'শিউলি-মালা' প্রসঙ্গে এ-কথা প্রযোজ্য। উচ্ছ্বাস এখানে অনেক সংযত, ভাষা ঋজু, গল্পের গাঁথুনিও অনেক দৃঢ়।

'পদ্ম-গোখরো'য় রুদ্ধশ্বাস রহস্যময়তা ও অতি-প্রাকৃত পরিবেশ রচনায়, এবং 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি'র নায়ক হিসাবে আল্লারাখা ও সবুর আখন্দের চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখের দাবী রাখে। লেখক যে ব্যঙ্গকৌতুকেও কতো সচ্ছন্দ ছিলেন তারও স্বাক্ষর বহন করছে 'জিনের বাদশা' ও 'অগ্নিগিরি' এবং লিরিক-ধর্মী প্রেমের গল্প রচনায় তাঁর পারদর্শিতার প্রমাণ 'শিউলি-মালা' গল্পটি।

অন্তত এই দ্বিতীয় পর্যায়ের গল্পগুলি পড়ে অপূর্ণ প্রত্যাশায় মাঝে মাঝে মনে হয়, উপযুক্ত চর্চায় নজরুল হয়তো একদিন বাংলা সাহিত্যের একজন কৃতী গাল্পিকও হতে পারতেন!

সে একটা নাটকই বলতে হবে!

নজরুলকে সুরেশবাবু বললেন, 'গাড়ীতে ওঠো।'

কবি নিঃশব্দে গাড়ীতে বসলেন।

সুরেশবাবু ড্রাইভারকে ইঙ্গিত করতেই পূর্ব-নির্দেশমতো গন্তব্য-স্থানে গাড়ী চললো।

কবি বুঝতেই পারলেন না যে, তাঁকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আকাশবাণীর কম্পাউণ্ডে গাড়ী রেখে কবিকে নিয়ে সুরেশবাবু উঠে এলেন তাঁর চেম্বারে। কবি তখন বললেন, 'এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে?'

কতকটা প্রত্যয় নির্ভর করে কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সঙ্গীত পরিচালক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী বললেন, 'এটা অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং এবার থেকে তোমায় রেডিওর জন্যে গান লিখতে হবে।'

কবি কথাটা শুনেই গম্ভীর হয়ে গেলেন। তাঁকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে আনার জন্য সুরেশবাবু পূর্ব-পরিকল্পনা মতন যে এই কাজ করেছেন তা তাঁর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। অবশ্য শুধু নজরুলই যে রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অনিচ্ছুক ছিলেন তা নয়। সে যুগে মর্যাদাসম্পন্ন যে কোনো সাহিত্যিক রেডিওতে আসা অপছন্দ করতেন। রেডিওর প্রসঙ্গ উঠলেই নজরুল বহুবার বলেছেন: 'আগে কবি-রাজাকে এনে 'টক' প্রচার করো তবে আমি যাবো।' শেষের দিকে কবিগুরু কালিম্পং থেকে বেতারে কথিকতা প্রচার করেছিলেন।

উক্ত ঘটনা ১৯৩৮ সালের। কবির সঙ্গে সুরেশবাবুর যোগাযোগ অবশ্য এর বহু পূর্বের। বিদ্রোহী কবিতা পড়ে সুরেশবাবু মুগ্ধ

হয়েছিলেন। একদিন নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে এসে সুরেশবাবু কবির সঙ্গে আলাপ করে যান। তারপর বহুবার বহু আলাপ হয়েছে। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ আলাপ অক্ষুণ্ণ ছিলো। এই সময়ে সুরেশবাবু আইন পাশ করে ওকালতির জন্য মৈমনসিংহে চলে যান। কিন্তু আইন-ব্যবসা জমে উঠলেও সঙ্গীতের আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসেছিলো, ফলে তিনি বেতারে সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং সেই বছরেই Music Director-এর পদে উন্নীত হন। সেই থেকে কবির সঙ্গে যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ট হয়ে উঠে।

কবি ১৯৩৮ সাল থেকে স্থায়ীভাবে রেডিওতে রইলেন। রেডিওতে যোগাযোগের মূলে যে সুরেশবাবুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাজ করেছিলো সে-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। এখানে সুরেশবাবুর সক্রিয় সহযোগিতায় কবির সঙ্গীত-জীবনের এক গৌরবময় নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেলো।

কেবল সঙ্গীত রচনা নয়, বেতারের জন্য কবিকে দিয়ে সুরেশবাবু অনেক কবিতাও রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। অসংখ্য কবিতাবলীর মধ্যে একটি কবিতা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। কবিতাটির নাম 'রবিহারা'। এই কবিতাটি রচিত হয়েছিলো ২২শে শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে এবং যথারীতি বেতার মারফত প্রচারিতও হয়েছিলো। নজরুলের সঙ্গীত জীবনকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতেই। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ সঙ্গীতে রাগের কারুকার্য সূক্ষ্মতম পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। রাগ এবং রাগিণীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে। সঙ্গীত শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মেনে এই পর্বের সঙ্গীতগুলি দুর্লভ সৌন্দর্যে উৎকর্ষিত। নজরুল সঙ্গীতের বলিষ্ঠতা ও সুর-বৈচিত্র্যের অন্বেষণে গবেষকদের লক্ষ্য এই পর্বের সঙ্গীতাগুলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হবে।

বেতারে কবির জন্য তিনটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিলো : 'হারামণি,' 'গীত-বিচিত্রা', 'নব-রাগমালিকা'—এই তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সঙ্গীত রচনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

'হারামণি' অনুষ্ঠানটি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণীর পুনঃ প্রচলনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। রাগ-রাগিণীতে সমৃদ্ধ হয়ে না উঠলে কোনো দেশের সঙ্গীত প্রাচুর্যময় ও শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না। এই সহজ সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বাংলার সঙ্গীতকে রাগ-রাগিণীর প্রাচুর্যে অনবদ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রতিটি সঙ্গীত লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে-যাওয়া সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। এই সকল রাগ-রাগিণীর মধ্যে যথা, অনন্ত গৌড়, মালগুঞ্জ, যুঁই, আহির-ভৈরব, বাঙাল-বিলাবল, আনন্দ-ভৈরব, বসন্ত মুখারি, উমা তিলক, শৃঙ্গার বিরহাগ্নি, লঙ্কাদহন, সারং জৌন-বাহার, রক্তহংস সারং ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে আহির-ভৈরব শীর্ষক বিখ্যাত নজরুল গীতিটি আহির-ভৈরব সুরে লিখিত। 'হারামণি' অনুষ্ঠান শুরু হবার প্রথমে সুরেশবাবু রাগ ও সুরের বিশ্লেষণ করতেন।

এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাগ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে ওঠার পর সেই রাগে রচিত গানটি কবি নিজে গাইতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, হারামণি অনুষ্ঠানের কোনো গান বাইরের শিল্পীদের দিয়ে গাওয়ানো হতো না। এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত-গুলি রচনার জন্য কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু রচিত ফার্সী ভাষার এক বিপুলায়তন গ্রন্থ আর নবাব আলি চৌধুরী কৃত 'ম আরিফুন্ নাগমাত' বিখ্যাত সঙ্গীত-গ্রন্থ দু'খানি কবি অতি যত্ন-সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এ ছাড়াও রাগ-রাগিণী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তিনি সুরেশবাবুর কাছ থেকেও পেতেন। এই দ্বিবিধ মূলধন সম্বল করে কবি গভীর রাত্রে

একান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়ে 'হারামণি'র গানগুলি রচনা করতেন। সঙ্গীত রচনার জন্য কোনো সময় কবিকে এমন তপস্যা নিমগ্ন হতে দেখা যায় নি। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের, এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত অধিকাংশ গান বর্তমানে পাওয়া যায় না। বেতারে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়েছিলো 'গীতি-বিচিত্রা'। অনুষ্ঠানটি মাসে দু'বার প্রচারিত হতো, পৌনে এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। কবি যতদিন বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিয়মিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর মতে—আশি হতে নব্বুইটি গীতি-বিচিত্রা বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো।

'গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠানটিকে সঙ্গীত আলেখ্য অনুষ্ঠান বলা চলে। মূল একটি বিষয় অবলম্বনে দু'টি করে সঙ্গীত পরিবেশন করা হতো। এই অনুষ্ঠানে যে সকল সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান হলো 'কাফেলা', 'কাবেরী তীরে', 'ছন্দসী' ইত্যাদি।

'কাফেলা' আলেখ্যটিতে দেখা যায় একদল মরুযাত্রী এগিয়ে চলেছে। তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। দিবস সন্ধ্যার বুকে বিলীন হয়ে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে কাফেলার গতিবেগ এবং মেজাজ। বাণী এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কাফেলা সঙ্গীত আলেখ্যটি অপূর্ব। মরুভূমির পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আরব দেশ থেকে সংগৃহীত আরবীয় সুর সমৃদ্ধ রেকর্ড থেকে কবি সুর সংগ্রহ করেছিলেন। এই রেকর্ডগুলি গ্রামোফোন কোম্পানী কবির জন্য আরব থেকে আনিয়েছিলেন। কাফেলার কয়েকটি গানে আরবী সুর বিধৃত ছিলো, 'কাবেরী তীরে' গীতিনাট্যটি একটি নিটোল ভালোবাসার কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ছ'টি গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। নজরুলের বিখ্যাত গান 'কাবেরী নদী জলে কে গো

বালিকা'। এই গানটি গীতিনাট্যের জন্যই রচিত। পরে এটি সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়।

ছন্দসী গীতিনাট্যটি দু'টি অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হয়। 'ছন্দসী'র রচনা ও প্রচার প্রধানতঃ সুরেশবাবুর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিলো। এই অনুষ্ঠানে আট-দশটি সংস্কৃত ছন্দকে অনুসরণ করে কবি গান রচনা করেন। সংস্কৃতের যে ক'টি ছন্দকে কবি অনুসরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো—মালিনী, বসন্ত তিলক, তনুমধ্যা, ইন্দ্রব্জা, মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি। গীতি-বিচিত্রার আর একটি অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো কেবলমাত্র কীর্তনের সুরে। আশি হতে নব্বুইটি অনুষ্ঠানের জন্য কবি কমপক্ষে পাঁচশো গান রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে সমসাময়িক কালে যে স্বল্প সংখ্যক গান রেকর্ড করা হয়েছিলো বর্তমানে সেগুলি ছাড়া আর একটিও পাওয়া যায় না।

'হারামণি' এবং গীতি-বিচিত্রা' অনুষ্ঠান দু'টি ছাড়াও কবির সঙ্গীত এবং সুরে প্রচারিত হতো 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানটি। 'হারামণি' অনুষ্ঠানে তিনি যেমন অপ্রচলিত বা হারিয়ে যাওয়া রাগ-রাগিণীগুলির পুনঃ প্রচলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন, তেমনি 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিলো নতুনতর সুর সৃষ্টির দিকে। নতুন সুরগুলির মধ্যে যেমন, উদাসী-ভৈরব, অরুণ-ভৈরব, শিবানী-ভৈরবী, আশা-ভৈরবী, রেণুকা, অরুণ রঞ্জনী, নির্ঝরিণী, দোলনচাঁপা, ধনকুন্তলা, সন্ধ্যামালতী, মীনাক্ষী, রূপমঞ্জরী প্রধান।

সেই সময় কবি সভা-সমিতি ছেড়েছিলেন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে নিস্তব্ধ গৃহে সঙ্গীত-সুর সৃষ্টির দুরূহ মৌন তপস্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

সারাজীবন বিপুল অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতা ও যে সকল শ্রমে সঙ্গীত ও সুর রচনা করেছেন কবি নজরুল—ছোট্ট একটি নিবন্ধে তার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা অসম্ভব। আমি নজরুলের রেডিওতে যোগদান ও তৎকালীন কিছু সঙ্গীত, সুরের সূচীপত্রের কয়েকটি দিক স্পর্শ করতে চেষ্টা করলাম মাত্র।

বৈষ্ণব ধার্মিকেরা মনে মনে যে 'নওল কিশোরে'র কল্পনা করেন, তার বয়স মোটামুটিভাবে সাত থেকে বারো। শাক্ত শাস্ত্রকাররা যে-কুমারী গৌরীর কথা লিখে গেছেন, তারও বয়স সাত থেকে বারো। অর্থাৎ সাত থেকে বারো বছর—এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের বলা হয় কিশোর কিশোরী। মনোবিজ্ঞানীরা এই বয়সকে কিশোরকাল বলে নির্দেশ করেন। ডাক্তারী মতে তেরো বছর বয়সের ঊর্ধ্ব হলেই পূর্ণবয়স্কের কোঠায় ফেলা হয়।

মানুষের জীবনে এই বয়সটা বড়ই আশ্চর্য। মনের তিন-ভাগে তখন কল্পনার নীল সমুদ্রের ঢেউ। যুক্তির শরিকানায় শুধু এক-ভাগ। চাঁদ, সূর্য এমনকি বাঘও তখন মামা। অদেখা মাঠগুলি তেপান্তর, অজানা নৌকাগুলি ময়ূরপঙ্খী, অদৃশ্য পাখিগুলি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী।

এই মুহূর্তে মনের মধ্যে ডুব দিয়েছি। ষাট বছর বয়সে 'শিশু ভোলানাথ' লিখতে রবীন্দ্রনাথ যেমন করে ডুব দিয়েছিলেন। বয়স্ক নজরুলও যেমন করে মনের মধ্যে ডুব দিয়েছিলেন। ডুব দিতেই পেয়ে গেলাম হারানো কৈশোরকে। সেই সাত কিংবা আট বছরের আমি। রবিঠাকুরের 'শিশু ভোলানাথ'-এর কিছু কিছু কবিতা পড়তে পেয়েছি। ছড়ার সীমাবদ্ধ গণ্ডী পেরিয়ে কবিতার সূক্ষ্ম কল্পনার জগতে বিচরণের জন্য রবিঠাকুর ডাক দিয়েছেন। যাকে কেন্দ্র করে আমি সেই অদ্ভুত জগতে আনাগোনা শুরু করলাম। খোকার দপ্তর পেরিয়ে, ছড়ার চৌকাঠ পেরিয়ে, শিক্ষকের নীতিকথার বেড়া ডিঙিয়ে একটা আশ্চর্য রাজ্যের সন্ধানে যাবার সে কী ব্যাকুলতা! দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে আমার তখন মন ভরতো না। রাক্ষস, বাঘ, ডাকাত, সিংহের গল্পে যদিও দুর্দান্ত হবার প্রেরণা পেতাম, তবু মন

ভরতো না। শেষে আমি নিজেই দশ বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করে দিলাম।

নজরুল সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে এই সামান্য ভূমিকা লেখার কারণ হলো, বাংলা দেশটা আসলে কবিতার দেশ। এ দেশের লক্ষ লক্ষ কিশোর নিজেরাই কবিতা লিখতে পারে। ভারতবর্ষে আর কোথাও এমনটি নেই। কিশোর-কিশোরীর এমন স্পর্শকাতর মন গুজরাটে কিংবা রাজস্থানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। রবিঠাকুরের—

'মা, তুই হতিস নীলবরণী,
আমি সবুজ কাঁচা।
তোর হতো, মা, আলোর হাসি—
আমার পাতার নাচা।'

এই কবিতাংশের মাধুর্যটুকু অনেক রাজ্যের কিশোর কেন, তার মাকেও হৃদয়ঙ্গম করানো দুষ্কর হবে।

রবিঠাকুরের মতো নজরুলও বাংলার কিশোর-কিশোরীর জন্য কবিতা লিখে গেছেন। কিন্তু দুয়ের মধ্যে বেশ কিছুটা আদর্শের ব্যবধান আছে। কিশোরের সূক্ষ্ম কল্পনাকে গভীরতর সৌন্দর্যের দিকে উদীপ্ত করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল চেয়েছেন কিশোরবাহিনীর শক্তিকে গঠনাত্মক ও কল্যাণকর্মে নিয়োজিত করতে। সুযোগের অভাবে, সংগঠনের অভাবকে, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে জাতীয় সম্পদের যেন নিদারুণ অপচয় না হয়। জাতিগঠনে, দেশগঠনে, কল্যাণকর সমাজব্যবস্থা গঠনে শিশুর মনের মুক্তি তিনি খুঁজেছেন। শিশুমনে সংক্রামিত করতে চেয়েছেন ভাবীকালের নির্ভীক, সত্যবাদী, আদর্শনিষ্ঠ, স্বাস্থ্যবান, সংস্কৃতিবাদন হৃদয়বত্তাকে।

'তুমি হতে পারো রবীন্দ্রনাথ
নয়তো বিবেকানন্দ।'

শিশুর জবানীতে রবীন্দ্রনাথ শিশু বা কিশোরের কল্পনাকে নৈর্ব্যক্তিক, নিরাকার আনন্দে পৌঁছে দেবার যে চেষ্টা করেছিলেন,

এবং কবিতার যে-কলাকৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কারুর পক্ষেই সম্ভব ছিলো না।

কাব্যের কলাকৌশল প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের কাছে নজরুল দুর্বল। শব্দযোজনা এবং ছন্দপ্রয়োগে নজরুল বেপরোয়া নন্দনতত্ত্বের ব্যাপারে নজরুল উদাস।

কিন্তু নজরুলের যা বৈশিষ্ট্য, সেগুলি তাঁর কিশোরপাঠ্য কবিতা-গুলিতে উপস্থিত আছে। মানুষের অসামাজিক আচরণের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতা বিষোদ্গার করে। হিটলার, মুসোলিনীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণা! ভারতের ভূতপূর্ব ইংরেজ শাসকদের প্রতিও প্রচণ্ড ঘৃণা! দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর দুর্বার আকাঙ্ক্ষা! দেশ-বিদেশ ঘোরার জন্য কী ব্যাকুলতা:

'হাঁটু ভেঙে আনবো আবার
বিট্‌লে ভাই ঐ হিটলারে,
উড়ে বামুন করবো তারে,
দেখো আসছে সোমবারে।'

ছন্দ সম্পর্কে নজরুল খুব সাবধানী নন। তা সত্ত্বেও তাঁর 'চিঠি' নামক কবিতার আরম্ভের চার লাইন বড় চমৎকার:

'ছোট্ট বোনটি লক্ষ্মী
ভো জটায়ু পক্ষী!
য়্যাব্বড় তিন ছত্র
পেয়েছি তোর পত্র

নজরুলের 'ঘুম জাগানো পাখী' নামক কিশোর-পাঠ্য কাব্যগ্রন্থের মাঝে মাঝে উজ্জ্বল হীরকদ্যুতি চোখে পড়বে। দেখুন, কী সুন্দর এই স্তবকটি:

'আকাশ-খুকির রুপার ঘুঙুর
যাস্‌ নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ুর,
ময়ূর ভাবে মেঘ-তুষার।

ফুলের ঘ্রাণ ঝড়ের গর্জন

সরল দে

নজরুলকে আমি দেখিনি। নজরুলকে আমি পেয়েছি।

পেয়েছি আমার বয়ঃসন্ধির যন্ত্রণায়, যৌবনের স্পর্ধায়—উন্মীলনে আর উজ্জীবনে। জীবনের ধাপে ধাপে নজরুলকে আমি নতুন নতুন করে পেয়েছি, পেতে পেতে নজরুল কখন আমাকে একেবারেই পেয়ে বসেছে।

আমার তখন সেই চোখে-আলো-লাগার হঠাৎ-ভালো-লাগার সময়। মনের মধ্যে একটা-দুটো কুঁড়ির ঘুম ভাঙছে, রঙ ধরছে ঠিক তখনই নজরুলের কবিতা আমার বুকের মধ্যে উঠে এলো। তবে সে-কবিতা প্রলয়ের মন্ত্রোচ্চারণ নয়, বিশ্ব-মার স্তবগান।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। কবিতা পড়তে ও চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে ভালো লাগে আমার এই বিশেষ গুণের কথা কখন কীভাবে হেডমাস্টার শচানবাবুর কানে এলো। তিনি একদিন আমাকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। আমার কচি গলায় ঝংকৃত হয়ে উঠলো নজরুলের অনামিকা :

'তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্নসহচরী
লো আমার অনাগত প্রিয়া···'

শচীনবাবু বাধা দিলেন না, সবটা শুনে বললেন, 'গুড্, এতোবড়ো কবিতা মনে রেখেছো ; কিন্তু এ-কবিতার মানে বোঝো কি?'

আমি নির্বাক। নিরুত্তর। না, মানে আমি বুঝি না, তার জন্য বিন্দুমাত্র মাথাব্যথাও নেই। ভোরের আবছায়ায়, আলো-অন্ধকারের অস্পষ্টতায় সে এক আশ্চর্য ভালো লাগা।

মনে পড়ে, নজরুলের ছবির সঙ্গে আমার পরিচয় তারও আগে,

পাঠ্য-বইয়ের পাতায়—সেই যখন পড়ছি, 'রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ঐ…'। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, টানা টানা বড়ো বড়ো চোখ। বিশাল মুখমণ্ডল পৌরুষে দীপ্ত, মাধুর্যে রমণীয়। সেই ছবি আমার চোখে লেগে রইলো, বুকে বিঁধে গেলো।

আকাশে তখন বোমারুর গর্জন, বাতাসে বারুদের গন্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর। বোমার ভয়ে শহর ছেড়ে আমরা চলে এলাম ছায়া-নিবিড় এক গ্রামের নির্জনতায়।

শাপে বর হলো। পেলাম গাছের সবুজ, পাখির ডাক, জোনাকির আলো আর ঝিরঝিরে এক ছোট্ট নদী।

আর নিতান্ত ঘটনাচক্রে হাতে এলো একখানি কবিতার বই—সঞ্চিতা।

উদাস-করা নির্জন দুপুরে নিজেকে বড়ো একা মনে হতো। সঞ্চিতার পাতা ওল্টাতুম। ছন্দ ধ্বনি শব্দ আমার কানে ঝংকার তুলতো, গলায় গুনগুনিয়ে উঠতো। আর চারিদিকের সব কিছুর সঙ্গে, সব ভালো-লাগার সঙ্গে নজরুলের কবিতা একাকার হয়ে যেতো।

তন্ময় হয়ে পড়েছি :

'সখি পাতিসনে শিলাতলে পদ্মপাতা
দিসনে গোলাব ছিটে খাস লো মাথা…'

আরও পড়েছি :

'আজ লালসা-আলস-মদে বিবশা রতি
শুয়ে অপরাজিতায় ধ্বনি স্মরিছে পতি…'

লালসা-আলস-মদ কী তা জানতুম না, তবু সেই ধ্বনি সেই ছন্দ সেই সুর আমাকে মোহাবিষ্ট করে রাখতো, কী এক নেশায় যেন বুঁদ হয়ে যেতাম।

যুদ্ধ থামলো। আমরা শহরের লোক আবার শহরে ফিরে এলাম। আমি তখন পনেরোয় পা দিয়েছি। জগৎ ও জীবনের দিকে অন্য এক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে শুরু করেছি।

যুদ্ধ থেমেছে। চারিদিকে অনেক ক্ষত, অনেক দাগ, অনেক ধ্বংস। নতুন মূল্যবোধ। আর সেই ধ্বংসস্তূপে এক ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরণের প্রতীক্ষায়···আসমুদ্র হিমাচল ভারতের মাটিতে রোমাঞ্চ-শিহরণ···নূতনের কেতন ঐ বুঝি ওড়ে।

অগ্নিবীণার ঝংকার যেন নতুন করে কানে বাজলো। বাঁশির সুর জ্বলে উঠলো আমার রক্ত-স্রোতে, হৃৎপিণ্ডে। বুক চিতিয়ে গলার শির ফুলিয়ে বলে উঠি :

'বলো বীর
বলো উন্নত মম শির···'

মনে হলো : আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। এক হাতের বাঁকা বাঁশের বাঁশরীর মোহন সুরে মুগ্ধ হয়েছি, এবার রণতূর্যের আহ্বানে জেগে উঠলুম।

নেচে উঠলুম। ক্ষেপে উঠলুম।

আমার এক বিদগ্ধ বন্ধু নজরুল-কাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, এ বিদ্রোহ নয়, এক ধরনের বোহেমিয়ানিজম্, এক ধরনের অস্থির এলোমেলোমি। আমি পণ্ডিত নই, বিচার-বিশ্লেষণে আমার সম্পূর্ণ অনীহা। তবু জানি, ঝড়ের রাতের অগ্রপথিক নজরুলের কবিতায় ঝড়ের ক্ষ্যাপামি, ঝড়ের শব্দ। সেই এলোমেলো ঝড়ের ভীষণতায় অত্যাচারীর বুক কেঁপেছে, অত্যাচারিতের ঘুম ভেঙেছে।

রাষ্ট্রে-সমাজে আজ ভাঙা-গড়ার পালা চলেছে। সাম্যবাদী চিন্তা ও চেতনা সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূল নড়িয়ে দিচ্ছে।

নজরুলের কাব্যে, সেই কবে, এদেশে আমরা শুনেছি এক অনাগত বিপ্লবের আহ্বান। নজরুল লিখেছিলেন অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত, গেয়েছিলেন সর্বহারার গান।

নজরুল-কাব্যের ধ্রুবমূল্য নিয়ে পণ্ডিতরা মাথা ঘামান, আমি তার ধারে-কাছে নেই। আমি শুধু বলতে পারি—চোখে জল এলে নজরুলের কবিতা আমার মনে পড়ে, চোখে আগুন ঝরলে নজরুলের

কবিতা আমার মনে পড়ে। মনে পড়ে তখনও—বুকে যখন উল্লাস, রক্তে যখন ঢেউ।

আর কাঠবেড়ালি দেখলেই, এই বয়সেও, চেঁচিয়ে বলতে ইচ্ছে করে: কাঠবেড়ালি! কাঠবেড়ালি! পেয়ারা তুমি খাও?

এ দেশের ছোটোরা এই বলে আপসোস করতে পারে যে, নজরুলকে তারা পুরোপুরি পায় নি। পেলে কী সম্পদই না তারা পেতে পারতো।

আজ বড়ো হয়ে আমি ছোটোদের জন্য ছড়া-কবিতা লেখায় হাত দিয়েছি। কিন্তু কতোটুকু মজা ওদের দিতে পেরেছি? ঝিঙেফুলের মিষ্টি কবিতাগুলো বার বার পড়ি আর ভাবি, শিশুর মুখের ভাষা, মনের ভাবকে এমন চমৎকার করে আমরা কেন ফুটিয়ে তুলতে পারি না? কী মজাদার সেই সব কবিতা:

'দিদিমা কি দাদুর নাকে টাঙাতে 'আল্‌মানাক'
গজাল ঠুকে দেছেন ভেঙে বাঁকা নাকের কাঁখ?'

শিশুর মুখের ভাষা কতো অনায়াসে এসেছে নজরুলের কবিতায়:

'এ রাম, তুমি ন্যাংটা পুঁটো?
ফ্রকটা নেবে? জামা ছুটো?'

সম্প্রতি একটি স্মৃতিচারণে নজরুলের অতিখ্যাত শিশু-কবিতা কাঠবেড়ালির জন্মকথা আমাকে চমৎকৃত করেছে। নজরুল তখন কুমিল্লায় শ্রীইন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাড়িতে। একদিন শুনলেন, সেই বাড়িরই ছোট্ট একটি মেয়ে পেয়ারাডালের কাঠবেড়ালির সঙ্গে কথা বলছে। এই রাগছে, এই ভয় দেখাচ্ছে, মিষ্টিকথায় ভোলাচ্ছে। অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলছে, 'তোমার সঙ্গে আড়ি আমার। যাও!' আবার গাল-মন্দ করে অভিশাপ দিচ্ছে—'হেই ভগবান! একটা পোকা যাস্‌ পেটে ওর ঢুকে।' শুনে নজরুল ভারি মজা পেলেন। বেশ মজা করেই লিখে ফেললেন একটি অনবদ্য শিশু-কবিতা।

আসলে নজরুল নিজেই এক চিরশিশু। কবি-বিদ্রোহীর

ভিতরটায় কোথায় যেন লুকিয়ে আছে এক অবাক শিশু-ভোলানাথ। শিশুর মতো ধরণ-ধারণ, শিশুর মতোই অবারিত উল্লাস, অকারণ পুলক।

গোলাম মোস্তাফার ভাষায় :

ভায়া লাফ দেয় তিন হাত
হেসে গান গায় দিন রাত।

ছোট্ট একটি ফুটফুটে মেয়েকে নজরুল এই বলে নাচিয়ে দিলেন যে, তাকে কলকাতার এ-মোড় থেকে ও-মোড় সব দেখাবেন ; গড়ের মাঠ, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, সব—সব।

একখানা ট্যাক্সি করে নজরুল সত্য-সত্যই মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কলকাতা দেখতে দেখতে তিনি শিশুর সঙ্গে শিশু হয়ে গেলেন। গোটা কলকাতা চষে বেড়িয়ে সোজা চলে গেলেন দক্ষিণেশ্বর। তারপর ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে গিয়ে তিনি পকেটে হাত দিলেন। কিন্তু পকেট তো আর পকেট নয়—গড়ের মাঠ। তাই তো, কী হবে এখন। কী আর হবে, সেই ট্যাক্সি নিয়েই ছুটলেন বন্ধুদের বাড়ি-বাড়ি। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে ট্যাক্সিওয়ালার বিরাট অঙ্কের টাকাটা মিটিয়ে দিয়ে নিষ্কৃতি পেলেন।

নজরুলকে আমি দেখিনি।

কিন্তু সত্যিই কি আমি নজরুলকে দেখিনি ?

চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, এই হাবিলদার কবি এক পায়ে ঘাস এক পায়ে বিচালি বেঁধে কুচকাওয়াজ করছেন। আবার কখনো দেখি, হুগলির জেলে বন্দী কবি লাল কালিতে কলম ডুবিয়ে লিখছেন কল্লোলের জন্য কবিতা : আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে। গানের আসরে এক কবি-বুলবুলকেও যেন দেখতে পাই। মুগ্ধ শ্রোতার দল ঘিরে আছে কবিকে। কবি গাইছেন গানের পর গান। হারমোনিয়ামের রীডের উপর খটাখট্ করে আঙুল চলেছে দুর্দান্ত স্পীডে। কল্লোলের জমজমাট আড্ডায় সব গলা ছাপিয়ে এক

বেপরোয়া কবির কণ্ঠে হঠাৎ উল্লাস-ধ্বনি পারিপার্শ্বিককে চমকে দিচ্ছে: দে গরুর গা ধুইয়ে…! সে-চীৎকার আমার কানে বাজে, সে-ছবি আমি দেখতে পাই।

কিন্তু তারপর?

হ্যাঁ, তারপর—আজ এই মুহূর্তে, আমার চোখের সামনে স্তব্ধ এক অগ্নিগিরি। স্তব্ধ আর সুপ্ত।

আমি দেখি। চোখের জলে আমার বুক ভাসে।

আর দেখি—

ঘুমিয়ে আছে নীরব হয়ে আমার গানের বুলবুলি।

নজরুলের হাসির গান

সলিল চৌধুরী

গানের ভুবন নজরুল ভরিয়ে তুলেছিলেন স্বরচিত গানে আর সুরে। সঙ্গীতের প্রতিটি বিভাগে ছিলো তাঁর অবাধ পদসঞ্চার। তাঁর ভক্তিমূলক শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী গান, দেশাত্মবোধক মার্চ-সঙ্গীত আর পল্লী-বাংলার শ্যামলতা মাখানো বাউল-ভাটিয়ালী-ঝুমুর কীর্তন প্রভৃতি গীতির কথা ভুলবার নয়। একসময় নজরুল এই বাংলাদেশে গানের পুষ্পবৃষ্টি করে গেছেন। তিনি নিজেই ছিলেন একজন বিশিষ্ট সুরকার। তাই তাঁর গানে পরিপূর্ণ প্রাণসঞ্চার করতে পেরেছিলেন। নজরুলের নব নব সুরের মাধুর্য আর মূর্ছনায় বাংলাদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলো একদিন।

গান লেখা আর সুর তৈরী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিলো না তাঁর। নানা ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। এমন কি সংখ্যায় খুব কম হলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাসির গানও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর 'চন্দবিন্দু' ও 'সুর-সাকী' সঙ্গীত-গ্রন্থের কিছু অংশ হাসির গানের দ্বারাই সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বরচিত হাসির গানে নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সমাজ আর রাজনীতিগত ভুল-ত্রুটির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, শ্লেষপূর্ণ হাস্যরসের নির্মম কশাঘাত।

দেশের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কবি নজরুলের যোগাযোগ ছিলো গভীরভাবে। মুক্তিসংগ্রামে নিয়েছিলেন তিনি সক্রিয় ভূমিকা। তাঁকে বহু পীড়ন নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। কারাদণ্ড ভোগ করেছেন তিনি। তাই তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও ঐতিহাসিক চেতনা অন্যান্য কবি গীতিকারের তুলনায় অনেক বেশী, এবং এই কারণেই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা 'প্যাক্ট' নামের কোরাস

গানটি বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যে অদ্বিতীয় হয়ে আছে। বদ্‌না ও গাড়ুতে প্যাক্ট নিয়ে গানটির শুরু :

'বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব প্যাক্টের আস্‌নাই,
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।'

এবং শেষ পর্যন্ত উভয় সম্প্রদায়ের এই মৈত্রীর কি অবস্থা হলো, গানটির সমাপ্তি তাই দিয়ে :

'বদ্‌না-গাড়ুতে পুন ঠোকাঠুকি রোল উঠিলো 'হা-হন্ত',
উর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী-মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত।
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিলো চির-জিজ্ঞাসা— করুণ চন্দবিন্দু।'

নজরুল-রচিত সুবিখ্যাত কোরাস গান 'দে গরুর গা ধুইয়ে' এই 'চন্দবিন্দু' গীতি-গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ গানের বিষয়বস্তু গানের প্রথম দিকেই লক্ষ্য করা যায় :

'দে গরুর গা ধুইয়ে।
উল্টে গেলো, বিধির বিধি আচার বিচার ধর্ম-জাতি,
মেয়েরা সব লড়ুই করে মদ্দ করেন চড়ুই-ভাতি।'

সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ঠাট্টা-তামাসার ছবি তার 'চন্দবিন্দু' গ্রন্থের প্রতিটি হাসির গানের মধ্যেই ফুটে উঠতে দেখা যায়। লীগ-অব-নেশন, সর্দা বিল, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, রাউণ্ড-টেবিল-কনফারেন্স, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট, প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রভৃতি গানগুলিতে তাঁর গভীর সমাজচেতনা ও রাজনীতিবোধের চিহ্ন বিদ্যমান।

'সুর-সাকী' গ্রন্থের সর্বশেষ কীর্তনটি সহজ সরল অনাবিল হাসির গান হিসাবে নজরুল-গীতি-সম্ভারে একটি অনবদ্য নিদর্শন :

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজের লাগি করি ভজন।

আমি মাল্‌পোর লাগি তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন ॥
'রাধা-বল্লভী' লোভে পূজি রাধা-বল্লভে,
রস-গোল্লার লাগি আসি রাস-মোচ্ছবে।
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন।'

স্বরচিত গানে আর সুরে কবি নজরুল বাংলার আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলেছিলেন। বিচিত্র রাগে বিচিত্রতর অসংখ্য সঙ্গীত তিনি সৃষ্টি করেছেন। তারই মধ্যে তাঁর এই নিতান্ত সামান্য ক'টি হাসির গান উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিময় হয়ে আছে।

এ প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত, ডি. এল. রায় কি রজনীকান্ত সেনের সঙ্গেই নজরুল ইসলামের নাম উচ্চারিত হবে।

ওহাবী আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে মারাত্মক নৈরাশ্য আর অবসাদের সৃষ্টি করেছিলো, ১৯০৫ সালের আগে তার ভিতর কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি।

এই সুদীর্ঘ সময় একটানা ক্লান্তি ও হতাশার। অন্ধকার যবনিকা দীর্ণ করে কোনো সূর্যের সাক্ষাৎই এ সময় পাওয়া যায়নি।

তবু জাতি পুরোপুরিভাবে মরেনি।

রাজনীতি আর অর্থনীতির ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে অবহেলিত হয়েও শুধুমাত্র মৌলিক তমদ্দুনের জোরেই এ জাতি কোনো রকমে নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুর নামান্তর না হলেও মুমূর্ষু প্রাণীর আত্মরক্ষার ক্লিষ্ট প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। তার নিজস্ব তাহ্‌জীব-তমদ্দুনের ক্ষীণ রেখা কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছিলো তার নিজস্ব অস্তিত্ব।

ইতিহাসের এই পটভূমি পিছনে রেখে বিচার করলে পরিস্থিতির গুরুত্ব আমরা সহজেই বুঝতে পারবো। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন এই অচলায়তনে প্রথম সাড়া জাগলো। আর আত্মবিস্মৃত জাতির জীবনে খিলাফৎ আন্দোলনই সর্বপ্রথম নিয়ে এলো দুকুল-প্লাবী বন্যা।

খিলাফৎ আন্দোলন-কালে কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব একাধিক কারণে স্মরণীয়। আত্মবিস্মৃত জাতি বহুদিন পরে শুনলো তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। নতুন করে পেলো সে তার ঐতিহ্যের পরিচয়।

স্বতন্ত্র তমদ্দুনের যে বৈপ্লবিক দাবীতে পাকিস্তান-আন্দোলন সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রগতিশীল বলে একদা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিনন্দিত হয়েছিলো তার গোড়াপত্তন হয় এ-সময় থেকেই।

বহু শতাব্দী ধরে বাঙালী মুসলমান আরবী-ফারসী মিশ্রিত যে

বাংলা জবান গড়ে তুলেছিলো, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ষড়যন্ত্র যে-ভাষার কণ্ঠরোধ করেছিলো, কাজী নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনীতে তার নতুন প্রকাশ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন শিক্ষিত সমাজ। এমন কি, জনসাধারণের মধ্যেও এই সাড়া পৌঁছতে দেরী হলো না।

ইসলামের মরমীবাদ ও সুফীবাদ থেকে কাজী নজরুল যে উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন সেই ঐতিহ্যের প্রাণ-শক্তিই দেশের দুর্গত জনসাধারণকে বিপুল বেগে আকর্ষণ করলো মঞ্জিলের পথে।

'নীল সিয়া আসমান লালে লাল দুনিয়া
আম্মা। লাল তেরি খুন কিয়া খুনিয়া।'

অথবা :

'আবুবকর, উসমান, উমর, আলি হায়দর
দাঁড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,
দাড়ী-মুখে সরীগান—লা শরীক আল্লা।'

কবির কাব্য যেমন আশ্বাসের বাণী বয়ে আনলো, তেমনি সে উদ্বুদ্ধ করলো জাতিকে নতুন চেতনায়। এই সঙ্গে ইসলামের মানবতাবোধ, সাম্য ও সামাজিক ন্যায়-বিচার কবি-চিত্তে যে চেতনার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করলো তার কাহিনী খিলাফৎ আন্দোলনের একটি অধ্যায়কে যেমন প্রাণবন্ত করে তুলেছিলো, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেও তেমনি জেহাদী ফরমান শুনিয়েছিলো।

এই অগ্নি-গীতির সঙ্গে গজল ও কাব্য-গীতি মধুর রসে জনসাধারণের চিত্ত অভিসিঞ্চিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের গীতোচ্ছ্বাস একটি অচেতন জাতিকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার হারানো সম্বিৎ।

বঙ্গ-ভঙ্গ, খিলাফৎ, অসহযোগ ও সন্ত্রাসবাদের পটভূমিতে যে কবি-মানস গঠিত হয়েছিলো, তার অশান্ত মনের প্রতিচ্ছায়া দেখেছি আমরা তাঁর রচনায়। বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ অধ্যায়ে রয়ে গেছে তাঁর দ্বন্দ্ব-মুখর মনের ছাপ!

কাজী নজরুল   নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের নামটির একটিই অর্থ আছে। আনন্দিত আর অপরিমিত যৌবন। প্রাণদীপ্ত যৌবন কোনো অন্যায়, কোনো মিথ্যা, কোনো বিষাদ, কোনো ভণ্ডামিকে সহ্য করে না—তাই তিনি স্বভাব বিদ্রোহী। 'জয় সত্যম্ মন্ত্র শিখা' তাঁর বুকের ভিতরে জ্বলছে অম্লান আলোক; সেইজন্যই 'কারার লৌহ-কপাট' ভেঙে 'রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণবেদী' ভেঙে ফেলাই তাঁর সংকল্প,—তা রাষ্ট্রীক, সামাজিক আর মানবিক যারই হোক।

যুগপুরুষ রবীন্দ্রনাথ তো এই যৌবনের উদ্বোধনী শোনাচ্ছিলেন বার বার: 'ওরে সবুজ ওরে অবুঝ, আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।' এই তরুণেরা এগিয়ে আসছিলো রাজনৈতিক আন্দোলনের পথ ধরে, বিদ্রোহী চিন্তার উদ্ধত আধুনিকতায়, সব ফিলিস্টাইন স্থির-স্থবিরতার প্রতিবাদে। নজরুল এলেন তাঁদেরই অগ্নিস্ফুরিত বাণীমুখ হয়ে। 'নতুনের কেতনে' কালবৈশাখী ঝড়ের দোলা লাগালেন তিনি।

সুতরাং 'লাগলো লড়াই মিথ্যা এবং কাঁচায়।' প্রাচীন চিন্তায় অভ্যস্ত সমালোচক ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর নাম কবিতা?' দেখা দিলো প্যারডি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। ইংরেজ সরকার একটির পর একটি বই বাজেয়াপ্ত করতে লাগলো, কবিকে যেতে হলো জেলে। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চিন্তা চেতনায় ক্ষিপ্ত হলেন রক্ষণশীল হিন্দু, হিংস্র হলেন গোঁড়া মুসলমান। সরল আত্ম-বিশ্লেষণে নজরুল বললেন, 'মৌলবী না আমি কাফের ভাবিয়া খুঁজি টিকি-দড়ি, নাড়ি কাছা।' খুব স্বাভাবিক। কারণ বিদ্রোহী নবীন বীরের পথ তো পুষ্প বিকশিত নয়। 'মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙা পায়।' বাংলা

সাহিত্যের পথে—তাঁর সংগ্রামী সাধনার স্মরণীতে অগ্রপথিকের রক্তাক্ত পদচিহ্ন রেখে গেছেন নজরুল। সেই পদরেখা বাংলার যৌবনের দিশারী।

আর সেই দুঃখের পথে আর এক পাথেয় নজরুলের গান। বুকভরা, কণ্ঠভরা গান। অপরাজিত প্রাণের আনন্দিত উদার কলোচ্ছ্বাস—রাত্রির সীমান্তে প্রভাতী পাখির কলধ্বনি।

নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

কল্পতরু সেনগুপ্ত

কাজী নজরুলের সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারা আরো প্রকাশিত হয়েছে 'নবযুগ,' 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রবন্ধে। সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এ কাজী নজরুল ইসলাম ও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। সাংবাদিকতায় নজরুল যেমন অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিপ্লবী চিন্তাধারায় বলিষ্ঠ প্রবন্ধগুলি শুধুমাত্র কালের সীমায় আবদ্ধ নেই।

কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য, সঙ্গীত ও সাংবাদিকতায় এই সমাজ-বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ ঘটলো কি করে? সেকালে আর কোনো কবি ও সাহিত্যিক এমন খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদের কথা বলেন নি। নজরুলের 'ব্যথার দান'-এ লাল ফৌজের ও রুশ বিপ্লবের প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। এই সমাজ-বিপ্লবী প্রেরণা তিনি সৈনিক জীবনে লাভ করেছিলেন। সৈনিক ব্যারাকে তিনি গোপনে রুশ বিপ্লবের পত্র-পত্রিকা পাঠ করেছেন এবং অন্যান্যদের পড়িয়েছেন ও আলোচনা করেছেন। এ-সব কথা কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ রচিত 'কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা' বইতে আলোচিত হয়েছে। স্কুল-জীবনে নজরুল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সম্পর্ক লাভ করেছিলেন; সৈনিক জীবনে তাঁর দেশপ্রেম আন্তর্জাতিকতাবোধ ও সমাজ-বিপ্লবী জীবন দর্শনে বলিষ্ঠ হয়ে উঠে। সৈনিক জীবন থেকে ফিরে এসে ১৯১৯ সাল থেকে তিনি ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের অন্যতম প্রথম সংগঠক কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে একই বাড়ীতে দীর্ঘদিন বাস করতে থাকেন। স্বভাবতই কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে নজরুলের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আলোচনা

হয়েছে। এই সময়েই নজরুলের অধিকাংশ বিখ্যাত রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। একসঙ্গে দু-জনে পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন, এবং গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজী নজরুলকে কলকাতায় রাখার ব্যবস্থা থেকে পরবর্তীকালে নজরুলের বিবাহের পরেও কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ও কমরেড আবদুল হালিম এই পরিবারের সব সময়ের বন্ধু ছিলেন। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ লিখেছেন: '১৯২১ সালর শেষাশেষিতে আমরা প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তুলবো স্থির করেছিলাম। কাজী নজরুল ইসলামও আমাদের এই পরিকল্পনায় ছিলো। রুশ বিপ্লবের উপরে সে যে আগে হতে শ্রদ্ধান্বিত ছিলো সে-কথা আমি আগেই বলেছি। আমাদের এই পরিকল্পনা হতেই তার সুবিখ্যাত 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা। তার সিন্ধুপারের 'আগলভাঙা' মানে রুশ বিপ্লব।' ১৯৩১ সালের জুন মাসে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীরূপে কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কমিউনিস্ট-দের আদর্শ ও আশু কাজ বিশ্লেষণ করে আদালতে দাঁড়িয়ে 'আমি একজন কমিউনিস্ট' শীর্ষক যে নির্ভীক বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে এক জায়গায় তিনি কাজী নজরুলের নাল উল্লেখ ও লেবার স্বরাজ পার্টি গঠনের ব্যাপারে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কথা বলেছেন। তবে তিনি যে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন না সে-কথাও বলেছেন।

কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্পর্কে কাজী নজরুল যে কতো-শ্রদ্ধাশীল ছিলেন একটা চিঠিতে তার প্রকাশ দেখা যায়। কাজী নজরুল 'আত্মশক্তি' সম্পাদককে এক চিঠিতে লিখেছেন: 'আমি হলফ করে বলতে পারি মুজফ্‌ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটেও জল আসবে। এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনী কর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূরদৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মালো গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাংলায়, তা

ভেবে পাইনে।'…'মুজফ্ফরের মতো সমগ্রভাবে নেশনকে ভালোবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালোবাসতে কোনো মুসলমান নেতা তো দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না।' (৮ই ভাদ্র, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)।

এ-সব থেকে বুঝা যায় কাজী নজরুল শুধু কবি ছিলেন না; সমাজ-বিপ্লবকে রূপায়িত করার ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা ছিলো। শ্রমিক কৃষকের সভায়, মৎস্যজীবী সম্মেলনে তিনি কবিতা আবৃত্তি ও গান গেয়েছেন। যুব-সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলন সংগঠনে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনে ভলান্টিয়ার অধিনায়ক হয়েছেন। সারা বাংলায় রাজনৈতিক সফর করেছেন। ১৯২৩ সালে তাঁর এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, এবং মর্যাদার দাবিতে হুগলী জেলে ৩৯ দিন অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ, কমরেড আবদুল হালিম ও ফিলিপ স্প্রাট কুষ্টিয়া কৃষক সম্মেলনে গিয়েছিলেন। এই সম্মেলনে কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে কাজী নজরুলের রাজনৈতিক মঞ্চে শেষ দেখা। ২০শে মার্চ কমরেড মুজফ্ফর আহ্মদ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘদিন কারাগারে থাকেন। ইতিমধ্যে দেশের রাজনৈতিক জীবনে অনেক ঘটনাস্রোত বয়ে গেছে। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনেও পরিবর্তন এসেছে।

মানুষের কবি নজরুল

কাজী মোতাহার হোসেন

সকল কবিই তো মানুষের জন্য কাব্য লিখে থাকেন। তাহলে আর 'মানুষের কবি' বলে কবিকে বিশেষিত করবার তাৎপর্য কি? প্রথমেই এ-কথাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। আমরা সামাজিক কারণে মানুষকে নানা ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ভারতীয়, পাকিস্তানী, ইংরাজ, ধনিক, বণিক, শ্রমিক, আশরাফ, আতরাফ, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, রাজা, প্রজা, উজির, নাজির ইত্যাদি। কোনো কোনো কবি এইসব শ্রেণীর এক বা একাধিক বিশেষ শ্রেণীকে লক্ষ্য করে বা মনে মনে প্রধান বলে গণ্য করে কাব্য লিখে থাকেন। এঁরা হচ্ছেন শ্রেণী বিশেষের কবি। আর যাঁরা শ্রেণী বিশেষকে প্রাধান্য না দিয়ে সকল মানুষের জন্য কাব্য লেখেন তাঁদেরকে মানুষের কবি বলা যায়। নজরুল ইসলাম শ্রেণী প্রাধান্য স্বীকার করেন নি। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং সকল মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন-প্রেম, বীর-ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন। এজন্য তাঁকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যাত করা হয়।

নজরুল ইসলাম জীবনে জাত বিচার মানেন নি। সাম্যের দিকেই তাঁর প্রধান আকর্ষণ। জাতের-বিচার ক্ষুদ্রতাকে বিদ্রূপ করে তিনি লিখিছেন :

> 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছো জুয়া।
> ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতে নয়তো মোয়া॥
> হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতেই জাতির প্রাণ।
> তাইতো বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে একশো খান॥'

ইসলামী শিক্ষার বিধান তিনি উদাত্ত সুরে ঘোষণা করেছেন :

'আজি ইসলামী ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান—
নাহি বড়ো ছোটো—সকল মানুষ এক সমান,
রাজা প্রজা নয় কারো কেহ।
কে আমীর তুমি নওয়াব বাদশা বালাখানায়?
সকল কালের কলঙ্ক তুমি, জাগালে হায়
ইসলামে তুমি সন্দেহ॥'

এখানে সে-সব ভাগ্যবান সচরাচর নিজেদের 'বড়ত্ব' নিয়ে ছোটোদের ঘৃণা করে, তাদের বিরুদ্ধে কবির তিক্ত বাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় যে বড়ত্বের বড়াই নেই, কবি সেই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

আবার যে-সব ভাগ্যবান বড়ো হয়েও বড়াই করেন না তাঁদের প্রতি নজরুলের অপরিসীম শ্রদ্ধার নমুনা দেখুন :

'মানুষেরে তুমি করেছো বন্ধু, বলিয়াছ ভাই, তাই
তোমারে এমন চোখের পাণিতে স্মরি গো সর্বদাই।
বন্ধু গো প্রিয়, এ হাত তোমারে সালাম করিতে গিয়া
ওঠে না উর্ধ্বে, বক্ষে তোমারে ধরে শুধু জড়াইয়া'।

ওমর ফারুকের মানব-প্রীতি কবিকে কী অপরূপভাবে মুগ্ধ করেছে, এবং উপরের কবিতায় কী অপূর্বভাবে তা প্রকাশ হয়েছে। হৃদয়ের মাধুর্য দিয়ে নজরুল সব উঁচু-নীচু সমান করে দিতে চান। তাঁর ধর্মই হৃদয়ের প্রেম-ধর্ম, যে-প্রেম মানুষের কল্যাণে উৎসারিত হয়ে উঠে। তাই তিনি লিখেছেন :

'তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব, সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা, খুলে দেব নিজ প্রাণ।
এই বন্দরে আরব দুলাল শুনিতেন আহ্বান,
এইখানে বসি' গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম গান।
মিথ্যা শুনি নি ভাই—
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

মানব-প্রেমের ক্ষেত্রে সমস্ত ধর্ম এসে হৃদয়-বন্দরে মিলিত হয়েছে—বিশ্ব সেখানে কোলাকুলি করে। এই হচ্ছে কবির বাণী এবং ইসলামের ধর্মের রূপ।

আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে সামাজিক বা কুল-মর্যাদার মিথ্যা অহংকার। কবি এই ভেদাভেদ মিটিয়ে দিতে চান। তিনি 'যুগবাণী'তে লিখেছেন, 'সমাজ বা জন্ম লইয়া এই বিশ্রী উঁচু-নীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া, পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্বমানবতার যুগে যিনি এমনি করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি।'

এখানে মনুষ্যত্বের অর্থ হচ্ছে, মানব-প্রীতি আর পুরুষকারের অর্থ বীর-ধর্ম। নজরুলের মধ্যে আমরা একাধারে প্রেমের কোমলতা আর বীরত্বের দৃঢ়তার পরিচয় পাই। ইসলামের ভিতর কবি দেখেছেন এক বিশ্বব্যাপী আজাদীর আহ্বান। তাই তিনি বলেছেন :

'অন্যেরে দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হতে, ওরে
আসেনি ক' দুনিয়ায় মুসলিম ভুলিলি কেমন করে?
ভাঙিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন, ভয়, লাজ
এলো যে কোরাণ, এলো যে রে নবী, ভুলিনি সে-সব আজ?'

কোরাণের এই মুক্তিবাণী—তৌহিদের যা মর্মকথা সেই দিকে কবি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। আমার মনে হয় অন্য কোনো কবিই তৌহিদের এই 'অবন্ধন রূপ' এতো স্পষ্ট করে অনুভব করনে পারেন নি। এইটি নজরুলের একটি বিশেষ দান। বন্ধন-লাজ-ভয় জয় করবার সাধনা যাঁরা করেছেন সেই বীরদের গান নজরুল গেয়েছেন :

'গাহি তাহাদের গান
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।
সেদিন নিশিথ বেলা
দুস্তর পারাবারে যে যাত্রী একাকী ভাসালো ভেলা,

প্রভাতে সে আর ফিরিল না কূলে। সেই দুরন্ত লাগি'
আঁখি মুছি আর রচি গান আমি আজিও নিশিথ জাগি'।
আজো বিনিদ্র গাহি গান আমি চেয়ে তারি পথ-পানে,
ফিরিল না প্রাতে যে জন সে-রাতে উড়িল আকাশ-যানে,
নব-জগতের দূর সন্ধানী অসীমের পথচারী,
যার ভয়ে জাগে সদা-সতর্ক মৃত্যু দুয়ারে দ্বারী।'

নজরুল বর্তমানকে যা পেয়েছেন, তার থেকে এক উন্নততর নতুন বর্তমান গড়ে তুলবার প্রয়াসী। মানবতার কল্যাণ-রথ সর্বদা সামনের দিকে চালাতে হবে, পিছে তাকিয়ে হা-হুতাশ করে কোনো লাভ নেই। তাই তিনি বলতে পেরেছেন :

'যাক্ রে তখ্‌ত তাউস, জাগ্ রে বেহুঁশ
ডুবিল রে দেখ্ কতো পারস্য, রোম গ্রীক রুশ,
জাগিল তারা সকল, জেগে ওঠ্ হীনবল,
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল!'

নজরুল আশার কবি—শুধু বৈষয়িক ক্ষেত্রে নয়, প্রেমের ক্ষেত্রেও। নজরুলের প্রেমিকা হচ্ছেন এক 'শাশ্বত প্রতীক্ষমানা অনন্ত-সুন্দরী।' সর্বদা তার মিলনের জন্য কবি অগ্রসর হচ্ছেন, এক কূলে নৌকা না ভিড়লেও আর এক কূলে ভিড়তে পারে। সকল কূলই সেই এক প্রেমময়ীর। নজরুলের একটা গান আছে :

'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥
কেউ শীতল জলদে হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে তার শুষ্ক কুঞ্জ বীথি॥
কেউ জ্বালে না আর আলো তার চির দুখের রাতে
কেউ দ্বার খুলি' জাগে চায় নব চাঁদের তিথি॥'

এখানে আশাবাদী নজরুলের মনের টান কোন দিকে তা সহজেই বোঝা যায়।

এই ভেদাভেদ চূর্ণকারী মানবতার কবিকে আমরা ভালোবাসি। কবি বহুবার বলেছেন, শ্রদ্ধা আমি অনেক পেয়েছি, কিন্তু ভালোবাসাই দুর্লভ'।

তাঁর আশা ধ্বনিত হয়েছে পূজারিণীর কয়েকটা লাইনে :

'ভেবেছিনু বিশ্ব যারে পারে নাই, তুমি নেবে
তার ভার হেসে
বিশ্ব-বিদ্রোহীরে তুমি করিবে শাসন অবহেলে,
শুধু ভালোবেসে।'

কবির এ-আশা পূর্ণ হয়েছে কিনা জানি না, কিন্তু অন্য যে-কোনো কবির চেয়ে মানুষের কবি নজরুলকে যে তার গুণে-ভরা স্বদেশবাসী অনেক বেশী অন্তরঙ্গ বলে অনুভব করে থাকেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কাজীদার স্মৃতিকথা

সরযূবালা দেবী

কাজী নজরুলের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় তাঁর কবিতা, গান, বিশেষ করে দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে। তখন কবির 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে-মাদল' গানটি আমাদের বয়সী ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতো। তারপর তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা তো দেশপ্রেমের উন্মাদনায় ছোটো-বড়ো সকলকেই পাগল করে দিয়েছিলো। এ ছাড়া তাঁর 'এতো জল ও কাজল চোখে', 'শুকনো পাতার নূপুর পায়', 'রুমঝুম ঝুমঝুম' এই সব গান—নিজের মনে মনে গুন্‌গুন্‌ করে গায়নি এমন কেউ সে যুগে ছিলো না বললেই হয়।

নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর 'রক্তকমল' নাটকটি মঞ্চস্থ হবার সময় কবি নজরুল ইসলামের কাছাকাছি আসবার সুযোগ ঘটলো আমার। স্বরচিত কবিতা পড়ে যাঁকে খুব গম্ভীর ভারিক্কী বিরাট মানুষ বলে মনে মনে ভেবে রেখেছিলাম, কাছে এসে মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর সহজ সরল অন্তরঙ্গ ব্যবহারে। দেখা হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কখন যে ঐ দেশজোড়া বিখ্যাত মানুষটি আমার 'কাজীদা' হয়ে উঠলেন, তা জানতেই পারলাম না।

কাজীদার কথা মনে হলেই আজও কানে ভাসে তাঁর প্রাণ-খোলা উদার হাসি—যে হাসির দ্বারায় এক মুহূর্তেই অপরিচিত জনকে নিজের নাম ও খ্যাতির বেড়া ভেঙে একেবারে যেন হৃদয়ের অন্তঃপুরে স্থান করে দিতেন। কাজীদা ছিলেন যেমন আনন্দময়, তেমনি স্নেহপ্রবণ। যখন যেখানে থাকতেন হাসিতে আনন্দে একেবারে আসর সরগরম করে রাখতেন।

প্রবোধ গুহ ও অনাদি বসুর মনোমোহন থিয়েটারে তখন 'রক্তকমল' মঞ্চস্থ হবার কথা হলো। এই নাটকের জন্য কাজী

নজরুলের কাছে আমায় গান শিখতে হবে শুনে আমি তো ভয়ে লজ্জায় প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! ভাবলাম, আমি গানের কি জানি যে, এতোবড়ো একজন মানুষের কাছে গান শিখতে যাবো! সে-কথা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষকেও জানালাম। ওঁরা আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'কিছু ভয় নেই, তুমি কবির কাছে গিয়েই দেখ না—'

এর পর কাজীদার কাছে না গিয়ে কোনো উপায় রইলো না। তাঁকে দেখে কিন্তু আমার মনের ভয় কেটে যেতে দেরী হলো না মোটেই। কখন যে তাঁর কোলের কাছে বসে মজার মজার গল্প শুনতে শুরু করে দিয়েছি, সে খেয়ালই নেই আমার তখন। এই কথা আর গল্পের মাঝখানে 'রক্তকমল' নাটকের একখানি গান গুন্‌গুন্ করে ক'বার গেয়েই কবি বললেন, 'একবার আমার সঙ্গে গাও তো দেখি—'

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো গাইতে শুরু করে দিলাম। তখন তিনি উৎসাহ দিয়ে বলে উঠলেন, 'বাঃ, বহুত আচ্ছা। তুমি তো খুব সুন্দর গাও, তবে এতো ভয় পাচ্ছিলে কেন?'

রক্তকমলে মমতার ভূমিকায় আমি অভিনয় করি। ঐ ভূমিকার জন্য কাজীদা পাঁচখানি গান লিখে সুর করে আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সে গানগুলি স্টেজে বেশ উতরে গিয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। তারপর নাট্যকার মন্মথ রায় রচিত 'মহুয়া' নাটকের নাম ভূমিকায় অভিনয় করার ডাক এলো আমার কাছে। সেটা ১৯৩০ সালের কথা। কাজীদা ঐ নাটকে আমার জন্য সাত-আটটি রাগপ্রধান গান লিখেছিলেন। এর সব ক'টি গান স্টেজে উঠে আমাকে গাইতে হবে শুনে আমি বেঁকে বসলাম একেবারে, 'ও আমি কিছুতেই পারবো না। আগেরগুলি মোটামুটি সাদা-মাটা-সুরের গান ছিলো—তাই চালিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এ-সব রাগসঙ্গীত গাইতে হলে তো রীতিমতো তালিমের দরকার, গলা সাধতে হয়। একি খেলার কথা নাকি?'

এই কথা শুনে কাজীদা হা হা করে হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, 'বাঃ বাঃ, সরযূ দেবী

দেখছি সত্যই বেশ বড়ো হয়ে গেছেন, কেমন বড়ো বড়ো কথা দিব্যি গুছিয়ে বলছে দেখ! আমরা কথার বেসাতি করি, আমাদেরও তো এতো কথা মাথায় আসে না।'

কাজীদার এই কথা আর হাসিতে আমার সমস্ত আপত্তি ভেসে যায় যেন। আমি যতো বলি, 'না হবে না।' উনি ততোই জেদ ধরে বলেন, 'হ্যাঁ, হতেই হবে, না হলে আমার নাম পালটে দেবো।' তোমায় কিচ্ছুটি করতে হবে না—লাফাতে হবে না, ডিগবাজী খেতে হবে না, একপায়ে দাঁড়াতেও হবে না, শুদ্ধু আমার সঙ্গে গাইবে আর হাসবে। ওঃ হো, তুমি তো জর্দা খেতে ভালোবাসো—আচ্ছা দেখ, তোমায় কি সুন্দর জর্দা খাওয়াচ্ছি।' বলে তিনি নিজের হাতে পানের বাটা থেকে পান সেজে জর্দা দিয়ে আমার মুখে পুরে দিলেন। জীবনে কতো জর্দা, কতো পান খেয়েছি, কিন্তু কাজীদার হাতেই সেই স্নেহ-মাখানো পানের স্বাদ যেন আজও ভুলতে পারিনি। আর শুধু কি পান খাওয়ানো? নানাভাবে উৎসাহ দিয়ে মাত্র তিন দিনের মধ্যে ঐ অতোগুলি রাগপ্রধান গান একেবারে পাখী পড়ানোর মতো করে শিখিয়ে দিলেন কাজীদা। সে সব গানের সুরও তৈরী করেছিলেন তিনি অপূর্ব।

কাজীদার সেই সব গান গেয়ে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ বিদগ্ধ দর্শকের প্রশংসা আর আশীর্বাদ অর্জন করেছি আমি। এর জন্য ঐ একটি মানুষ—কাজীদার কাছে যে আমি কতো ঋণী তা বলে বোঝানো যাবে না।

কাজীদা আমাকে বড়ো দাদার মতো উৎসাহ দিয়েছেন, স্নেহ করেছেন। তিনিই আমার মনে এই আত্মবিশ্বাস এনে দিয়েছিলেন যে, আমার দ্বারা কিছুই অসম্ভব নয়।

আজ সে সব দিনের কথা ভাবলে চোখে জল আসে, এমনভাবে স্নেহ করবার, ভালোবাসবার মতো আপনজন তো জীবনে খুব বেশী আসে না।

ভাঙা-গড়ার কবি

গুরুদাস ভট্টাচার্য

কাজী নজরুল ইসলামের দেশপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে। অগ্নিবীণার কবিকে এক নজরে ভাঙনের কবি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সৃজন-প্রলয়ের সংগমিত পূর্ণ দৃষ্টি তাঁর পূর্বাবধি প্রকাশিত। একদিকে তিনি বলেন :

'মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।
আমি মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর।'

অন্যদিকে শোনান :

'যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত॥'

আবার একই পংক্তিতে দু'টি কথা :

'আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস',

কিংবা,

'মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।'

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই কবির কবিতায় ভাঙন-গড়নের সমন্বয় ফুটে উঠেছে। 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'আজ সৃষ্টিসুখের উল্লাসে', 'প্রলয়োল্লাস', 'রক্তাম্বর-ধরিত্রী মা', 'আগমনী' 'জাগৃহি', 'তূর্যনিনাদ', 'মরণ-বরণ', 'যুগান্তরের গান' প্রভৃতি কবিতা তার দৃষ্টান্তস্থল।

নজরুলের দেশাত্মবোধক কবিতার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর সাম্যবাদী সুর। মানুষকে মনুষ্যত্বের নিরিখে যাচাই করতে চেয়েছেন তিনি, বাইরের কোনো মিথ্যা পরিচিতির তকমা দিয়ে নয়। খোলসকে অস্বীকার করে অন্তরের পরিচয়কে ভালোবেসেছেন কবি মানুষে-

মানুষে কৃত্রিম ভেদাভেদকে তীব্রতম ভাষায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে চোখের জলে মনের জ্বালায় প্রকাশ করেছেন বার বার। 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া'—এমন কবিতা বাংলা সাহিত্যে চমকপ্রদ নিশ্চয়ই। গভীর সুর যেখানে, সেখানে কী অসীম আন্তরিকতা :

'হিন্দু না ওরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন ?
কাণ্ডারী ! বল, ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র !'

তাঁর চোখে নর ও নারীর পার্থক্য নেই, সাম্প্রদায়িকতার বহু ঊর্ধ্বে উঠে বলেন :

'গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'

মহাভারতের ভীষ্মও এই কথা বলেছিলেন অনেক হাজার বছর আগে। কিন্তু আধুনিক কবি চেনেন আধুনিক জগৎকে, এখানকার স্বার্থ, লোভ ও মনুষ্যত্বহীনতাকে। তাই এগিয়ে বলেন :

'ভেঙে ফেল্ ঐ ভজনালয়ের যতো তালা-দেওয়া দ্বার।
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায়, কে দেয় সেখানে তালা
সব দ্বার এর খোলা রবে, চালা হাতুড়ি শাবল চালা !'

নজরুলের জাতীয় কবিতার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য সমাজতান্ত্রিক চেতনা। জনগণের প্রতি আন্তরিক দরদই তাঁকে সমাজতান্ত্রিক চেতনার কাছাকাছি নিয়ে গেছে। নজরুল জনতার কবি। কণ্ঠে তাঁর :

'গাহি তাহাদের গান
ধরণীর হাতে দিলো যারা ফসলের ফরমান।'

শ্রম-কিণাঙ্ক-কঠিন যাদের মুঠিতলে ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয়, তাদেরই 'জীবন বন্দনা' কবি রচনা করে গেছেন। তাদের হয়ে অভিযোগ করেছেন, প্রতিবাদ করেছেন, প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন।

নজরুল-কবিতার চতুর্থ বৈশিষ্ট্য—সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি

অকুণ্ঠ দরদ ও পক্ষপাতিত্ব। রবীন্দ্রনাথের মতোই তিনি যৌবনকে, প্রাণকে সকল বাধাবন্ধনের জরা-শাসনের অতীত বলে মনে করতেন। সত্যরক্ষার ও যৌবনের যাচাইয়ের জন্য তিনি নিজেকে ও সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন—'আয় বেহেশতে কে যাবি আয়।' এবং 'যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার বাঁচি।' আপাত-অন্ধকারের মধ্যে দেখতে চেয়েছেন আগামী আলোর দিনকে। হিন্দু-মুসলমানের সঙ্ঘাতকে ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে পরিণত করতে চেয়েছেন :

'করুক কলহ—জেগেছে তো তবু—বিজয়-কেতন উড়া !
লেজে যদি তোর লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া !'

নজরুল-রচনার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য—সহজ স্বাভাবিক ও দৃঢ় বলিষ্ঠতা। যাঁর নিজের জীবনে কোনো ছন্দ ছিলো না, তাঁর কাব্যেও কোনো বাঁধাধরা বিধিবিধান মানতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ একদা বলেছিলেন—'পাগলামি! তুই আয়রে দুয়ার ভেদি।' নজরুল সেই মূর্তিমান পাগলামি, তাঁর কাব্য প্রাণের মাতন। দেশের বুকে যখন সাম্প্রদায়িক রেষারেষি, কবির কাব্যে তখন চরম অসাম্প্রদায়িকতা। ইসলামী পুরাণ আর হিন্দু পুরাণের যতো বীর আর অবতার' দেব আর দেবী তাঁর কাব্যে একই পংক্তিতে পাশাপাশি প্রতিবেশী ; সংস্কৃত শব্দ ও ফার্সী শব্দ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়।

কাজী সাহেবের কথা

যূথিকা রায়

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে আমি প্রথম দেখি ১৯৩৩ সালে বরাহনগরে, শ্রীজ্ঞানরঞ্জন সেনগুপ্তের বাড়ীতে। ওখানে প্রতি রবিবার আমি জ্ঞানবাবুর কাছে গান শিখতে যেতাম।

গ্রামোফোন কোম্পানীতে আমার গান রেকর্ড করবার জন্য আমার বাবার খুবই ইচ্ছা ছিলো। বাবার এই ইচ্ছা জ্ঞানবাবু জানতে পারেন, আর তিনিই আমার গান শোনাবার জন্য কাজী সাহেবকে তাঁর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন একদিন।

কবি নজরুল সেদিন আমার গান শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন, আর আমার গান যে রেকর্ড করার উপযুক্ত সে কথাও বলেছিলেন। এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়।

আমি প্রথম তাঁর গান রেকর্ড করি ১৯৩৬ সালে—'ওরে নীল যমুনার জল' আর' তোমার কালো রূপে থাক না ডুবে সকল কালো মম'—এই গান দু'খানি। এ ছাড়া 'মায়ের চেয়েও শান্তিময়ী' আর 'বনের তাপস কুমারী আমি গো'।

তারপর আমি কবির অনেক গান রেকর্ড করেছি। নানা ভাবের গান। ভক্তিমূলক, শ্যামাসঙ্গীত, কীর্তন, আধুনিক ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ঠাকুর ও স্বামীজী সম্বন্ধে কাজী সাহেব দু'খানি ভক্তিমূলক গান রচনা করেছিলেন। গান দু'টির প্রথম কথা এই—'পরমপুরুষ সিদ্ধযোগী মাতৃভক্ত যুগাবতার' ও 'জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর'। ঠাকুরের বিশেষ উৎসব উপলক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীতে কবির লেখা এই গান দু'টি আমি রেকর্ড করি ১৯৩৭ সালে।

ঘরোয়া মানুষ হিসাবে তাঁকে আমার খুবই সহজ সরল সুন্দর

নিরহঙ্কার আনন্দময় শিশুর মতো মনে হয়েছে। আনন্দে উল্লাসে যখন কবি হাসতেন, সেই হাসির তরঙ্গে যেন আকাশ বাতাস ভরে উঠতো। এমন প্রাণখোলা হাসি আমি আর কোথাও শুনিনি। তাঁর এই সরল সুন্দর ও উদার স্বভাবের দু'একটি ঘটনা বলছি।

দমদমে, গ্রামোফোন ষ্টুডিওতে যখন আমি রেকর্ড করতে যেতাম, কাজী সাহেবও প্রায়ই আসতেন রেকর্ডিং এর সময়। সারা ষ্টুডিও ঘরে মহা আনন্দে ঘুরে বেড়াতেন আর নানাভাবে আমাদের উৎসাহ দিতেন। যখন টেষ্ট রেকর্ড সোনা হতো, কবি কনট্রোল রুম থেকে ছুটে এসে গ্রামোফোনের কাছে দাঁড়িয়ে একমনে শুনতেন। যেখানে তাঁর ভাল লাগতো আনন্দে মাথা নেড়ে বাঃ বাঃ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রশংসা করতেন। তাঁর এই আনন্দ উৎসাহে আমাদের সকলের উৎসাহ আরও অনেক বেড়ে যেতো। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা কাজে সফল হয়ে উঠতাম।

একবার আমার মা কবিকে বলেছিলেন, যূথিকা ছোটো মেয়ে, ওকে আপনি ছোটো মেয়ের গাইবার মতো গান দিলে ভালো হয়।' কাজী সাহেব এ কথা শুনে মাকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্য অনুরোধ করেন।

মা যখন কবির বাড়ী যান, তখন তিনি তাঁর অনেকগুলি গানের খাতা মায়ের সামনে এনে বললেন, 'এই আমার সমস্ত খাতা আপনাকে দিলাম, এর ভেতর থেকে যে গানগুলি পছন্দ হয় আপনার মেয়ের জন্যে নিতে পারেন।'

তাঁর এই উদার মনোভাব ভোলবার নয়।

অনেক সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর ঘরে বসে কবির গান লেখা ও সুর তৈরী করার সুন্দর দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। কবি যখন তন্ময় হয়ে বসে সুর করতেন বা গান লিখতেন, তখন মনে হতো কোনো সাধক সৃষ্টির আনন্দে ভাবের ঘোরে কোথায় যেন ডুবে আছেন। সে পরিবেশ ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি নিঃশব্দে সে দৃশ্য দেখে কবির প্রতি আমার প্রণাম জানাতাম।

আমাদের ছাত্র নজরুল

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

আমি তেইশ বৎসর বয়সে মাথরুন উচ্চ ইংরাজী স্কুলে শিক্ষক হিসাবে ঢুকি।...নজরুল কলিকাতায় আমাকে জানায় যে, সে আমার স্কুলের ছাত্র এবং ভক্তিভরে প্রণাম করে।

আমি শুনিয়া আনন্দিত হই ও গৌরব বোধ করি।

তখনকার দিনে 6th Class-এ নজরুল পড়িত। ছোট্ট সুন্দর ছনছনে ছেলেটি, আমি ক্লাস পরিদর্শন করিতে গেলে সে আগেই আসিয়া প্রণাম করিত। আমি হাসিয়া তাহাকে আদর করিতাম।

সে বড়ো লাজুক ছিলো, হেডমাষ্টারকে অত্যন্ত সম্ভ্রমের সহিত দেখিত। ছোটো ছেলে কাছে আসিতে সাহসী হইত না, সে নিজেই আমাকে এ কথা বলিয়াছে।

শিশুকালেই তাহার ব্যবহার ও কথা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলো। ক্লাসের ছেলেরাও সকলে তাহাকে ভালোবাসিত।

সে স্কুলে বেশীদিন ছিলো না। বোধ হয় 4th Class (Class—vii)-এ উঠার আগে কি পরে অন্যত্র যায়।

আজ যাঁকে বেশি প্রয়োজন ছিলো　　পরিমল গোস্বামী

কবি কাজী নজরুল ইসলাম সৈন্যের পোশাক ছেড়ে বাংলাদেশে যখন ফিরে এলেন, তখন তাঁর বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। এই বয়সের এক তরুণ যুবক কবিতায় এক নতুন বিদ্রোহের সুর এনে দারুণ আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিলেন, এ এক আশ্চর্য ঘটনা। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত যুদ্ধ-ক্লান্ত ইউরোপ ঠিক এই সময়ে, (১৯১৮তে বা পরে) শান্তির বাণী, যুদ্ধবিরোধী বাণী শুনতে যখন উদ্‌গ্রীব, সেই সময়ে এই চির-আধমরা বাংলাদেশে কবি নজরুল আনলেন সকল শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করার বাণী। ('বিদ্রোহী' রচনার সময়ে (১৯২১) কবির বয়স একুশ বছর মাত্র।)

এই সময়ে কবি আপন শক্তির সন্ধান পেয়েছেন। 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'—এই 'সহসা'র তাৎপর্য কি? এ কি যুদ্ধের শিক্ষা নিতে নিতে মনের কোনো অবস্থান্তর? এ রকম হওয়া অসম্ভব নয়। রণক্ষেত্রের মাঝখানে তখন তিনি। রাইফেল ও অন্যান্য শিক্ষা সমাপ্ত, তখন তিনি হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম। এ সময় করাচীতে থাকতে এই যুদ্ধের ভয়াবহতা, অত্যাচারী শক্তির নিষ্ঠুরতার ছবি তাঁর কল্পনায় ফুটে ওঠেনি? কবির মনটি তো যুদ্ধের শিক্ষা নিতে নিতে নষ্ট হবার নয়। হয়তো কখনো তাঁর মনের গহনে অত্যাচারী বর্বর মানুষের ছবি নাড়া দিয়ে থাকবে। যুদ্ধে শত্রু হত্যার ক্ষমতা কবি লাভ করেছেন, আত্মশক্তি তাঁর মনে জেগে উঠেছে এবং তাঁর স্পর্শচেতন কবি-মন সে নবলব্ধ শক্তির সাহায্যে ভবিষ্যতে কি করবেন তারও একটা আভাষ তাঁর মনে চকিতে দেখা দিয়েছে এবং যুদ্ধ প্রস্তুতির পরিবেশে তা হয়তো মিলিয়ে গেছে। তারপর তা আবার নতুন

করে জেগে উঠেছে দেশে ফিরে আসার পর। এই সমস্ত উপলব্ধি এবং কল্পনা মিলিয়ে তাঁর বিদ্রোহী কবিতার জন্ম। অবশ্য এটি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস।

তিনি সৈনিক শিক্ষা পেয়েছেন, যুদ্ধের অবসান ঘটেছে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হয়নি তাঁকে, কিন্তু সৈনিকের আদর্শ, সৈনিকের বৃত্তি তাঁর রক্তে মিশেছে। তিনি আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠেছেন, 'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ!!'—এবং এই চেনার অর্থ যুদ্ধের বর্ম তিনি গা থেকে আর খুলবেন না, যুদ্ধ চলবে এখন দেশের ভিতরে যারা অত্যাচারিত তাদের পক্ষ দিয়ে, অত্যাচারী মানুষের বিরুদ্ধে। এবং যতদিন না এই অত্যাচারের অবসান তিনি ঘটাতে পারবেন, ততদিন তাঁর সংগ্রাম শেষ হবে না।

'মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ
ভীম রণভূমে রণিবে না।
বিদ্রোহ রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হবো শান্ত।'

এই শপথের মধ্যে কৃত্রিমতার লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্তরের গভীরতম দেশ থেকে এর প্রেরণা। এবং পড়তে বসলে এর ধ্বনি পাঠকের মনকে আনন্দে গর্বে উদ্বেল করে তোলে। এর তেজ আগুনের মতো পাঠকমনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়, এ যেন যুদ্ধের বিউগল ধ্বনি, কবির সঙ্গে এই সংগ্রামে অংশ গ্রহণে অনুপ্রাণিত করে। এ জাতীয় কবিতা সব সময়েই প্রেরিত কবিতা, ইনসপায়ার্ড কবিতা, এর যোল আনাই অন্তরের সুর। এই প্রেরণার মুহূর্তে একমাত্র কবির মর্মবাণীই ধ্বনিত হওয়া সম্ভব।

বিদ্রোহী কবিতা কবির প্রথম আত্মোপলব্ধিজাত কবিতা। এ কবিতা তাঁর মনে প্রবেশের প্রথম দরজা। কবি কোন্ বাণী নিয়ে নিজেকে প্রকাশ করলেন তার পরিচয় আছে এ কবিতায়। তাঁকে এখন আর কোনো বন্ধনে বাঁধতে পারবে না, সকল প্রথা ও আচারের ঊর্ধ্বে তিনি, যোদ্ধা তিনি, বিরাট শক্তিধর তিনি, আত্ম উপলব্ধি, আত্মসম্মানবোধে মহীয়ান তিনি—তাই তিনি সদা উন্নতশির ঋজুদণ্ডী। তাই তিনি বলতে পারেন, 'আমি আপনারে ছাড়ি করি না কাহারে কুর্নিশ'। তাঁর স্থান সবার ঊর্ধ্বে। তাই তাঁর আত্মশক্তি-বিশ্বাস-জাত দ্বিধাহীন সমালোচনার অধিকার:

'তোদের জাত ভগীরথ এনেছে জল
জাত-বেজাতের জুতো-ধোয়া।'

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে চাবুক এটি। ঠিক এই সুরেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের জাতিকে এককালে ধিক্কার দিয়েছিলেন। তিনি এই অর্থহীন আচারসর্বস্বতার বিরুদ্ধে বলেছিলেন—'ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন-রাত ঘামতে চায় তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া জুতোখেকো।'...

সমাজকল্যাণ বিষয়ে মনে আগুনের জ্বালা না থাকলে এমন ভাষা আসতেই পারে না।

কাজী নজরুল সুস্থ থাকলে আজকের দিনে আবার তাঁকে আজ অসমাপ্ত কাজে ফিরে পাওয়া যেতো সন্দেহ নেই। তাঁকে আজ অবশ্যই তাঁর প্রতিভা কোনো প্রতিষ্ঠানে বিক্রি করে করে সংসার চালাতে হতো না। বাজারের জন্য গান লিখতে হতো না, এ-কথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে আজ তাঁর সুস্থ থাকার প্রয়োজন ছিলো সব চেয়ে বেশি। দেশে যে ভেদবুদ্ধি মাথা তুলেছে, আবার যেমন অস্পৃশ্যতা একটু একটু করে দেখা দিচ্ছে, তাতে আমার বিশ্বাস তিনি সুস্থ থাকলে পূর্ণ শক্তি নিয়ে অন্তত সাম্প্রদায়িক বিভেদের মাঝখানে সেতু রচনা করতে পারতেন।

বিজ্ঞাপন রচয়িতা নজরুল   আবদুল আজীজ আল্-আমান

'মোসলেম ভারত' এর যুগে কবির আর একটি স্বরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—'বিজ্ঞাপন রচয়িতা' নজরুলের স্বরূপ। 'ডেয়ার্কিন অ্যাণ্ড-সন্' বাংলায় বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ব্যবসায়ী। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কিশোর কবিকে তাঁদের নির্মিত হারমোনিয়ামের একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিতে বলেন, কবি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যান এবং লেখেন আট লাইনের এই মনোরম বিজ্ঞাপন :

কি চান? ভালো হারমোনী?
কাজ্ কি গিয়ে—জার্মানী?
আসুন, দেখুন এইখানে
যেই সুরে, যেই গানে
গান না কেন, দিব্যি তাই
মিলবে আসুন এই হেথাই!
কিনবি কিন্
'ডেয়ার—কিন্'।

সে সময় পার্কসার্কাস এলাকায় 'বাহাদুর' নামে আর একটি বাদ্য যন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ছিলো। ডেয়ার্কিনের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও কবির কাছে ছুটে এলেন। একই অনুরোধ—তাঁদের প্রতিষ্ঠানে নির্মিত 'বাহাদুর' হারমোনিয়ামের বিজ্ঞাপন লিখে দিতে হবে। কবি এবারেও লিখলেন আট লাইনের কবিতা—'বাহাদুর'-এর চমৎকার বিজ্ঞাপন :

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান তো কিনুন 'বাহাদুর'।

দু'দিন পরে বলবে না কেউ—'দুর-দুর'
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর ॥
করতে চান কি মনের প্রাণের আহা দূর ?
একটি বার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর'।
যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরীন ভরাট
বাহা সুর।
চিনুন, কিনুন 'বাহাদুর' ॥

এ দুটো বিজ্ঞাপনই 'মোসলেম ভারত'-এর অনেকগুলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিলো। আমি দ্বিতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দু'টি একত্রে দেখেছি। নজরুল কোনো এক কেশ তৈলের উপর একটি সুন্দর বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন—কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

আমাদের কাজীদা

সারদা গুপ্ত

তখনো কাজীদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ আলাপ হয়নি। তা না হলেও কোনো ক্ষতি অনুভব করছিলাম না। কাজীদার সঙ্গে আলাপ হবার আগেই নলিন'দার [নলিনীকান্ত সরকার] কাছে তাঁর দেশাত্মবোধক গানগুলি শিখে নিয়েছিলাম পরম নিষ্ঠার সঙ্গে।

দেশের তরুণ-যুবক সকলের মুখেই তখন বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের নাম।

দূর থেকে কাজীদার মূর্ত বিদ্রোহের আভা, আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজাল ভেঙে মানুষকে নতুন-চেতনায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সেই সব বাণী আমার সেই কিশোর মনেও এসে ধাক্কা দিলো, এক অনাস্বাদিত সাড়া জাগালো সারা মনে প্রাণে।

তাই কাজীদার অন্তরঙ্গ বন্ধু আমার সঙ্গীত সাধনার পথপ্রদর্শক জেনেও কাজীদার সঙ্গে আলাপ করতে যাওয়ার কথা মনে হলো না। শুধু কাজীদার সুরে সুর মেলাবার জন্য তাঁর জ্বালাময়ী দেশাত্মবোধক গানগুলিই শিখে নিলাম নলিন'দার কাছে। সেই বয়সেই আমি নানা জলসায়-সঙ্গীতানুষ্ঠানে গান গাইছি। এবার গাইতে শুরু করলাম কাজীদার এই সব গান।

তারপর একদিন হঠাৎই তিনি আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির হলেন।

কার সঙ্গে ?

কার সঙ্গে আবার, যাঁর হাত ধরে অনেক নতুন পরিবেশে নতুন মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন কাজীদা, সেই নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে।

ব্যাস, হয়ে গেলো ; ওই একদিনই সঙ্গী করে পথ চিনিয়ে নিয়ে

আসার অপেক্ষা। তারপর কাজীদা নিজেই নিলেন স্থায়ী আসন করে আমাদের বাড়ীর এই গানের ঘরোয়া-দরবারে।

আর এ আসন শুধু আমাদের বাড়ীর গানের দরবারেই নয়, আমাদের মনেও।

এতোদিনে, দূরের মানুষ কাজী নজরুল ইসলাম, ঘরের মানুষ কাজীদা হলেন আমার।

রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু' বলে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিনি যেন আমাদের আঁধার ঘরে এসেই অগ্নিসেতু বেঁধে দিলেন।

শুধু একটি হারমোনিয়াম পাওয়ার অপেক্ষা। তারপরেই চললো তাঁর গান, গান আর গান। সুরের আকাশ ভরিয়ে দিলেন কাজীদা তাঁর উদাত্ত দরাজ ভরাট গলার আওয়াজে।

কাজীদা এলে সারা পাড়ার মানুষ জেনে যেতো যে, ওদের বাড়ী কাজী নজরুল ইসলাম এসেছেন। যেন একটা অদৃশ্য ঝোলায় করে অপর্যাপ্ত হাসি আর আনন্দের রঙমশাল নিয়ে আসতেন কাজীদা। জীবনের অফুরন্ত আনন্দস্রোতে তিনি নিজেও গা ভাসিয়ে দিতেন, আর সঙ্গী হয়ে যারা থাকতো তাদেরও নিয়ে চলতেন ভাসিয়ে।

কতোদিন দেখেছি একটি হারমোনিয়াম আর পান-জর্দা নিয়ে ঘন্টার পর ঘণ্টা গান গেয়ে আর গান শুনে কাটিয়ে দিয়েছেন তিনি। কোথায় ভেসে গেছে তাঁর জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট আর প্রয়োজনীয় কাজ। একাই একশো হয়ে কাজীদা সকলকে মাতিয়ে রেখেছেন।

নিজের আলোয় অপরকে উদ্ভাসিত করতে পারেন, এমন যে ক'জন মানুষের সান্নিধ্যে আমি এসেছি, কাজীদা তাঁদের শিরোমণি।

বহুদিন আমি ভেবেছি, এতো মুক্তি-প্রতীক আকাশের মতো নির্মল হাসি-আনন্দ কাজীদা কোথা থেকে আহরণ করে আনেন? কোথা থেকে নিয়ে আসেন এতো হাসির ঝর্না-ধারার টুং টাং ছন্দ?

বাল্যস্মৃতির একপাতা

কাজী সব্যসাচী

আজও স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে 'বিদ্যাপতি'র নতুন রেকর্ডগুলো বাবা বাড়ীতে নিয়ে এলেন, সেদিন সমস্ত পালাটা শুনেছিলাম। আমি আর নিনি [ছোটো ভাই কাজী অনিরুদ্ধ] স্কুলের ছুটির পর খেলতেও যাইনি, আর কেন জানি না, গান শুনে, খালি কেঁদেছিলাম।

আজ বাবার লেখা সেই 'বিদ্যাপতি' পালা আমাদের কাছে নেই। থাকলে, আজও বার বার শুনতাম আর কাঁদতাম। কী অপূর্ব গান, কী অপূর্ব দরদী অভিনয়! অদ্ভুত-সঙ্গীত-পরিচালনা। দারুণ ভালো হয়েছিলো সাউণ্ড এফেক্ট।

ভুলবো না - কিছুতেই ভুলবো না।

'বিদ্যাপতি' পালাতে বিদ্যাপতি হয়েছিলেন ধীরেন দাস, গানে ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। রানী লছমী—প্রভা দেবী, গানে—হরিমতি দেবী। রাজা শিব সিংহ—রবি রায়, ধনঞ্জয়—রঞ্জিত রায় এবং 'অনুরাধা' হয়েছিলেন সরযূবালা দেবী, তাঁর কণ্ঠের গানগুলিও গেয়েছিলেন হরিমতি দেবী। বিজয়া কে হয়েছিলেন তা এখন আর মনে করতে পারছি না।

একমাত্র সরযূবালা দেবী ছাড়া এঁদের কেউই আজ আর নেই—কিন্তু যতদিন আমি বেঁচে থাকবো, সেই গান সেই অভিনয় আমার হৃদয়ে বার বার ঝংকৃত হতে থাকবে। যাঁরা নেই তাঁরা আমার কাছে আবার ফিরে আসবেন।

নজরুলের ধূমকেতু

আবদুল হালিম

নজরুলের 'ধূমকেতু' বাংলার সাহিত্যাকাশে অকস্মাৎ আবির্ভূত হয়ে বাংলার তরুণ সমাজ ও সাহিত্যসেবীদের ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতনই বিস্মিত করে দিলো। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ জানালেন:

'আয় চলে আয়রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের ঐ দুর্গ শিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।'

'ধূমকেতু' অফিসে কবিকে ঘিরে আমাদের মজলিশ বসতো। কবি ও সুসাহিত্যিক মোহিতলাল মজুমদার, কবি যতীন বাগচী, যতীন সেনগুপ্ত প্রমুখ নজরুলের অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও 'ধূমকেতু' অফিসে তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন। কিন্তু আমাদের মতো ছন্নছাড়া ভবঘুরে বাঁধনহারাদের মজলিশ জমে উঠতো নজরুলকে কেন্দ্র করে। নৃপেন চ্যাটার্জি, শান্তি সিংহ, অমরেশ কাঞ্জিলাল, দুদু মিঞা এবং আরো অনেকে আসরে যোগ দিতেন। পবিত্রদা, নলিনী সরকার (গায়ক), নলিনী সেনগুপ্ত (নাট্যকার), হাস্য-রসিক দাদাঠাকুর (কবি শরৎ পণ্ডিত) 'ধূমকেতু'র আসরে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন। সাহিত্যের প্রতি তাঁদেরও ছিলো অফুরন্ত ভালোবাসা, প্রগাঢ় উৎসাহ। নজরুল তাঁর কবিতা ও গানে আমাদের সবারই অন্তরে প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগাতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতো দরাজ গলায় নজরুলের গান, নয়তো, 'বিদ্রোহী' 'ধূমকেতু', 'কামালপাশা' প্রভৃতি বিপ্লবী কবিতার আবৃত্তি। বিদ্রোহী ভঙ্গিমার 'বিদ্রোহী'র আবৃত্তি নজরুলকে বিপ্লবী নায়করূপে মূর্ত করে তুলতো। কবির সুডৌল বলিষ্ঠ

দেহ, বড়ো বড়ো বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখ, মাথায় রুক্ষ দোলায়মান লম্বা চুল ; সহাস্য মুখ, দীর্ঘ ঢিলা পিরান, পীত শিরস্ত্রাণ, গৈরিক বেশ, হাতে বেণু কবিকে মহিমান্বিত করে তুলতো, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে নজরুলের এতটুকু ক্লান্তি ছিলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, গান ও কবিতায়। কাপের পর কাপ চা শেষ হচ্ছে। নজরুলের মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটছে, কলহাস্যে মজলিশ মুখরিত, আহার নেই, নিদ্রা নেই, কবি তাঁর ছন্দ দোলায় গান ও কবিতা রচনা করে চলেছেন, শত কোলাহলের মধ্যেও তাঁর লেখনী স্রোতের মতো বেগবান—কতো বিনিদ্র রজনী তাঁর এইভাবে কেটে যেতো। ছিলো না তাঁর এতটুকু জাড্য বা ক্লান্তি।

নজরুলের একমাত্র নেশা ছিলো চা ও পান এর। বিদ্রোহী কবি 'ধূমকেতু'র মারফতে বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে নতুন ইতিহাস রচনা করলেন। তাঁর বিপ্লবী কবিতা, তাঁর অমর কণ্ঠের গান, তাঁর সুর-লহরী, তাঁর আবৃত্তি বাংলার বিপ্লববাদী তরুণদের প্রাণে নতুন উদ্দীপনা, দেশপ্রেরণা, আত্মবিস্মৃতি ও উন্মাদনার সৃষ্টি করলো। অজ্ঞাতকুলশীল নজরুল তখন আর শুধু সৈনিক কবি হাবিলদার নজরুল নন, তিনি তখন তরুণ বাংলার 'বিদ্রোহী' কবি নজরুল। নজরুলের 'ধূমকেতু'র স্থান ছিলো বাংলার অগ্নিঋষি বারীন ঘোষের 'বিজলী' ও উপেনবাবুর 'আত্মশক্তির'ও উপরে।

রবীন্দ্র কাব্যের ঐতিহ্যে মানুষ হলেও আমার জীবনে নজরুল ইসলামের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো ১৯৩৪-৩৫ সালে। বাংলা সাহিত্যের আকাশে রবীন্দ্রনাথ তখনও দেদীপ্যমান সূর্য। তবু এরই মধ্যে নজরুল ইসলামের কবিতার কিছুটা ভিন্ন সুর, তাঁর তেজোদীপ্ত প্রকাশভঙ্গী, তাঁর ভাব ও ভাষার স্বকীয় বলিষ্ঠতা এবং সর্বোপরি তাঁর কবিতার অন্তর্নিহিত জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম আমার মতো অনেক তরুণের মনেই যে আগুন জ্বালিয়েছিলো—এ বিষয়ে সংশয় নেই। তাঁকে সশরীরে দেখার একটা উদগ্র আগ্রহও ছিলো মনে মনে। কিন্তু সে আগ্রহ মিটতে সময় লেগেছিলো আরও অন্ততঃ সাত-আট বৎসর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়—তখন শিক্ষাজীবন শেষ করে 'দৈনিক কৃষক' পত্রিকার সম্পাদকীয় দপ্তরে যোগ দিয়েছি। এই সময় মৌলভী ফজলুল হকের নেতৃত্বে দৈনিক 'নবযুগ' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং কিছুদিনের জন্য কবি নজরুল ইসলাম এই পত্রিকার সম্পাদকীয় দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর কোনো কোনো সম্পাদকীয় পুরোপুরি কবিতাতেই তিনি লিখতেন। সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে। বলা বাহুল্য তাঁকে প্রথম দেখেও আমার আশাভঙ্গ হয়েছিলো। কবিতা পড়ে তাঁর একটা মূর্তি নিজের মনে মনে কল্পনা করে রেখেছিলাম। আমার কল্পনার সঙ্গে তাঁর বাস্তব দেহাবয়বের মিল ঘটলেও তাঁর পোশাক-আশাক দেখে আমার মন ভরেনি। তাঁকে যে সময় আমি প্রথম দেখি, তখন তিনি গেরুয়া রঙের পোশাকধারী। এ যেন বিপ্লবী কবির দলে এক ত্যাগব্রতী সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসীর রূপ। সুতরাং

আশাভঙ্গ হওয়া আদৌ বিস্ময়কর ছিলো না। পরে অবশ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কবিজীবন পড়ে তাঁর জীবনের বহু সংগ্রাম, বহু বেদনা ও বহু রূপান্তরের কথা জেনেছি।

নজরুল ইসলামের কবিপ্রতিভা বহুমুখী ও বিচিত্র পথগামী হলেও সে যুগে তরুণ সমাজের কাছে তাঁর সমধিক খ্যাতি ছিলো বিপ্লবী কবি বলে। আর তাঁর জীবনে এটা শুধু কথার কথা ছিলো না এবং তিনি শুধু কাব্যরচনাতেই বিপ্লবী ছিলেন না—বিপ্লব ছিলো তাঁর ধমনীতে। তার মূল্যও তাঁকে জীবনে দিতে হয়েছে। সেজন্য অবশ্য তিনি অনুতাপ করেন নি কিংবা সাময়িক লাভের লোভে স্বধর্মচ্যুত হন নি। তিনি গেয়েছেনঃ 'বলো বীর। বলো উন্নত মম শির।' এ শুধু কবিতার কথা নয়—এ তাঁর অন্তরের কথা এবং নিজের জীবনে তিনি বার বার এই স্বাতন্ত্র্য ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে গেছেন। অনেক বাধার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন, খামখেয়াল ও দারিদ্র ছিলো তাঁর নিত্য সঙ্গী। কিন্তু বেপরোয়া নজরুল ইসলাম সেজন্য কুণ্ঠিত ছিলেন না এবং সেজন্য কোনোদিন কারও কাছে তিনি নতি স্বীকার করেন নি।

এই একটি ক্ষেত্রে নজরুলের জীবন ও কাব্য এক। নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে সমাজ ও মানুষের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা তাঁর কবিতাগুলিকে নানা রঙে রাঙিয়ে তুলেছে। তিনি শুধু কবিই ছিলেন না—তিনি ছিলেন দেশসেবক ও সমাজ সংস্কারক। পরাধীন দেশের অসহ দারিদ্র ও লাঞ্ছনা, আমাদের সমাজের নানা জাতীয় ভণ্ডামি ; ধর্মের নামে, রাজনীতির নামে নানা ধরনের শোষণ প্রয়াস নজরুল ইসলামের কবি-মনকে প্রায় ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো এবং তারই বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ফণিমনসা', 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের উদ্দীপনামূলক ও ঝাঁঝালো কবিতাগুলিতে। এগুলি নিছক কবিতা নয়—এগুলি কবির জীবনের তাজা রক্ত দিয়ে লেখা। কবির ভাষায় বলতে গেলে

বলতে হয় : 'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা। তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা।' কবির উক্তির মধ্যে আদৌ কোনো অতিরঞ্জন নেই। পূর্বেই বলেছি নজরুল শুধু কবিতায় বিপ্লবী ছিলেন না, তিনি ছিলেন জীবনেও বিপ্লবী এবং এই বিপ্লবের উন্মাদনায় দেশমাতৃকার সেবা করতে গিয়ে দারিদ্রের অসহ যন্ত্রনা হাসিমুখে বরণ করে নিতে তিনি যেমন কুণ্ঠিত হন নি তেমনিই কারাবরণ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। একাধারে বিপ্লবী সত্তা ও স্পর্শকাতর কবি-মনের অধিকারী নজরুল ইসলামকে তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় না। তাঁর বহু কবিতায় বুদ্ধির চেয়ে হৃদয়াবেগের জোয়ার বেশি এবং ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন হৃদয়াবেগপ্রবণ মানুষ। মানুষের দুঃখ ও দারিদ্র দেখে মৌখিক সহানুভূতি জানিয়ে চুপ করে বসে থাকার লোক ছিলেন না—সে অবস্থার সম্মুখীন হলে দুঃখ দারিদ্রপীড়িত মানুষের অভাব মোচন করতে গিয়ে নিজের শেষ সম্বল পর্যন্ত তিনি অকাতরে দান করতেন।

কবিতা এবং গানই ছিলো প্রাণোচ্ছল নজরুল ইসলামের বলিষ্ঠ জীবনের একমাত্র সহায়। তিনি কবিতাকেই নিপীড়িত জনগণের সংগ্রামে তাঁর হাতিয়ার করে তুলেছিলেন। এ কাজ ভালো হয়েছিলো, কি খারাপ হয়েছিলো, তার সূক্ষ্ম বিচার করবেন আজকের এবং ভাবী যুগের সাহিত্য সমালোচকগণ। আমি এখানে শুধু আমার উপলব্ধ একটি সত্যকে তুলে ধরেছি। একমাত্র বিংশ শতাব্দীর বাংলা দেশে নয়, বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষেও নজরুল ছিলেন একমাত্র জনগণের কবি এবং তারই ফলশ্রুতি স্বরূপ নিজের নাতিদীর্ঘ কবি-জীবনে জনপ্রিয়তার শীর্ষদেশে উঠেছিলেন তিনি। নিপীড়িত নির্যাতীত মানুষের কথা যেভাবে তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, ইদানীং কালের আর কোনো কবির কবিতায় তার পরিচয় আমরা পাই না। যতদিন পৃথিবীতে দারিদ্র দুঃখ থাকবে, নিপীড়ন নির্যাতন থাকবে এবং সামাজিক বৈষম্য, অনাচার প্রভৃতি থাকবে, ততদিন নজরুল ইসলামের এই সব কবিতার আবেদনও কমবে না—এই আমার বিশ্বাস।

সাধক কবি নজরুল

রমা চৌধুরী

দেশের গৌরব, পরম শ্রদ্ধেয় কাজী নজরুল ইসলাম প্রকৃতিপক্ষে সাধক। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যশ্লোক সাধকদের মতই তিনিও জগতের ও জীবনের অন্তর্নিহিত সত্যকে উপলব্ধি করার সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে ধন্য হয়েছিলেন।

তাঁর ধর্ম দর্শনমূলক কাব্যকৃতির প্রতি পংক্তিতে পংক্তিতে এই সত্যটি প্রকটিত হয়ে রয়েছে মধুরতম মহিমায়। কী স্থির বিশ্বাসভরে, কী ধীর আনন্দ উচ্ছুসিত অন্তরেই না তিনি বারংবার বলেছেন গভীর ভাবাবেগের সঙ্গে :

(মা) একলা ঘরে ডাকবো না আর
দুয়ার বন্ধ করে।
(তুই) সকল ছেলের মা যেখানে
ডাকবো মা সেই ঘরে।

কিংবা

আয় অশুচি আয়রে পতিত,
এবার মায়ের পূজা হবে।
যেথা সকল জাতির সকল মানুষ
নির্ভয়ে মা'র চরণ ছোঁবে॥

* * *

(মা) সিংহ-আসন হতে নেমে
বসেছে দেখ্ ধূলির তলে।
(মা'র) মঙ্গলঘট পূর্ণ হবে
সবার ছোঁওয়া তীর্থজলে।

* * *

দীনের হতে দীন অধম যথা থাকে
ভিখারিণী বেশে সেথা দেখেছি
মোর মাকে।
(মোর) অন্নপূর্ণা মাকে॥
অহঙ্কারের প্রদীপ নিয়ে স্বর্গে
মাকে খুঁজি,
(মা) ফেরেন ধূলির পথে
যখন ঘটা করে পূজি॥

কী অপূর্ব এই সার্বজনীন উদার ভাব। এই তো হলো প্রকৃত ভারতীয় ভাবধারার অনুসরণ,—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকে, জীবের মধ্যে শিবকে উপলব্ধি করা, আরাধনা করা, সেবা করা।

কিন্তু কাজী নজরুল কেবল সাধারণভাবে ভারতীয়ই ছিলেন না, ছিলেন সেই সঙ্গে বিশেষভাবে বাংলার ভাবসাধনার উত্তরসাধক। বাঙালীর ধর্ম ও জীবনবোধের বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো। বাঙালীর এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম হলো জগজ্জননীকে অতি অনায়াসেই—'ঘরের দেখা, ঘরের মা'-রূপে পাওয়া, গৌণ অর্থে নয়, রূপক অর্থে নয়, জ্ঞানের দম্ভে বা নিছক কবির কল্পনাতেও নয়—মুখ্য ও আক্ষরিক অর্থেই সেই পাওয়া সত্য ও বাস্তব। জগজ্জননীকে নিজের মায়ের মতো একান্তভাবে পাওয়ার আকুতিই চিরকাল বাংলার কবি ও সাধকদের অনুপ্রাণিত করছে। বস্তুত এই 'মা'ই ছিলেন নজরুলের আধ্যাত্ম-সাধনাপুত জীবনের সর্বস্ব—তাঁর অন্য সব কামনা বিলীন হয়ে গিয়েছিলো মায়ের জন্য তাঁর আকুল আকুতির মধ্যে। এই ছিলো তাঁর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

নজরুল চরিত্রের দু'একটি দিক

আয়নুল হক খাঁ

কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমার সমসাময়িক এবং প্রায় সমবয়সী। কবি যখন কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে যথেষ্ট মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিলো। নজরুলের নেতৃত্বে যে কয়েকজন বুদ্ধিজীবি যুবক কলকাতায় ধর্মীয় গোঁড়ামীর এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে আমারও কিছুটা যোগ ছিলো। মাসিক 'সওগাত' ছিলো এঁদের আন্দোলনের মুখপত্র। কবি তখন হরিঘোষ স্ট্রীটে থাকতেন এবং মাসিক 'সওগাতে' তিনি নিয়মিত লিখতেন। ১১নং ওয়েলেসলি স্ট্রীটে 'সওগাত' অফিসে কবি প্রায় আসতেন, সেখানে আড্ডাও বসতো, আমিও সে আড্ডায় প্রায়ই যোগ দিতাম। কবির সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাঁর চরিত্রের যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে, তার দু-একটি এখানে নিবেদন করছি।

কবির ছিলো গতির প্রতি সীমাহীন আসক্তি। তিনি পারতপক্ষে ট্রামে যাতায়াত করতে চাইতেন না, বলতেন, 'ট্রাম টিকির টিকির করে থেমে থেমে চলে এটা আমার অসহ্য লাগে। ট্যাক্সি যখন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে তখন আমার মনও যেন এক অজানা দেশে পাড়ি দেয়, আমি তখন সংসারের অভাব-অনটনের কথা একদম ভুলে যাই।'

'সওগাতের' কর্তৃপক্ষ একসঙ্গে কবিকে বেশী টাকা দিতে পারতেন না, প্রত্যহ দশ টাকা পনেরো টাকা—এইভাবেই দিতেন। ট্যাক্সিতে যাতায়াতেই কবির প্রায় তিন-চার টাকা খরচ হয়ে যেতো।

কবির বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্রও প্রায়ই 'সওগাত' অফিসে আড্ডা দিতে আসতেন। তাঁদের উভয়েরই ফুটবল খেলা দেখার নেশা ছিলো

অসাধারণ। ফুটবল খেলার মরসুমে তাঁরা দুই বন্ধু এবং কখনো কখনো আরও দু-একজন ট্যাক্সি করে ময়দানে খেলা দেখতে যেতেন। খেলার পর আবার ট্যাক্সি করেই কবি বাড়ী ফিরতেন। হয়তো সেদিন কবি 'সওগাত' অফিস থেকে দশ টাকা পেয়েছেন তার অর্ধেকের বেশী যাতায়াত ও খেলা দেখতেই খরচ হয়ে গেলো। বাড়ীতে সেদিন হয়তো 'অগ্যভক্ষ ধনুর্গুণঃ, কবির সেদিকে খেয়াল নেই। সে সময় প্রধানতঃ 'সওগাতে' লিখেই তাঁর সংসার চালাতে হতো। আমরা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনি ট্যাক্সিতে এ টাকাটা অপব্যয় করেন কেন? এ টাকাটা বাঁচলে আপনার সংসারের অভাব কিছুটা দূর হতে পারে।'

তিনি জবাবে বলেছিলেন, 'আপনাদের কাছে অপব্যয় মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তা মনে হয় না। অনাহারে থেকেও ট্যাক্সিতে চড়ে প্রচুর আনন্দ পাই।'

গতির প্রতি কবির এই আসক্তির চরম পরিণতি লাভ করলো এর আরও কিছুদিন পর। আমরা শুনলাম, কবি নিজেই একটা মোটর গাড়ী কিনেছেন এবং একদিন তা দেখতেও পেলাম। আরও শুনলাম, কবি তাঁর ভালো ভালো কবিতাগুলির কপিরাইট ডি, এম লাইব্রেরীর মালিকের কাছে বিক্রি করে এই মোটরের টাকা সংগ্রহ করেছেন। এই কবিতাগুলি পরে 'সঞ্চিতা' নামে ঐ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ লাইব্রেরী হাজার হাজার খণ্ড 'সঞ্চিতা' বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হয়েছে। লোকেরা খেয়ালী কবির এটাকে কাণ্ডজ্ঞানহীনতার চরম নিদর্শন বলে মনে করলেন। কিন্তু শিশুর মত সরল কবি তাঁর ঈপ্সিত আশা পূর্ণ হওয়াতে পরম আনন্দ লাভ করলেন। কবি ভাড়া বাড়ীতে থাকেন, ভাড়াও নিয়মিত দিতে পারেন না, তাঁর নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কোনো আয়ের পথ নেই, অথচ কবি চমকালো মোটর গাড়ী চড়ে পরম আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু এ আনন্দও কবি বেশিদিন উপভোগ করতে পারেন নি। কিছুদিন পরেই আর সে গাড়ীতে চড়তে দেখিনি। বোধ হয় হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

কবি-চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিলো তাঁর চক্ষুলজ্জা, অন্য কথায় তাঁর মনের উদারতা। কবির বাড়ীতে আত্মীয়-অনাত্মীয়, ভক্ত ও তিন-চারজন বেকার বৎসরের পর বৎসর নিয়মিত থাকতো। তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কবিকেই করতে হতো। কবি কখনো তাদেরকে অন্যত্র চলে যেতে বলতেন না। এছাড়াও কবির বন্ধু-বান্ধব তাঁর বাড়ীতে মাঝে মাঝে গিয়ে আড্ডা জমাতেন। আহারের সময় হলেই কবি তাঁদের সবাইকে নিয়ে খেতে বসতেন। কোথা থেকে এদের খাবারের ব্যবস্থা হবে সে হিসাব কবির নেই। কবির শাশুড়ী ছিলেন একজন সুনিপুণা গৃহিণী, তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত ঠিক করে ফেলতেন। কবির বেহিসাবী আচরণের জন্য তাঁর শাশুড়ী অনেক সময় বেশ বিব্রত হয়ে পড়তেন।

কবির দু'টি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করলাম। কবির উল্লেখিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে কবিকে কম অসুবিধা ভোগ করতে হয়নি। বৈষয়িক দিক থেকে এগুলিকে চারিত্রিক দুর্বলতা বলা হয়ে থাকে। দুর্বলতাই হোক বা চারিত্রিক উদারতাই হোক, কবি নজরুল আমাদের সকলের প্রিয়। ইংরেজ কবি তাঁর দেশ সম্বন্ধে বলেছিলেন 'With all thy faults I love thee still.'

আমরাও আমাদের কবি সম্বন্ধে ঐ একই কথা বলতে পারি।

'কাজীদা'র গান শেখানো

বরদা গুপ্ত

কাজীদা তাঁর স্বরচিত গানে শুধু সুর যোজনা করেই থেমে থাকেন নি, নিজে সেই গান অক্লান্ত পরিশ্রমে শিখিয়েছেন সঙ্গীত-শিল্পীদের।

গান রচনা ও সুর যোজনা ছাড়া এই শেখানোর কাজে যে সময় তাঁর খরচ হয়েছে, সেই সময়গুলি অন্যত্র অন্যভাবে ব্যবহৃত হলে কাজীদা বাংলা দেশের কাব্য-সাহিত্য ভাণ্ডারে আরো অনেক মূল্যবান রত্ন জমিয়ে রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি।

কাজীদার এই গান শেখানোর পদ্ধতি আর সঙ্গীত-শিক্ষাগুরু হিসাবে তাঁর ব্যবহারটি অনুকরণযোগ্য। অনুকরণযোগ্য এই জন্যে বলছি যে, গান শেখাতে বসে কাজীদা যে অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত অধ্যবসায় আর বুক-ভরা ক্ষমা স্নেহ মায়া মমতায় নিজের দরাজ হৃদয়টি ভরিয়ে রাখতেন, তা যদি অন্য সকল শিক্ষকদের পক্ষে রাখা সম্ভব হতো, অনুকরণ করতে পারতেন কাজীদার এই প্রকৃতিটি, তাহলে তাঁদের ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারতো সহজে, অনেক নির্ভয়ে আর দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে উত্তীর্ণ হতে পারতো।

কাজীদা যাকে গান শেখাতেন, তাকে বুক-ভরা ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিতেন। কথায় গানে গল্পে হাসিতে শিক্ষার্থীর মনটিকে করে নিতেন খোলা মেলা নির্ভয়। শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে কাজীদার জুড়ি ছিলো না। 'ওর দ্বারায় এ কাজ হবে না, এ গান ও গাইতে পারবে না'—এ ধরনের কথাকে কোনোদিন কোনো সময়েই কাজীদা আমল দেননি। যা সম্ভব নয়, তা তিনি সম্ভব করেছেন যে যা পারবে না, পারবার কথা নয়,—তাকে দিয়ে তাই করিয়ে মনে অটুট আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছেন।

কোনো শিক্ষার্থী হেয় হয়, মনে দুঃখ পায়, অপমান বোধ করে, এমন ব্যবহার কাজীদাকে কোনোদিনই করতে দেখিনি।

গান শেখানোর কাজে ছিলো তাঁর অসীম ধৈর্য, অফুরন্ত, অধ্যবসায়।

একদিন দেখলাম কাজীদা একটি দুরূহ সুরের গান একজন শিক্ষার্থীকে শেখাতে বসেছেন, কিন্তু শিক্ষার্থী সেই ধরনের গান শেখার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই কাজীদা তাকে বার বার একই লাইন গেয়ে শোনানো সত্ত্বেও সঠিকভাবে সুর আনতে পারছে না। এমন কি, কাজীদার গাওয়া সুরের কাছাকাছিও যেতে পারছে না।

এতোবার এতোভাবে বোঝানো সত্ত্বেও শিক্ষার্থী অকৃতকার্য!

কাজীদা কি এবার বিরক্ত হলেন?

না।

শিক্ষার্থী নিজের অকৃতকার্যতায় যতো ভীত হয়, লজ্জিত হয়, অপমান বোধ করে, কাজীদা ততোই যেন নিজের প্রাণখোলা হাসি বিলিয়ে দিয়ে তাকে সাহসী করে তোলেন, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।

'—আরে, কি হলো, দেখছো কি? গাও গাও, এ তো খুব সহজ গান! আচ্ছা, আবার একবার আমি গাইছি—শোনো।'

কাজীদা আবার গাইলেন। তারপর গান থামিয়ে শিক্ষার্থীর দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'কি, হচ্ছে না? আচ্ছা, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও।'

শুরু হলো গান। কাজীদার গলার সঙ্গে গলা মেলালো শিক্ষার্থী। এমন একদিন নয়। বহুদিন, বহু জায়গায়, বহু পরিবেশে আমি দেখেছি।

কাজীদার এই গুণটিও, তাঁর অন্য অনেক গুণের মতো অনুকরণ-যোগ্য নয় কি?

আমাদের মা

কল্যাণী কাজী

মাকে প্রথম দেখি আজ থেকে প্রায় চোদ্দ-পনেরো বছর আগে, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীটের একটি বাড়ীর এক অপরিসর কক্ষে শুয়ে থাকতে। প্রথম দর্শনেই মধুর হাসি হেসে তিনি কন্যা স্নেহে আমায় আপন করে নিলেন। পরবর্তী জীবনে কখনও কোনো অবস্থার মধ্যেই—সুদিনে কি দুর্দিনে—তাঁর সেই মুখের হাসি ম্লান হতে দেখিনি। এই পরিবারের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা কালক্রমে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত হলো। আমি এ বাড়ীর কনিষ্ঠ পুত্রবধূরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করলাম। উত্থান-শক্তিহীনা এই মহিলার কর্মক্ষমতা দিনে দিনে আমায় বিস্মিত করেছে। সংসারের প্রয়োজনীয় কাজের সবটুকুই তিনি নিজের হাতে করতে ভালোবাসতেন। প্রশ্ন উঠতে পারে সেটা কি করে সম্ভব? উত্তরে বলবো, প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কেউ সে দৃশ্য কল্পনা করতে পারবেন না। তাঁর নিম্নাঙ্গ অবশ হয়ে গেলেও উর্ধ্বাঙ্গ সক্ষম ছিলো। স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট প্রশস্ত এক চৌকির একধারে তিনি শুয়ে থাকতেন। তাঁর নির্দেশে চৌকিটিকে দরজার সাথে সমান্তরাল করে এমনভাবে রাখা হয়েছিলো, যাতে কোনো কিছুই তাঁর নজর এড়িয়ে না যেতে পারে। আমাদের সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনের জায়গা ছিলো মায়ের পাশের এই জায়গাটুকু। এই চৌকির উপর পাশ ফিরে শুয়ে তিনি মাছ-তরকারী কুটতেন। কোনো কোনো সময় স্টোভে চা বা অন্যান্য রান্নাও তিনি করতেন। পরবর্তীকালে তাঁকে নাতি-নাতনীদের জন্য সোয়েটার বুনতে বা ছেলেদের জামায় বোতাম লাগাতেও দেখেছি। যতদিন বেঁচে ছিলেন বেশির ভাগ দিনই তিনি নিজের হাতে বাবাকে খাইয়ে দিতেন। খাওয়া শেষ হলে তাঁর হাত-মুখ-ধুইয়ে সযত্নে তোয়ালে

দিয়ে মুছিয়ে দিতেন, তিনি খাবার পরিবেশন না করলে বা তাঁর সামনে বসে না খেলে আমাদেরও তৃপ্তি হতো না আর তিনি নিজেও তৃপ্ত হতেন না। লোক খাওয়ানোর ব্যাপারে তাঁর সাথে একমাত্র অন্নপূর্ণারই তুলনা করা চলে। যে কোনো সময়, যে কোনো অবস্থায় যে লোকই এসেছেন—মা তাঁদের কখনও না খাইয়ে ছাড়েন নি।

টাকা-কড়ির হিসাব-নিকাশ সবই তিনি রাখতেন। কোনো কোনো সময় আয়ের তুলনায় ব্যয় অনেক বেশী হতো। ফলে, আর্থিক সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। তবুও কখনও তাঁকে ভয় পেতে বা ভেঙে পড়তে দেখিনি। ধীর স্থির ভাবে তিনি এই সমস্যার সমাধান কি করে যে করতেন তা ভাবলে আজও বিস্মিত হতে হয়।

মাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগতো সন্ধ্যাবেলায় যখন তিনি চুল বেঁধে মাথায় ও কপালে এয়োতীর চিহ্ন এঁকে সান্ধ্য শঙ্খধ্বনির সাথে সাথে শুভ্র শঙ্খবলয় পরিহিত দুই হাত একত্রিত করে প্রণাম জানাতেন তাঁর ইষ্ট দেবতাকে সকলের মঙ্গল কামনা করে। মায়ের মুখে শুনেছিলাম যে, তাঁর মা ছিলেন একাহারী নিষ্ঠাবতী বিধবা। সবাইকে খাইয়ে তারপর পূজা সেরে শুদ্ধাচারে তিনি স্বপাক অন্ন-গ্রহণ করতেন। তিনি নিরুদ্দিষ্টা হওয়ার পর ঠাকুরকে তুলে রাখা হয়েছিলো। মৃত্যুর আগের বছর মা বললেন, 'দেখ্, শরীরটা প্রায়ই ভালো যাচ্ছে না, কবে আছি কবে নেই, তুই একটু পুজোর ব্যবস্থা কর।' তখুনি তাঁর কথা মতো সব ব্যবস্থা করা হলো। তিনি সারাদিন উপবাস করে রইলেন। পূজা শেষ হলে সকলকে প্রসাদ দিয়ে তিনি সামান্য প্রসাদ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ করলেন।

শিশুদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিলো অপরিসীম। নাতি-নাতনীরা ছিলো তাঁর নয়নের মণি—জীবনের জীবন। যখন আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান কাজী অনির্বাণ ও আমার ভাশুরের প্রথমা কন্যা কল্যাণীয়া খিলখিলের জন্ম হয় তখন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

কি যে করবেন আনন্দের আতিশয্যে কিছুই ঠিক করতে পারছিলেন না। কিন্তু নিজের শারীরিক অক্ষমতার কথা চিন্তা করে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়তো। তিনি বলতেন, 'দেখ, এদের জন্যে আমার কতো কি করবার আছে—কিন্তু আমি তার কিছুই করতে পারি না—।' কিন্তু আমি জানি, তাঁর এ-কথা ঠিক নয়। তিনি শুয়ে শুয়ে আমার ছেলেকে দুধ খাওয়াতেন, স্নান করিয়ে দিতেন, এমন কি তার বিছানা-পোশাকও বদলে দিতেন। তাঁর কাজ খুব পরিষ্কার ছিলো. বাচ্চাদের খাবার পাত্রগুলো তিনি বার বার সাবান দিয়ে, ঠাণ্ডা জলে, গরম জলে ধুয়ে তবে তৃপ্ত হতেন। তরকারীতে খোসা বা মাছের গায়ে আঁশ লেগে থাকলে তিনি বার বার জল পরিবর্তন করে ধুতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে তাঁর খুব রুচিজ্ঞান ছিলো। বাচ্চাদের পোশাক তৈরীর ব্যাপারে তিনি এমন নির্দেশ দিতেন যাতে বাচ্চাদের কোনো কষ্ট বা অসুবিধা না হয়ে দেখতে সুন্দর হয়। আমাদেরও বলতেন কোন্ অনুষ্ঠানে কি রকম পোশাক পরে যেতে হয়। পোশাক বা অলঙ্কারের জাঁকজমক তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না।

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও মধুর ব্যবহারের জন্য—আমরা যারা আত্মীয় তারাই কেবল নয়—বাইরের বহু লোকও তাঁকে মা বলে ডেকে তৃপ্ত হতেন। ছেলেরা প্রায়ই বাড়ী থাকতেন না। কবিকে দেখার জন্য বাঙালী অবাঙালী বহু লোক আসতেন। তাঁদের আপ্যায়নের সব ব্যবস্থা তাঁকেই করতে হতো। ব্যক্তিত্ব ও দায়িত্ববোধে তিনি ছিলেন অনন্যা।

তিনি যে সঙ্গীত-রসিকা ছিলেন, এ-কথা অনেকেই জানেন—কিন্তু প্রচার-বিমুখ এই মহিলাটি যে সুগায়িকাও ছিলেন এ-কথা অনেকেই জানেন না। একবার বাড়ীতে Tape Recorder কেনা হলে আমরা জোর করে মাকে দিয়ে একটা গান গাইয়ে Tape করেছিলাম।

গানটি ছিলো কবিগুরুর—'হায় গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো'। সেদিন গানের বাণী, সুর কণ্ঠে একাত্মীভূত হয়ে গিয়ে এক অপূর্ব পরিবেশের সৃষ্টি করেছিলো। আমরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারিনি। কবির জন্মদিনে কবিকে যেমন শিল্পীরা গান শোনাতে আসতেন, আবার অন্য ঘরে গিয়ে মাকেও গান শুনিয়ে যেতেন। জন্মদিন ছাড়া অন্য দিনেও বহু শিল্পী এসে মাকে গান শুনিয়ে তাঁর মন্তব্য চাইতেন। তাঁর শ্রবণশক্তি ছিলো খুব তীক্ষ্ণ। বেতারে ছেলেদের কোনো অনুষ্ঠানের সামান্যতম ত্রুটিও তাঁর কান এড়িয়ে যেতো না। তিনি বর্তমান আধুনিক গানের বাণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করে প্রায়ই আক্ষেপ করতেন। আবার অনেক গানে বাবার গানের কথার সাদৃশ্য দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করতেন।

আমি গান শিখি, এটাই ছিলো তাঁর ঐকান্তিক বাসনা। কিন্তু তিনি অকালে আমাদের ছেড়ে যাওয়ায় তাঁর ছত্রছায়া থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসারের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে আমি তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ করতে পারিনি। আজ প্রতি মুহূর্তে মনে হয় শুয়ে শুয়ে তিনি কি করে সংসারের জটিল সমস্যাগুলির সমাধান অনায়াসে করতেন. যেখানে সচল থেকেও সামান্য ব্যাপারে আমরা মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলি।

বাবার সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবোধ ছিলো অসাধারণ। গভীর রাত্রে সবাই যখন সুপ্তির কোলে নিমগ্ন, তখন তিনি একা খেলে চলেছেন হয় লুডো—নয় তাস—নয়তো চাইনীজ্ চেকার। উদ্দেশ্য, বাবাকে রাতে অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারা দেওয়া। কারণ, বাবা ঠিক এক-নাগাড়ে ঘুমোতেন।—মাঝ-রাতে ঘুম থেকে উঠে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেন। তাই মাঝ-রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম ঠক্ ঠক্ করে ঘুঁটির আওয়াজ হচ্ছে—আর থেকে থেকে একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠছে—'এদিকে এসো—বাইরে যেয়ো না। শোনো, শুয়ে পড়ো।' মাকে কোথাও না নিয়ে গেলে বাবাও যেতেন না। আমার স্বামীর মুখে শুনেছি, যখন বাবাকে

বিলেতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো—তখন যতক্ষণ না মাকে সাথে নিয়ে যাওয়া হলো, ততক্ষণ তিনি এক পা-ও নড়েন নি। মা মারা যাবার পর যখন আমার ভাশুর বাবাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন তখন যাবার সময় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। বাবা ও মা একঘরে থাকতেন। ভাশুর যখন বললেন, 'বাবা, চলো যাই।' তিনি কিছুতেই নড়ছিলেন না। বোধহয় ভাবছিলেন—'আমার সঙ্গে চিরদিন যে থাকত,—সে কোথায় গেলো।' অবশেষে হাত ধরে টানতে টানতে তিনি দু'পা এগোলেন বটে—কিন্তু বার বার পিছন ফিরে শূন্য চৌকির উপরে কাকে যেন খুঁজছিলেন। সে দৃশ্য দেখে চোখের জল সেদিন রোধ করতে পারিনি।

কবির জন্মদিনে তাঁর কথা বেশী করে মনে পড়ছে। এখন জন্মদিনটা এক যান্ত্রিক নিয়মের পর্যায়ে চলে গেছে। সবাই আসেন—কবিকে প্রণাম করেন—চলে যান। কিন্তু বাড়ীর প্রাণ-প্রতিমা বিহনে সবাই নিষ্প্রাণ মনে হয়। তিনি বেঁচে থাকতে কিন্তু এমনটি হতো না। কবির জন্মদিনের এক মাস আগে থাকতেই বাড়ীতে সাজ সাজ রব পড়ে যেতো—ভীড় লেগে যেতো বাড়ীতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের। কবির ব্যবহৃত প্রতিটি জিনিসে তাঁর নির্দেশে লাগতো নতুনত্বের ছোঁয়া। বহুদিন পরে আত্মীয়ের বাড়ীতে আত্মীয় এলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি আনন্দের স্পর্শ লাগতো প্রতিটি মানুষের মনে। তাঁরা তখন নিছক কবিকে দেখতে আসতেন না।

পরিশেষে প্রার্থনা করি, তিনি যেন অলক্ষ্যে থেকে আমাদের এই আশীর্বাদ করেন, আমরা যেন তাঁর মতো অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে সংসারের সব দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করে যেতে পারি।

তাঁর আত্মা শান্তিলাভ করুক।

টুকরো কথা
বেণু গঙ্গোপাধ্যায়

১৩৩০ সাল। ১৪ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার। মেদিনীপুরের নজরগঞ্জের দিকের অসমাপ্ত ইদ্‌গাতে একজনকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিলো, লোকের ভিড় বেশ। একজন ফকির সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। জনতা দাবী জানালো, গজল গাইতে হবে।

কি আর করেন, সম্বর্ধিত ব্যক্তিটি গজল গান ধরলেন :

'কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে…'

জনতার কণ্ঠে গানের অকুণ্ঠ প্রশংসা। কিন্তু ফকির সাহেব প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, 'ইদ্‌গাতে এ গান বিলকুল ঠিক নেহি, খুদা রসুল।'

সঙ্গে সঙ্গে গায়ক গেয়ে উঠলেন :

'খুদা রসুল, খুদা রসুল।
এ নহে ঝুট, এ নহে গুল্।
এই দিলের প্রসাদী ফুল।
করো না ভুল। করো না ভুল।'

জানো কে এই গায়ক? ইনিই বুলবুল কবি নজরুল ইসলাম।

নজরুলের ছেলেবেলা

মঈনুদ্দিন

'কাঠবিড়ালী ! কাঠবিড়ালী ! পেয়ারা তুমি খাও ?
গুড়-মুড়ি খাও ? দুধ-ভাত খাও ? বাতাবী নেবু ? লাউ ?
বেরালবাচ্চা ? কুকুরছানা ? তাও ?'

ছোট্ট শিশুদের মনের মতো এই সুন্দর কবিতাটি লিখেছেন, কবি কাজী নজরুল ইসলাম। এরূপ আরো কতো কবিতা যে তিনি লিখেছেন, তার লেখা-জোখা নেই। তিনি কবিতা লিখেছেন, গান লিখেছেন, গল্প লিখেছেন : শুধু ছোটোদের জন্যই যে তিনি লিখেছেন, তা নয়। বড়োদের জন্যও তিনি অনেক কিছু লিখেছেন আর সে লেখায় এমন জোর যে, কথায় কথায় আগুন ছোটে। মানুষের মনের কথা যেন তিনি টেনে বের করে কাগজের বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্যই সকল মানুষ তাঁকে সমান ভালোবাসে।

তের শ' ছ' সালের এগারই জ্যৈষ্ঠ নজরুল ইসলাম পৃথিবীর মাটিতে প্রথম পা রাখেন। তাঁর বাবার নাম কাজী ফকির আহম্মদ। আর মায়ের নাম জাহেদা খাতুন। বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে তাঁরা বাস করতেন।

ফকির আহম্মদ সাহেব ছিলেন খুব মুস্থল্লী মানুষ। হরদম তিনি নমাজ-রোজা আর তস্‌বীহ্‌-তেলাওয়াৎ নিয়ে মশগুল থাকতেন। তাঁদের বাড়ীর কাছেই ছিলো 'পীর-পুকুর' নামে এক মস্ত দীঘি। তার পাড়ে হাজী পাহ্‌লোয়ান নামে এক পীর সাহেবের মাজার শরীফ আর একটি মস্‌জিদ। এই মাজার আর মসজিদের খেদমত করেই ফকির আহম্মদ সাহেব সারাদিন কাটিয়ে দিতেন।

নজরুল ইসলাম ছোটোবেলায় ছিলেন খুব দুষ্টু। তাঁর দুষ্টুমীর জ্বালায় গাঁয়ের সবাই যেন ভয়ে কাঁপতো। কতো রকমের দুষ্টুমীই

যে তাঁর মাথায় খেলতো, তা আল্লাহ্‌ই জানেন। পাখীর ছানা পাড়া থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষের 'পাকা ধানে মই' দেওয়া পর্যন্ত কোনো দুষ্টুমীতেই তিনি পিছ্‌পাও ছিলেন না। বাবার কড়া শাসনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর দুষ্টুমীর গতি মাঝে মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতো। গ্রামের দুষ্টু ছেলেদের তিনি ছিলেন সর্দার।

তাঁর বাবা তাঁকে গ্রামের মক্তবে ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে কিছু কিছু ফারসী আর কুরআন শরীফ পড়েছিলেন। দুষ্টু ছেলেদের একটা মজা এই যে, দুষ্টুমীতেও তারা যেমন ওস্তাদ আবার পড়াশুনায়ও তারা হয় সব চাইতে ভালো। নজরুল ইসলামের বেলায়ও এই কথাটি সত্য। দশ বৎসর বয়সে যখন তিনি মক্তবের পড়া শেষ করলেন, তখন দেখা গেলো, তিনি যেটুকু শিখেছেন, তার মধ্যে কোনো গলদ নেই। কোন ফাঁকি নেই। এই বয়সেই তিনি উর্দু আর ফারসী এমন সুন্দরভাবে উচ্চারণ করতেন যে, তা শুনে সবার তাক্ লেগে যেতো। তাঁর খোশ্ এল্‌হানে কুরআন শরীফ তেলাওয়াৎ শুনে বড়ো বড়ো মৌলবী-মওলানা সাহেবান্ খুশিতে তার পিঠ চাপড়াতেন।

মক্তবের পড়া শেষ করলেন তিনি দশ বৎসর বয়সে। এই সময়ে তাঁর পড়াও গেলো বন্ধ হয়ে। কারণ, তাঁর বাবা মারা গেলেন। তাঁর দুঃখিনী মা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের নিয়ে অকুল সাগরে ভাসলেন। গরীবের সংসার—খেতেই কুলোয় না, তাঁকে পড়াবে কে? এক বছর পর্যন্ত নজরুল ইসলাম ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করলেন। এই সময় তিনি গ্রামে মোল্লাকীও করতেন। আর মস্‌জিদে ইমামতীও করতেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাঁর অশান্ত মন কিছুতেই মেনে নিতে পারলো না। অভিভাবকহীন নজরুল লাগাম-ছেঁড়া ঘোড়ার মতো যেদিকে ইচ্ছা ছুটে যেতে লাগলেন ; কিন্তু এই অল্প বয়সে দিশেহারা হয়ে কোথায় যাবেন?

তাঁর এক চাচার নাম কাজী বজ্‌লে করীম। তিনি ফার্‌সীতেও

ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর ছায়া নজরুলের জীবনেও পড়েছিলো। তিনি ছোটো বয়সেই নানা রকমের ফার্সী বাঙ্‌লা মেশানো কবিতা লিখতে চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে তু'একটা কবিতা বেশ ভালো হয়ে যেতো। পাশের গ্রামে 'লেটো' গানের একটা দল ছিলো। তারা যাত্রাগানের মতো এক রকম পালা-গান করতো। মাঝে মাঝে নজরুল তাদের জন্য পালা গান লিখে দিতেন। এতে তাঁর তু'পয়সা রোজগারও হতো। এই অল্প বয়সেই তিনি পালা-গান লিখে বেশ শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর গানের আদরও খুব বেড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তাঁর মনে ছিলো আগুনের কুণ্ড। তিনি গ্রামের ঐ ছোট্ট জায়গায় আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। একদিন গ্রাম থেকে পালিয়ে তিনি আসানসোলে চলে গেলেন। পালিয়ে তো গেলেন, কিন্তু যান কোথায়? পেট বড়ো দারুণ জিনিস। একদিন তার আহার না যোগালেই চোখে আঁধার দেখতে হয়। তাই তিনি 'পাঁচ' টাকা মাইনেয় ময়দা-মাখার কাজ নিলেন ওখানেই একটি রুটির দোকানে।

মজলিশী লোক—যেখানে যান, সেখানেই তাঁর মজলিশ জমে ওঠে। তিনি দিনের বেলা ময়দা মাখেন আর রাত্রে অবসর সময় সুর করে পুঁথি পড়েন, গান গেয়ে সকলকে মাতিয়ে তোলেন, বাজনা বাজিয়ে পাড়া তোলপাড় করেন। এই সকল কারণে অনেকেরই নজর তাঁর উপর পড়লো।

আসানসোলে কাজী রফিউদ্দীন নামে একজন পুলিশ সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। তিনি নজরুলের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন। ভাবলেন: একে লেখাপড়া শেখাতে পারলে কালে হয়তো এ খুব বড়ো কাজ করতে পারবে। তিনি নজরুলকে নিজের দেশে নিয়ে এলেন। তাঁর বাড়ী ছিলো ময়মনসিংহ জেলার কাজিরশিমলা গ্রামে। এর কাছেই দরিরামপুর হাই স্কুল। সেখানে তিনি নজরুলকে ভর্তি করে দিলেন। এই স্কুলে নজরুল মাত্র এক বৎসর পড়লেন।

তারপর সেখানের হেডমাস্টার বদলী হয়ে যাওয়ায় নজরুলের মন ওখানে টিঁকলো না, তিনি রাণীগঞ্জে গিয়ে সিয়ারসোল হাই স্কুলে ভর্তি হলেন।

হাই স্কুলে ভর্তি তো হলেন। কিন্তু তাঁর অশান্ত মন স্কুলের বাঁধাধরা নিয়মের সাথে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারলো না। তিনি স্কুলের বই ছেড়ে বাইরের বই পড়েন, পরীক্ষার খাতায় কবিতা লিখে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। এমনিভাবে হ-য-ব র-ল আর গোলমালের মধ্যে তিনি ক্লাশ টেন পর্যন্ত উঠলেন।

তখন পৃথিবীতে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। দলে দলে লোক পল্টনে ভর্তি হয়ে লড়াইয়ে যাচ্ছে। নজরুলও বাঙালী পল্টন-এ নাম লিখিয়ে একদিন করাচী চলে গেলেন।

নজরুলের ভিতর আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তি ছিলো অসীম। তাই ছেলেবেলায় যখন তিনি দুষ্টুমী করতেন, তখন ছিলেন দুষ্টু দলের সর্দার। মোল্লাকী করার সময় তিনি হয়েছিলেন মস্‌জিদের ইমাম। আর পল্টনে যোগ দিয়েও তিনি কি ক্ষুদে পল্টন হয়ে থাকতে পারেন? সেখানেও সকল পল্টনের উপরে হাবিলদার হয়ে সকলের মাথার মণি হয়ে রইলেন।

পল্টনের দলে একজন ফার্‌সী জানা মৌলবী ছিলেন। তাঁর সাহায্যে তিনি ভালো ভালো ফারসী কবিতার বই, বিশেষ করে হাফিজের বইগুলি পড়ে নিলেন। আর বাংলা ভাষায় দিতে লাগলেন তারই রূপ।

বাংলা ভাষায় এর আগে যে-সব গল্প, কবিতা ইত্যাদি লেখা হতো, নজরুলের লেখা হতে লাগলো তার চেয়ে অন্য ধরনের। তাঁর ভাষা নতুন, বলার ভঙ্গী নতুন। বাংলা দেশের সবাই এই নতুন লেখার সাথে পরিচিত হয়ে চম্‌কে উঠলো।

তারপর নজরুল লড়াই থেকে ফিরে এসে তাঁর লেখার মারফৎ সারা দেশে যে আগুন ছড়ালেন, তাতে যুবকের দল পাগল হয়ে উঠলো, বৃদ্ধেরা কুঁজো পিঠ সোজা করে জোরে জোরে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চললেন। সারা দেশ নবজীবনের পথে পা বাড়ালো।

মহাবিদ্রোহী নজরুল

মুহম্মদ এনামুল হক

সত্যই বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল ইসলামের আবির্ভাব ভয়ঙ্করের আবির্ভাব—একটি ধূমকেতুর আত্মপ্রকাশ। তাই ধূমকেতুর উদয়ের মতোই এই ঘটনা একান্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। লোকের বিশ্বাস, ধূমকেতু স্রষ্টার একটি অলক্ষুণে সৃষ্টি ; কেননা সে সাথে করে নিয়ে আসে দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাক ও মহামারী। সে যে তার সাথে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনাও নিয়ে আসে, আর অনাগত সুন্দরের আগমনী গানও গেয়ে যায়, তার কথা কেউ বড় একটা ভাবতে চায় না। বাংলা-সাহিত্যে নজরুল শুধু ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে সকলকে তাক্ লাগিয়ে দিলেন না, 'ধূমকেতু' নামে কাগজ বের করে ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটায় প্রলয়-নাচন নেচে চললেন। মানুষ তাঁর এই অদ্ভুত ও আকস্মিক তাণ্ডব-নৃত্য দেখে অবাক হলো। কবি রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'ধূমকেতু'কে আশীর্বাদ করলেন।

লক্ষ্য করবার বিষয় হলো এই যে, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে আশীর্বাদ করলেন পরাধীন জাতির মুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা কবিরূপে নয়, বরং পরাধীন জাতির মুক্তি-সংগ্রামের অগ্রপথিকরূপে। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন একটা বিরাট প্রতিভা তাঁর গগনস্পর্শী প্রতিষ্ঠার পর্বত-শিখরে বসে একটি শিশু-প্রতিভার গতিবিধি লক্ষ্য করছেন।—এমন একটা অদ্ভুত ঘটনা সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনও ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

মোদ্দা কথা, কবি রবীন্দ্রনাথের পাশে কবি নজরুল ইসলাম ভাস্বর হয়ে দেখা দিলেন। এতে এক অপূর্ব দৃশ্যের মহিমময় মূর্তি ফুটে উঠলো। রবীন্দ্রনাথ বাংলার সাহিত্যাকাশে তাঁর কাব্য-কলার শুভ্র-স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না-জাল বিস্তার করে যে সৌন্দর্যের মন্দির-মায়া ছড়িয়ে রেখেছিলেন, একই আকাশে তারই পাশে নজরুল তাঁর ধূমকেতুর জ্বালা ও ঝোলা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন :

'গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।

* * *

সাগর গর্ভে, নিঃসীম নভে, দিক্‌-দিগন্ত জুড়ে,
জীবনোদ্বেগে তাড়া করে ফেরে নিতি যারা মৃত্যুরে,
মানিক আহরি' আনে যারা খুঁড়ি' পাতাল যক্ষপুরী,
নাগিণীর বিষ-জ্বালা সয়ে করে ফণা হতে মণি চুরি।

* * *

গুঞ্জরি ফেরে ক্রন্দন মোর তাদের নিখিল ব্যেপে—
ফাঁসির রজ্জু ক্লান্ত আজিকে যাহাদের টুঁটি চেপে।
যাহাদের কারাবাসে,
অতীত রাতের বন্দিনী উষা ঘুম টুটি' ঐ হাসে।
গাহি তাহাদের গান—
বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আজি আগুয়ান।'

বাংলা-সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাবে জাতি আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেলো, 'তাজা-বতাজার' গান গেয়ে 'নব-নবীনের' চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলো। রবীন্দ্রনাথ জাতির 'মূঢ়ম্লান মুখে ভাষা,' আর 'নির্জিত বুকে আশা ধ্বনিয়ে তোলার' তাগিদ অনুভব করেছিলেন: এবার তার ভার পড়লো বাংলার চারণ-কবি নজরুলের উপর।

'মরণ-বরণ-পণ' করে নির্যাতিত ও পরাধীন জাতির সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন নজরুল। বিদেশী 'বিধির বিধান' ভাঙার অভিযান শুরু হলো। 'বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশি' লাগলো। তাতে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিলো বেশী; কেননা 'বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের'। হলোও তাই। নজরুল কারাবরণ করলেন, অনশন ব্রত গ্রহণ করতেও কসুর করলেন না। তাঁর 'অগ্নিবীণা'য় দীপক-রাগিণী বেজে উঠলো, 'বিষের বাঁশী'তে সুর সংযোজিত হলো, সর্বোপরি দেশে এক অপূর্ব উন্মাদনা দেখা দিলো। এই সময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নামক নাটিকাটি 'শ্রীমান কাজী

নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু' বলে নজরুলকে উৎসর্গ করলেন। বলা বাহুল্য, এ হচ্ছে বিশ্বকবি কর্তৃক জাতীয় জাগরণের উদ্গাতারূপে বাংলার কবি নজরুলের গৌরবময় স্বীকৃতি।

অতঃপর, কবি নজরুল নির্যাতীত, নিপীড়িত ও পরাধীন জাতির হয়ে কবিতা ও গানে, ধারণা ও ধ্যানে, কথা ও কাজে যে অনল-উদ্গীরণ শুরু করলেন, তার কাছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদগার, আর ধূমকেতুর দিগন্ত-জোড়া ধূম্রজালও হার মানলো। এ সময়ের নজরুল ছিলেন মহাবিদ্রোহী নজরুল। তাঁর দুর্দান্ত বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছিলো একদিকে সেকেলে সংস্কার, প্রাচীন-চিন্তাধারা ও আগেকার সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আর অন্যদিকে বিদেশী শাসনের কঠোর বন্ধন-মুক্তির অনুকূলে। 'যারা তেত্রিশ-কোটি মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে' খাচ্ছিলো, কবির 'রক্ত-লেখায়' অচিরে তাদের সর্বনাশ ডেকে আনলো। তারা দিব্য-চক্ষে দেখতে পেলো:

'মহামানবের মহাবেদনার আজি মহা উত্থান;
ঊর্ধ্বে হাসিছে ভগবান, নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।'

ধূমকেতু-ধর্মী মহাবিদ্রোহী নজরুল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমন সুন্দরও বটে। গড়ার জন্য ভাঙার, সৃষ্টির জন্য ধ্বংসের প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। নজরুলও ধ্বংসের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন সৃষ্টির জন্য। তাই তাঁর 'এক হাতে' ছিলো 'রণ-তূর্য' এবং 'আর হাতে' ছিলো 'বাঁকা বাঁশের বাঁশরী'। তিনি জাতিকে শুধু ভাঙার গান শোনালেন না, তার কাছে বজ্র-নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন:

'ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর—প্রলয় নূতন-সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন—জীবনহারা অসুন্দরে করতে ছেদন!'

জাতি নজরুলের আগমনে জয়ধ্বনি করলো। চিরসুন্দর নবীন মোহনবেশে মধুর হেসে সৃষ্টির উল্লাস বুকে নিয়ে নেমে এলো নতুন জীবন লাভ করলো জাতি, স্বাধীন হলো দেশ।

কারাজীবনে কবি নজরুল

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

১৯২৩ সালে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের এক বৎসর সশ্রম কারাবাস হয়। ঐ সময় রাজনৈতিক কয়েদীদের কোনো শ্রেণী-বিভাগের নিয়ম ছিলো না। যাকে পারতো তাকেই ধরে নিয়ে এসে বন্দী করতো। পরে বিচারপ্রহসনের দ্বারা দণ্ড দিয়ে কয়েদীর ছাপ দিয়ে দিতো। বিচারক সুইন হো নিজে কবি হয়েও বিদ্রোহী কবির বেলাতেও কোনো শ্রেণী-বিভাগ না করেই তাঁকে সাধারণ কয়েদীরূপে গণ্য করেছিলো। ডোরাকাটা হাফ্ পাঞ্জাবী, উক্ত কাপড়ের ইজের, আর ঐ কাপড়েরই গামছার মতো গা-মোছা চাদর, বিষম কুট্‌কুটে খোঁচা খোঁচা লোমের কম্বল সহ এই অপরূপ পোশাকে জেল কর্তৃপক্ষ বাংলার জাতীয় জাগরণের কবিকে সাজিয়ে কয়েদীর গাদিতে ছেড়ে দিলো।

কবি কলকাতার জেল থেকে হুগলী জেলে এলেন। কবিকে আনা হয়েছিলো কোমরে দড়ি বেঁধে। জেলখানায় ঢুকেই উদাত্ত স্বরে 'দে গরুর গা ধুইয়ে' বলে হাঁক ছাড়লেন। রাজনৈতিক বন্দীরা সচকিত হয়ে শুনলো বিদ্রোহী কবি নজরুল হুগলী জেলে পদার্পণ করেছেন। সকলেই কবির আগমনে বন্দীদশার একঘেয়েমিতে বৈচিত্র্যের আশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো।

বিভিন্ন জেলার অহিংস, বিপ্লবী যুব ও ছাত্রসমাজ বিশেষ করে হুগলীর যুব ও ছাত্র সমাজের একটা বড়ো অংশ তখন আন্দোলনের সৈনিকরূপে 'হুগলী বিদ্যামন্দিরে' স্বেচ্ছাসেবকরূপে সমবেত হয়েছিলো। হুগলী জেল তখন বিভিন্ন জায়গার রাজনৈতিক বন্দীর সমাগমে গম্‌গম্ করছিলো। কবি নজরুলকে পেয়ে বন্দীরা গানে, আবৃত্তিতে, হাসির হুল্লোড়ে খুব হৈ চৈ করে কাটাতো। বাইরে থেকে

ছাত্রের দল হুগলী ব্রীজের উপর উঠে জেলের কয়েদীদের দেখতো এবং নানারকমে উৎসাহিত করতো। বিপ্লবী তরুণ নেতা সিরাজুল হক্ তাঁদের দল নিয়ে হুগলী ব্রীজের উপর থেকে তাক বুঝে কাপড়, গামছা, তোয়ালে, সাবান, বিড়ি-সিগারেট, খবরের কাগজ প্রভৃতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। কবি সুবোধ রায়, সিরাজুল হক্, হামিদুল হক্, জনার্দন প্রভৃতি এই সব কাজের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতেন। কারণ এ ব্যাপারটা যাতে করতে না পারে তার জন্য জেল কর্তৃপক্ষ নানারূপ বাধার সৃষ্টি করতো। বন্দীরাও তাঁদের খবরাখবর পাঠাবার জন্য চিঠি প্রভৃতি ঢিলের সঙ্গে জড়িয়ে ছুঁড়ে এদিকে পাচার করতেন। তাই জেল কর্তৃপক্ষ যখন প্রায় হার মানলো তখন সাদা পোশাকে পুলিশের আড়কাঠি নিযুক্ত করতে বাধ্য হলো, কারণ জেলের অনেক গুপ্ত তথ্য প্রকাশ হয়ে যাচ্ছিলো। এইভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে বন্দীদের যোগাযোগ যখন ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, বাধা দেবার শত চেষ্টাতেও কাজটি সমানেই চলেছে, বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ তখন ব্রীজের উপরে বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করলো। কিন্তু দুঃসাহসী ছেলেদের এততেও ঠেকানো গেলো না। সেজন্য ব্রীজের দক্ষিণদিকের অনেকটা জায়গা ঢেউ টিন দিয়ে খুব উঁচু করে বেড়া দিয়ে ঢেকে দিলো। তবুও দুর্দান্ত কয়েকটি ছেলে জীবন বিপন্ন করে চেষ্টা করে, কিন্তু বিদ্যামন্দিরের নেতাদের নিষেধে তারা হাত গুটিয়ে নিলো।

যতগুলো জেল আছে তার মধ্যে হুগলী জেলটা সবচেয়ে ওঁচা। এর 'জেলর' যেমনি অভদ্র তেমনি অশিক্ষিত হতো। চোর-ডাকাত, পকেটমারদের সঙ্গে যে ব্যবহার করতো, বিশিষ্ট ও সম্মানিত রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গেও সে লোকটা সেই ব্যবহার করতো। চিঠি লেখার কাগজ, খবরের কাগজ তো দিতই না, কলম পেন্সিলও অফিসে জমা নিয়ে নিতো তারা জোর করে। এই ব্যাপারে কবি নজরুলের মনটা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলো। এই সময় হুগলী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এক ইংরেজ। নাম তার 'আর্সটন'।

রাজনৈতিক বন্দীদের দেখলেই কারণে অকারণে সে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতো। বন্দীরাও মজা দেখবার জন্য তাকে চটাবার আয়োজন করে রাখতো। কবি নজরুল এই ইংরেজ জেল সুপারটির নাম রেখেছিলেন হর্সটোন (Horsetone) মানে পিচেশ-কণ্ঠী। কবি একে চটাবার জন্য 'সুপার বন্দনা' নামে একটি গান লেখেন। গানটি এই :

'তোমারি জেলে পালিছো ঠেলে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আমারি গান তোমারি ধ্যান
তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছো সান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছো শিকল প্রণয় ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।
আকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছো আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লপসী' শোভন
তুমি ধন্য ধন্য হে।
ধরো ধরো খুড়ো চপেটা মুষ্টি
খেয়ে গয়া পাবে সোজা সন্তুষ্টি,
ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ
তুমি ধন্য ধন্য হে॥

কবি রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছো স্নেহে' গানটির লালিকা অর্থাৎ প্যারডি। 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা' কথাটির একটা ব্যাপার আছে, তা এই যে, হুগলী জেলে কি সাধারণ কয়েদী কি রাজনৈতিক কয়েদীদের দিয়ে খুব বড়ো করে একটা তরকারীর বাগান করা হয়েছিলো, শুনেছি এখনও হয় (বোধহয় রাজনৈতিক কয়েদীদের আর খাটতে হয় না) কিন্তু তখনকার দিনে ভালো ভালো তরকারী, ভালো ভালো ফুলের

খোকাগুলো জেল কর্তৃপক্ষের ঘরে চলে যেতো; আর বুড়ো ডাঁটা কপির শুক্‌নো পাতা, ফুটে যাওয়া ফুলকপি, দরকচা-ধরা বেগুন, ঝিঁঙে, আধপচা লাউ, কুমড়ো আর তরকারীর খোসা প্রভৃতিতে কয়েদীদের রসনা তৃপ্তির ব্যবস্থা হতো। সপ্তাহে একদিন মাছ, একদিন মাংসের বরাদ্দের মধ্যে কাঁটা ও হাড় দেখা যেতো, বাকী বস্তুর গতি যে কী হতো তা কয়েদীরা সবাই বুঝতো। আর তরকারীর খোসা, ক্ষুদ ও ধানের 'কুন' মিশিয়ে সেদ্ধ করে ভোরের দিকে সান্‌কি থেকে সান্‌কিতে ঢেলে দিয়ে যেতো ফালতুরা, তার রং ছিলো কালো, আস্বাদের তো কোনো বালাই ছিলো না। জেল জীবনে হুগলীর কয়েদীদের ঐটাই ছিলো পরম পদার্থ 'লপসী'। কবি নজরুল ঐ অ-পদার্থকেই 'বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা লপসী শোভন' বলেছেন।...সুপার আর্সটনের চেহারাটা ছিলো লিক্‌লিকে, গায়ের রংটা ছিলো বিশ্রী রকমের সাদা। কবি একটা লাইনের ভিতর তাঁর অনবদ্য ভাষায় লিখেছিলেন 'ওল-ছোলা দেহ ধবল কুষ্ঠ'। যাঁরা তাকে দেখেছেন তাঁরা এর রসটা বেশ ভালো করেই নিতে পারবেন। এই গানটি শুনলেই সাহেবপুঙ্গব ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো কি করবে ঠিক করতে পারতো না।

'ভাঙার গানে' এই গানই আছে। তার ফুটনোটে কবি এই কথা কয়টি লিখেছেন :

'হুগলী জেলে-কারারুদ্ধ থাকাকালীন জেলের সকল রকম জুলুম আমাদের উপর দিয়ে পরখ করে নেওয়া হয়েছিলো। সেই সময় জেলের মূর্তিমান জুলুম বড়োকর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে অভিনন্দন করতাম।'

কয়েদীরা খবরের কাগজ পড়ে তবু মনকে সান্ত্বনা দিতো। কারণ বন্দীদের কাছে 'দৈনিক আনন্দবাজারের' কী যে কদর ছিলো এখনকার লোকেদের তা বোঝানো অসম্ভব। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের (তখনকার 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সম্পাদক ছিলেন) বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় স্তম্ভ ছিলো আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্টার্টার

স্বরূপ। সহস্র বিপদ মাথায় করেও বিদ্যামন্দিরের স্বেচ্ছাসেবকরা জেলের মধ্যে উক্ত পত্রিকাকে সরবরাহ করতো। সরবরাহ করতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল ভোগও করেছে অনেকে। বন্দুকধারী পুলিশ পাহারার চাপে শেষে কাগজ তো বন্ধ হলোই নিত্যব্যবহার্য সাবান-সোডা ইত্যাদিও বন্ধ হয়ে গেলো।

দেশভক্ত বন্দীদের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠলো। সরকার মনোনীত পত্রিকাগুলোও বন্ধ করে দিলো আর্সটন। আগেই আহারের সম্বন্ধে বলেছি, এবার বিহারের কথা বলবো। পূর্বে নতুন নতুন এসে সকালে বিকালে জেলের উঠোনে, মাঠে বেড়াতে দিতো বন্দীদের। কিন্তু পরে তাও বন্ধ করে দিয়ে বন্দীদের মধ্যে প্রাণবন্ত যারা ছিলো তাদের এক একটা ঘরে কোথাও দু'জনকে কোথাও একজনকে আটকে রেখে সমস্ত রকম অধিকার হরণ করে নিলো। বিহার মানে বেড়ানো বা বাইরে হাওয়া লাগানোও বন্ধ হয়ে গেলো; বন্দীর সঙ্গে বন্দীরা কথাও বলতে পারতো না। কবি নজরুল গান না গেয়ে থাকতে পারতেন না; তিনি গান ধরতেন:

'কারার ঐ লৌহ কপাট।
ভেঙে ফেল্ কর রে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল পূজার পাষাণ বেদী
ওরে ও তরুণ ঈশান
বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদী।'

গানটি শুনে বিক্ষুব্ধ বন্দীদের শিরদাঁড়া সোজা হয়ে উঠতো। তারা জেল কর্তৃপক্ষের এই অত্যাচারের উপযুক্ত জবাব দেবার জন্য প্রস্তুত হতো। কবি এবং আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বন্দীকে হাত-কড়া ও পায়ে বেড়ি দিয়ে 'সেলে' বন্দী করে অন্যান্য কয়েদী থেকে দূরে

সরিয়ে রেখে দিলো। কবি তখন 'শিকল পরার গান'খানি রচনা করে হাত-কড়া সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে ঘা দিয়ে বাজিয়ে গাইলেন :

'এই শিকল পরা ছল্ মোদের এ শিকল পরা ছল্,
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করবো রে বিকল!
তোমার বন্দী কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন ভয়,
এই বাঁধন পরেই বাঁধন ভয়কে করবো মোরা জয়,
এই শিকল বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল।'

বন্দী-জীবনে ভয়শূন্য হবার জন্য কবি অপূর্ব যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। কাগজ নেই, কলম পেন্সিল—তাও নেই, কবি শূন্য হাতে শুধু স্মৃতিশক্তির জোরে এই সব গান শত বাধা সত্ত্বেও রচনা করে সুর ও দরদ দিয়ে ভাবাবেগের সঙ্গে গেয়ে প্রতিকারের জন্য, প্রতিরোধের জন্য, উপযুক্ত প্রতিবাদের জন্য আগুনকে সংক্রামিত করে যেতে লাগলেন বন্দীদের প্রাণে প্রাণে। এই সময় বিখ্যাত 'সেবক' কবিতাটি রচনা করেন তিনি। উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে বন্দীদের সংগ্রাম-শক্তি বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কবির সান্নিধ্যে এসে সাধারণ কয়েদীরা পর্যন্ত দেশকে ভক্তি করতে শিখেছিলো। তিনি লেখেন :

'সত্যকে হায় হত্যা করে অত্যাচারীর খাঁড়ায়,
নাই কিরে কেউ সত্য-সেবক বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়ায়?
শিকলগুলো বিকল করে পায়ের তলায় মাড়ায়,
বজ্রহাতে জিন্দানের (জেলখানার) এই ভিত্তিটাকে নাড়ায়?'

এই প্রশ্ন বারে বারে বন্দীদের কাছে তুলে ধরলেন কবি। ক্রমে জেলের অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠলো। যতরকম ফন্দী ছিলো, সকলের উপর প্রয়োগ করতে লাগলো জেলর আর জেল সুপার। অনমনীয় বন্দীরা, অনমনীয় বিদ্রোহী কবি, অনমনীয় সাধারণ কয়েদীরাও। এরই প্রতিবাদের জন্য মিলিতভাবে সবাই অনশন

ধর্মঘটের প্রস্তাব দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে সকলে প্রস্তুতির দিকে এগিয়ে চলেন। এই সময় বোধহয় কবি নজরুল 'মরণ-বরণ' গানখানি রচনা করেন

'এসো এসো ওগো মরণ
এই মরণ-ভীতু মানুষ মেষের ভয় করো গো হরণ।
না বেরিয়েই পথে যারা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে
ভীম রুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন ভরা চরণ॥'

এই সময় 'বন্দী-বন্দনা' নামে আর একটি গান লেখেন। ভোর-বেলায় রাজনৈতিক বন্দীদের 'ফাইলে' দাঁড়াতে হতো। স্কুলে ড্রিলের সময় প্রথমে এসেই যেমন দাঁড়াতে হয় সেই রকম দাঁড়ানোকে ফাইল বলে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, বন্দীদের রাম দুই করে হেড্ জমাদার গুণতো। গোণা হয়ে গেলে জেলর তার বিরাট ভুঁড়ি দুলিয়ে মূর্তিমান নির্বোধের মতো সেখানে ঢুকতো। আর সঙ্গে সঙ্গে জমাদার বীভৎস চীৎকার করে বলে উঠতো, 'সরকার সেলাম'। এই 'সরকার সেলাম'টা কবি ও অন্যান্য বন্ধুরা বরদাস্ত করতে পারতেন না। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে একটি করে ঠ্যাং সামনের দিকে তুলে দিতেন। পরে এই নিয়ে অনেক মারপিট হয়ে গেছে।···ভোরবেলার এই ব্যাপারটির সঙ্গে উপরি-উক্ত 'বন্দী-বন্দনা' গানটির যোগাযোগ ছিলো। এই প্রভাতী গান গেয়ে কবি নজরুল সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। গানটি এই :

'আজি রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি কোলাহল বন্দী শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে
টুটেছে ভয় বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।

ওরা দু'পায়ে দলে গেলো মরণ শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেলো শিকল ঝঞ্ঝারে,
বাজিল নভ-তলে
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে চলে,
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পড়ে ছেয়ে
উতল কলরোলে !!
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি ক্রন্দন
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন
নিখিল গেহ যেথা বন্দীকারা, সেথা
কেন রে কারাত্রাসে মরিবে বীর দলে ?
'জয় হে বন্ধন' গাহিল তাই তারা
মুক্ত নভ-তলে।'

এর পর শুরু হলো অনশন ধর্মঘট। এবং বন্দীরা জোর গলায় জানিয়ে দিলেন, 'সম্মানজনক অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত আমাদের চলা থামবে না।' প্রথম প্রথম এই ধর্মঘটের কথা বাইরে প্রকাশ হয়নি। তারপর চরমে পৌঁছালো। কর্তৃপক্ষ আর আঁচল দিয়ে আগুন চেপে রাখতে পারলো না। সেই আগুন ছড়িয়ে গেলো সবখানে। এই অনশন ধর্মঘট নিয়ে সারা বাংলাদেশে ও নিখিল ভারতের নরম-চরমপন্থী নেতারা, ছাত্র যুবকরা এমন কি সাধারণ লোকেরাও ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও খুব বিচলিত হয়েছিলেন। কবি নিজে সৈনিক পুরুষ, একরোখা লোক, যা করবেন তা করবেনই, কিছুতেই রোখা যেতো না। এই অনশনের সময় সমস্ত বন্দীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। হাত-পা-মাথা চেপে ধরে চামুণ্ডার দল জোর করে নল দিয়ে খাওয়ানোর জন্যই বেশীর ভাগ বন্দীরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, শুধু তাই নয় কারুর কারুর জীবন-সংশয়ও হয়েছিলো। সকল বন্দীর জন্য, বিশেষ করে বিদ্রোহী কবির জন্য দেশবাসী উদ্বেগে অধীর হয়ে ওঠে। সভাসমিতি, প্রস্তাব

পাশ—নানারকম চেষ্টা চলতে থাকে। কবিকে দেশের বড়ো বড়ো নেতারা অনশন ত্যাগের অনুরোধ করে পাঠান। কবি 'মরণ-বরণ' গান লিখে সকলকে মৃত্যু-ভয়শূন্য হয়ে অনশনের পথে ডেকেছেন, তিনি হয় সকলকে নিয়ে মরবেন, নয় সকলকে নিয়েই সাফল্যের মধ্য দিয়ে অনশন ত্যাগ করবেন—এই তাঁর জিদ। পরে স্বয়ং বিশ্বকবি তার-বার্তায় জানালেন। "Give up. hunger stiike, our literature claims you.—Rabindranath.

এবার কবি একটু বিচলিত হলেন। কবি নজরুলের বাংলা সাহিত্যের জন্য এবং ভারতের ভবিষ্যতের জন্য বেঁচে থাকা দরকার এ-কথা বিশ্বকবি স্বীকার করলেও তৎকালীন অন্যান্য সাহিত্যকরা স্বীকার না করে দেশসেবকদের কাছে হেয় হয়েই আছেন। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটকখানি কবি নজরুলকে উৎসর্গ করেন, এবং নজরুল-বন্ধু শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দিয়ে হুগলী জেলে পাঠিয়ে দেন। পুস্তকখানি নিয়ে পবিত্রবাবু হুগলীতে আসেন।

পবিত্রবাবুর হাত থেকে 'বসন্ত' নাটকখানি হাতে নিয়ে নজরুল দেখলেন, কবিগুরু বসন্ত নাটকের উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছাপা অক্ষরে 'শ্রীমান কবি কাজি নজরুল ইসলাম, কল্যাণীয়েষু' লিখে নীচে তাঁর নাম কালি দিয়ে সই করেছেন।

কবি নজরুল বিশ্বকবির তারবার্তা ও 'বসন্ত' নাটকসহ আশীর্বাদ পেয়ে একটু চিন্তিত হলেন। জেলের সাথীরাও মাঝপথে থমকে দাঁড়ালেন—অবশ্য অনশন—ধর্মঘট চালু রেখে। এমন সময় বাইরের আন্দোলনের চাপে ও রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে বন্দীদের দাবী মেনে নেবে বলে সরকার স্বীকার করলে। তখনও চির-অবিশ্বাসী বৃটিশ সরকারকে বন্দীরা বিশ্বাস করতে পারলেন না। অনশন ধর্মঘট চলছে, এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে পবিত্রবাবুর সঙ্গে বিরজাসুন্দরী দেবী, গায়ক নলিনীকান্ত সরকার, কবি সুবোধ রায়, হুগলী বালির ৺চারুশীলা মিত্র প্রভৃতি হুগলী জেলের গেটে

এসে উপস্থিত হলেন। বিরজাসুন্দরী দেবীকে কবি নজরুল মা বলে ডাকতেন। 'সর্বহারা' নামক শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেছিলেন এঁকে। তাতে লিখেছিলেন:

'সর্বংসহা সর্বহারা জননী আমার!
তুমি কোনোদিন কারো করোনি বিচার,
কারেও দাওনি দোষ। ব্যথা-বারিধির
কূলে বসে কাঁদো মৌনা কন্যা ধরণীর
একাকিনী? যেন কোন্ পথ-ভুলে আসা
ভিন্-গাঁর ভীরু মেয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা
করিতেছ আপনারে, 'এ আমি কোথায়?'—'

বিশ্বকবির তারবার্তায় ও বিরজাসুন্দরীর বহু সাধ্য সাধনায় এবং সরকার পক্ষের দাবী মিটাবার স্বীকৃতিতে মায়ের হাতের লেবুর রস পান করে কবি নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।

অনশন ভঙ্গ হবার পর কর্তৃপক্ষ বন্দীদের সমস্ত দাবীই মিটিয়ে দিলো, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা কেটে তারপর পড়তে দিতো।

এরপর কবি নজরুল বহরমপুর জেলে বদলি হয়ে যান। কবি উক্ত জেলে যেতেই জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীবসন্ত ভৌমিক একটি হারমোনিয়াম তাঁকে পাঠিয়ে দেন। হারমোনিয়াম পেয়ে নজরুলের আনন্দ আর ধরে না। নাওয়া খাওয়া ভুলে দিন-রাতই প্রায় গান গাইতেন, আর মনের সুখে কবিতা, প্রবন্ধ লিখতেন। হুগলী জেলের সংগ্রামের পর নজরুল বহরমপুরে আনন্দেই ছিলেন।

নজরুল-সান্নিধ্য

আবুল মনসুর আহ্‌মদ

১৯০৬ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই দশ বছরকে বাংলার বিপ্লবী যুগের প্রভাত কাল বলা যেতে পারে।...আমরা তখন স্কুলের ছাত্র। ঐ পরিবেশের চাপে আমরা অনেকেই তখন ভয়ানক-রকম ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছি। বর্তমান 'আজাদ' সম্পাদক, বন্ধুবর আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আমি তখন আরো কতিপয় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বিলেতী মানুষ, বিলেতী পোশাক ও ইংরেজী ভাষার বিরুদ্ধে ছেলেমানুষী প্রতিবাদ ও ঠাট্টা বিদ্রূপ শুরু করে দিয়েছি। স্বাধীনতা সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলেও পরাধীনতার লজ্জা আমাদের তরুণ-বুকে খুবই ব্যথা দিচ্ছিলো। এই মানসিক অশান্তির আগুনে আমরা তখন সান্ত্বনার পানি-ছিটা দিচ্ছিলাম জাতীয় প্রেরণা-দ্যোতক ছোটো ছোটো ঐতিহাসিক নাটক লিখে এবং নিজেরাই সেই সব নাটক অভিনয় করে।

আমাদের গ্রামে 'মিলন সমাজ' বলে একটা ক্লাব ছিলো। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এসে ঐ ক্লাবের বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আমরা অভিনয় করতাম। নিজেদের লেখা বইয়ের নাম-ভূমিকায় নিজেরাই অবতীর্ণ হতাম, এবং তৎকালীন জনপ্রিয় যাত্রার দলের প্রধান অভিনেতার অনুকরণে গলা কাঁপিয়ে অভিনয় করতাম। ১৯১৩ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা তেমনি এক অভিনয়ের আয়োজন করি। শামসুদ্দীনের লেখা নাটকের নাম-ভূমিকায় সে নিজে এবং আমার লেখা নাটকের নাম-ভূমিকায় আমি নিজে অভিনয় করি। অভিনয়ের শেষে পাশের গ্রাম দরিরামপুর হাইস্কুলের ছাত্রবন্ধুরা আমাদের মোবারকবাদ দিতে আসে। তাদের সাথে ছিলো নাদুস-নুদুস ঝাঁকড়া চুলওয়ালা হরিণ-চোখা একজন সহপাঠী। তার মুখে ছিলো হাসি

ও চোখে ছিলো মেয়েলোকের লজ্জা। বন্ধুরা পরিচয় করিয়ে দিলো —নাম কাজী নজরুল ইসলাম, বাড়ী বর্ধমান। নোঙ্গরছাড়া জাহাজের মতো ঘুরে ঘুরে সে এই ঘাটে এসে লেগেছে। সে সুন্দর কবিতা লিখে স্কুলের সাপ্তাহিক সভায় পড়ে শোনায়। মাস্টাররা বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন, রবীন্দ্রনাথের না-পড়া কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে।

বন্ধুরা আরও বললে, নজরুল পড়াশোনার ধার ধারে না, দিন-রাত দরাজ গলায় গান গেয়ে বেড়ায়, পাড়ার ছেলে-বুড়ো তার গান শোনার জন্য পাগল। বাড়ীর ছেলেপেলে নষ্ট হয়ে যায় বলে কোনো লোকই তাকে বেশীদিন জায়গীর রাখে না। ফলে, মাসে মাসে একে জায়গীর বদলাতে হয়। বন্ধুরা কিন্তু এ-ও বললে, যদিও নজরুল ইসলামের সাথে বই-পুস্তকের সম্পর্ক খুব কম, ত্রৈমাসিক-ষাণ্মাষিক পরীক্ষায় কিন্তু সে বরাবর ফার্স্ট হয়ে যাচ্ছে। বন্ধুদের এইসব তারিফের শিলাবৃষ্টির নীচে নিরীহ লাজুক নজরুল ইসলাম অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকলো, লজ্জা-জড়িত গলায় মাঝে মাঝে বলতে লাগলো, 'কিছু না, ওসব মিথ্যা কথা, বিশ্বাস করবেন না।' আমরাও সহপাঠীদের নজরুল-স্তুতি অধিকাংশ অবিশ্বাস করে নজরুলের অনুরোধ রক্ষা করলাম। বন্ধুরা যতক্ষণ আমাদের নাটকের অভিনয়ের তারিফ করতে লাগলো, ততক্ষণ নজরুল একবার শামসুদ্দীনের দিকে আর একবার আমার দিকে চেয়ে তু'একবার মাত্র বললেন, 'বই তুটো কি আপনারা নিজেরা লিখেছেন?'

অধিক রাত্রে ওঁরা বিদায় হলেন, আমরা ঘটনাটা স্বভাবতঃই ভুলে গেলাম।

১৯১৯ সালের এক ছুটিতে বাড়ীতে শুয়ে শুয়ে একদিন শামসুদ্দীন ও আমি মাসিক কাগজপত্র পড়ছিলাম। হঠাৎ 'মুসলিম ভারতে' কি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় ঠিক মনে নেই, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী' নামে একটি রস-রচনা পড়লাম। একসঙ্গে

দু'জনে উঠে বসলাম বিস্ময়ে। প্রশ্ন করলাম, 'কার লেখা এটা?' তখন লেখার শেষে লেখকের নাম লেখার রেওয়াজ ছিলো। লেখার শেষে দেখলাম—হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম, করাচী বন্দর। কোনো মুসলমান ভালো বাংলা লিখতে পারে এ-কথা তখন অবিশ্বাস্য ছিলো। 'বিষাদ-সিন্ধু' যে মীর মোশাররফ হোসেন লিখেছেন, এটা সেকালে অনেকেই বিশ্বাস করতেন না। কাজেই আমরা একাধিকবার সেই লেখা পড়লাম। কে এই নজরুল ইসলাম হতে পারে? বাংলার কবি-সাহিত্যিকদের অনেকেরই নাম তখন আমাদের মুখস্ত হয়ে গেছে। অবশেষে দুই বন্ধুতে একমত হলাম, যদি সত্যই এই লেখক মুসলমানই হয়ে থাকে, তবে সে একদিন বাংলা সাহিত্যের একটা দিকপাল হবেই। আমরা তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে, এ আমাদের পাশের গাঁয়ের লাজুক, হরিণ-চোখা সেই নজরুল ইসলাম।

১৯২২ সাল। জীবনে প্রথম কলকাতায় এলাম। বন্ধু শামসুদ্দীন আগে থেকেই কলকাতার বাসিন্দা। তারই মেহমান হলাম। ছাত্রজীবন থেকেই 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র মেম্বার ছিলাম। লেখক হিসাবে এই সময় কিছুটা পরিচয়ও লাভ করেছি। কাজেই কলেজ স্ট্রীটে সমিতির অফিসে সাহিত্যিক বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করবার আয়োজন হলো। পথে যেতে যেতে শামসুদ্দীন বললো, 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনীর লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম কলকাতায় এসেছে হে। বিরাট প্রতিভাশালী লোক, বড়ো রসিক। তোমার সাথে বনবে ভালো। হাসির আওয়াজে সে আসমান ফাটায়। আরো শুনে খুশী হবে—এ সেই দরিরামপুর স্কুলের নজরুল ইসলাম।'

আমি তাঁকে দেখবার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। শামসুদ্দীন বললো 'আজকের সভায় সে আসবে।'

সভায় গিয়ে অন্যান্য সবার সাথে নজরুল ইসলামের পরিচয়

হলো! মিলিটারী ইউনিফর্ম পরা কাঠখোট্টা লোক। কবি বলে পছন্দ হলো না; কিন্তু দেখলাম ১৯১৩ সালের সেই ভাসা ভাসা হরিণ-চোখ আগের মতোই আছে। তাতেই আকৃষ্ট হলাম। সভা শুরু হলো। বন্ধু শামসুদ্দীন আমার তারিফ করে বক্তৃতা করলেন, কিন্তু উপসংহারে চিমটি কাটলেন, বললেন, 'এই নতুন বন্ধুটি সম্পর্কে আপনারা হুঁশিয়ার থাকবেন, তিনি যা গল্প বলবেন তার বারো আনা বাদ দিয়ে মাত্র চার আনা আপনারা বিশ্বাস করবেন।'

সভাশুদ্ধ সকলেই আমার দিকে চেয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো। অন্যান্যের বক্তৃতার পর আমার জবাবের পালা। আমার মতো অযোগ্য লোকের অতশত তারিফ করায় সকলকে যথারীতি ধন্যবাদ দিয়ে উপসংহারে আমি বললাম, 'বন্ধুবর শামসুদ্দীন আমার কথার বারো আনা বাদ দিয়ে মাত্র চার আনা বিশ্বাস করতে আপনাদের পরামর্শ দিয়েছেন; আমি সরলভাবে আপনাদের এই আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাতেও আমার দু'আনা নেট মুনাফা থাকবে।'

হাসির হুল্লোর পড়ে গেল। এ ওর গায়ে ধাক্কা মেরে হাসতে লাগলো; কিন্তু সেই সমবেত হুল্লোড় ছাপিয়ে যে ছাদ-ফাটানো গলাটি শোনা গেলো, সেটা ছিলো নজরুল ইসলামের। তিনি আসন থেকে লাফিয়ে উঠে আমাকে এমন জড়িয়ে ধরলেন যে আমি তাঁর গায়ের অসাধারণ শক্তিতে বিস্মিত হলাম। সেই থেকে নজরুলের সাথে প্রাণে প্রাণে এমন যোগাযোগ হয়ে গেলো আমার, যা বাকী জীবনে অর্থাৎ বাকী সাহিত্যিক-জীবনে আর ছিন্ন হলো না।

স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশে তখন প্রবল আন্দোলন।

শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিয়েই শুনেছি, ইংরেজরা আমাদের রাজা, আর আমরা তাদের পরাধীন প্রজা। কৈশোরের প্রান্তসীমায় এসে লুকিয়ে-চুরিয়ে নিষিদ্ধ বইগুলি পড়ি। সরকার যে বইগুলি বাজেয়াপ্ত করেন, সে বইগুলিই তখন আমাদের পড়ার প্রবল নেশা। মেটসইনি, গ্যারিবল্ডি, সিনফিন আন্দোলন অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন্ দেশ কিভাবে চেষ্টা করছে, তার ইতিহাস জানার যেমন আগ্রহ, অপর দিকে তেমনি 'নির্বাসিতের আত্মকথা' (বিপ্লবী নেতা উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা), ক্ষুদিরাম প্রভৃতি বিপ্লবীদের জীবনী লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়ি। সহপাঠীদের মধ্যে দু'একজন এ-সব বই পড়ার জন্য হাতে তুলে দেয়। কার বই, কোথা থেকে আসে, সে-সব খবর রাখি না।

আমি তখন ছিলাম রানাঘাট পি. সি. এইচ. স্কুলের ছাত্র।

এইভাবে, এই আবহাওয়ায়, সবে মাত্র যখন যৌবনে পদার্পণ করছি, সেই সময় একদিন পরিচিত হয়ে উঠলাম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মন্ত্র-শিষ্য কৃষ্ণনগরের স্বর্গত হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে। নদীয়া জেলায় তিনি তখন ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ছাত্র অবস্থায় একটু-আধটু লিখতে পারতাম বলে হেমন্তদা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

সাল তারিখ আজ আর মনে নেই, একদিন তাঁর অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ কাজী নজরুলকে নিয়ে রানাঘাটে এলেন। কাজী নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন। যতদূর মনে পড়ে, তাঁর 'বিষের বাঁশী' আর 'ফণিমনসা' তখন ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। 'বিষের

বাঁশী' তার আগেই আমি লুকিয়ে পড়ে নিয়েছি। শুধু পড়া নয়, এই বইয়ের কয়েকটি কবিতাও তখন আমার কণ্ঠস্থ হয়ে আছে।

রানাঘাটে, সেই কবিকে সামনে দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লাম। জানতে পারলাম, আমাদের রানাঘাট বাজারের চাঁদনিতে কবি তাঁর স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করবেন, শোনাবেন গান গেয়ে। এ খবর শুনে কবি-কণ্ঠের গান ও কবিতা শুনতে যাবার প্রবল আগ্রহ হলো আমাদের। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেউ কেউ জানালো, পুলিশ গান গাইতে দেবেনা। কবিকে গ্রেপ্তার করবে।

সংশয় সন্দেহ আর ভয় নিয়ে তবুও গেলাম।

লোকে লোকারণ্য।

কবি গান গেয়ে শোনালেন। আবৃত্তি করলেন 'বিদ্রোহী'।

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলো! দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হলো। কিন্তু না, ইংরেজের লাল পাগড়ী কবি বা উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করলো না সেদিন।

হেমন্তদার সঙ্গে কবি আবার কৃষ্ণনগরে ফিরে গেলেন।

এরপর আমি কলকাতায় এসেছি।

'লাঙল' কাগজে কবি 'সাম্যবাদী' আর অন্যান্য কবিতা বেরিয়েছে। গভীর আগ্রহ সহকারে সে-সব কবিতা পড়েছি। শুধু পড়া নয়, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে আবৃত্তি শুনিয়েছি।

লাঙলের সেই কবিতাগুলি একত্র করে 'সাম্যবাদী' বইটি প্রকাশিত হয়। আজও মনে আছে, লাল মলাটের ছোট্ট সেই বইটির কথা। এ বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার বাজেয়াপ্ত করলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের রচনার প্রতি বরাবরই আমার গভীর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ ছিলো।

একসময় কবি উত্তর কলকাতার সিমলা ব্যায়াম সমিতির পাশের গলি সীতানাথ রোডে থাকতেন। তাঁর বাড়ীর খুব কাছাকাছি

থাকতেন কবি-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার। আমি নিজে তখন একটু-আধটু সাহিত্যচর্চা করি, তাই কবি-সাহিত্যিকদের খবর রাখার তখন আমার প্রবল আগ্রহ।

কবির বাড়ীর কাছাকাছি, বিবেকানন্দ রোডে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে তখন প্রায়ই আমি যেতাম। দেখতাম, কবি তাঁর বাড়ী থেকে বেরুতেন চকোলেট রঙের মস্ত বড়ো এক টুরার গাড়ীতে চড়ে। হুড্ ঢাকা গাড়ী।

কবির সেই সৌম্য মূর্তি দেখে দেব-দর্শনের আনন্দ পেতাম।

বিবেকানন্দ রোডের বন্ধুটির কাছে শুনতাম, কবি নাকি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীতে যান। 'কলগীতি' নামে তিনি একটি রেকর্ডের দোকানও করেছেন বিবেকানন্দ রোডে।

সে সময় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ছায়া'র পৃষ্ঠায় কবির ঐ দোকানের একটি ভারী মজার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো :

কলগীতি

১৬ বিবেকানন্দ রোড

আমাদের দোকানের বিশেষত্ব কলগীতির যাঁরা নিয়মিত খরিদ্দার হবেন তাঁদের বাড়ীতে পাঁচটি কোম্পানীর প্রতি মাসে সমস্ত রেকর্ড শুনে পছন্দ করার জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তাঁদের অর্ডারি রেকর্ড ইত্যাদি আমাদের লোক গিয়ে বাড়িতে দিয়ে আসবে।

কাজী নজরুল ইসলাম

স্বত্বাধিকারী।

তা এতো করেও কবি সে দোকান বেশিদিন টেঁকাতে পারেন নি। আসলে তিনি তো আর ব্যবসায়ী ছিলেন না।

আমি তখন মিনার্ভা থিয়েটারের পাশে ফকির চক্রবর্তী লেনে আমার মামার বাড়ীতে থাকতাম।

চিৎপুর রোডের বিষ্ণু ভবনে ছিলো তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর

রিহার্সাল-রুম। প্রায়ই দেখতাম সেই বাড়ীর নীচে চকোলেট রঙের বিরাট গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতাম, কবি এসেছেন গানের মহলায়।

এর কয়েক বছর পরে বাংলা দেশের সমবায় আন্দোলনের মুখপত্র 'ভাণ্ডার' পত্রিকার সহকারী সম্পাদকরূপে আমি যোগদান করি। তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রদ্ধেয় নাট্যকার মন্মথ রায়।

সাত বছর 'ভাণ্ডার' পত্রিকায় চাকরী করার পর লীগ্ মন্ত্রিসভার আমলে, আমার পক্ষে আর ওখানে চাকরী করা সম্ভব হলো না। তাই ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছিলাম।

ঠিক এই সময় ফজলুল হক সাহেব দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। 'নবযুগে' আমিও যোগ দিই।

হক সাহেব কবি নজরুলকে এই পত্রিকার সম্পাদক করে নিয়ে আসেন। এতোদিন পরে, দূরের মানুষটিকে কাছে পেয়ে আমার বহুদিনের বাসনা পূর্ণ হলো, তাঁকে 'কাজীদা' বলে সম্বোধন করার অধিকার লাভ করলাম। আমার দীর্ঘদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো।

নবযুগে অল্পদিনই আমি কাজ করেছি। সেই অল্পদিনের পরিচয়ে আমি বুঝেছিলাম কবি নজরুল শুধু দুর্বারই নন, ভেঙেচুরে শুধু চুরমারই করেন না, সেই সঙ্গে স্নেহের পরশে ভাঙাকে আবার জোড়া লাগাতেও পারেন। সে সময় তাঁকে কবিতায় সম্পাদকীয় লিখতে দেখেছি। বড়ো বড়ো খবরের হেডিংগুলি পর্যন্ত অনেক সময় তিনি দিতেন কবিতার লাইন দিয়ে।

সবিস্ময়ে তখন ভেবেছি, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কবি শুধু ব্যতিক্রম বা অনিয়মই নন, তিনি একক এবং অদ্বিতীয়।

নজরুলের অনুবাদ-চর্চা

সৈয়দ মুজতবা আলী

পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, রাজমহল, শ্রীরামপুর, হুগলী এবং পরবর্তী যুগে কলকাতায় অনেকখানি আরবী-ফারসীর চর্চা হয়েছিলা বটে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এ চর্চা খুব ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। তার প্রধান কারণ অতি সরল—ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে পূর্ব বাংলার মতো ছড়িয়ে পড়তে পারেনি, কাজেই অতি সহজেই অনুমান করা যায়, চুরুলিয়া অঞ্চলে পীর দরবেশের কিঞ্চিৎ সমাগম হয়ে থাকলেও মৌলবী-মৌলানারা সেখানে আরবী-ফার্সীর বড়ো কেন্দ্র স্থাপন করতে পারেন নি।

তদুপরি নজরুল ইসলাম ইস্কুলে···খুব বেশী আরবী-ফার্সী চর্চা করেছিলেন তা মনে হয় না। ইস্কুলে তিনি আদৌ ফার্সী (আরবীর সম্ভাবনা নগণ্য) অধ্যয়ন করেছিলেন কি-না, সে সম্বন্ধেও আমরা বিশেষ কিছু জানিনে।

তারো পরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে তিনি যে এ সব ভাষায় খুব বেশী এগিয়ে গিয়েছিলেন তাও তো মনে হয় না। তবু নজরুল ইসলাম মুসলিম ভদ্রঘরের সন্তান। ছেলেবেলায় নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আলিফ, বে, তে করেছেন। দোয়া-দরুদ (মন্ত্র-তন্ত্র) মুখস্থ করেছেন, কুরান পড়াটা রপ্ত করেছেন। পরবর্তী যুগে তিনি কুরানের শেষ অনুচ্ছেদ 'আমপারা' বাংলা ছন্দে অনুবাদ করেন—হালে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। সে পুস্তিকাতে তাঁর গভীর আরবী জ্ঞান ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে তাঁর কবিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টি এবং 'আমপারা'র সঙ্গে তাঁর আবাল্য পরিচয়। বিশেষ করে ধরা পড়ে, দরদ দিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী (আল্লার 'কালাম') হৃদয়ঙ্গম করার তীক্ষ্ণ এবং সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা।

এরই উপর আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। ফার্সী তিনি বহু মোল্লা-মৌলবীর চেয়ে কম জানতেন, কিন্তু ফার্সী কাব্যের রসাস্বাদন তিনি করেছেন তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী।

কাজী রোমান্টিক কবি। বাংলা দেশের জল-বাতাস, বাঁশ-ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে বহুলোকে নিয়ে যেতো, ঠিক তেমনি ইরান-তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে। ইরানে তিনি কখনো যান নি, সুযোগ পেলেই যে যেতেন, সে-কথাও নিঃসংশয়ে বলা যায় না, কিন্তু ইরানের গুল-বুলবুল, শিরাজী-সাকী তাঁর চতুর্দিকে ক্রমশই এমন এক জানা-অজানার ভুবন সৃষ্টি করে রেখেছিলো যে, গাইড-বুক টাইম-টেবিল ছাড়াও তিনি তার সর্বত্র অনায়াসে বিচরণ করতে পারতেন।

আরব ভূমির সঙ্গে কাজী সাহেবের যেটুকু পরিচয়, সেটুকু প্রধানতঃ ইরানের মারফতেই। কুরান শরীফের 'হারানো ইউসুফের' যে করুণ কাহিনী বহু মুসলীম অমুসলীমের চোখের জল টেনে এনেছে তিনি কবিরূপে তার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ফার্সী কাব্যের মারফতে:

দুঃখ করো না, হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥
ইউসুফে গুম্‌গশ্‌তে বা'জ আয়দ রকিনান্‌
গম্‌ ম্‌-খূর্‌!
কুল্‌বয়ে ইহ্‌জান শওদ্‌ রূজি গুলিস্তান্‌
গম্‌ ম্‌-খূর্‌॥

কাজী সাহেবের প্রথম যৌবনের রচনা এই ফার্সী কবিতাটির বাংলা অনুবাদ অনেকেরই মনে থাকতে পারে। 'মেবার পাহাড়, মেবার পাহাড়'এর অনুকরণে 'শাতিল আরব, শাতিল আরব' ঐ যুগেরই অনুবাদ।

কোনো কোনো মুসলমান তখন মনে মনে উল্লসিত হয়েছেন এই ভেবে যে, কাজী 'বিদ্রোহী' লিখুন আর যা-ই করুন, ভিতরে ভিতরে তিনি খাঁটি মুসলমান। কোনো কোনো হিন্দুর মনেও ভয় হয়েছিলো (যাঁরা তাকে অন্তরঙ্গভাবে চিনতেন তাঁদের কথা হচ্ছে না) যে, কাজীর হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি বোধ হয় বাংলার জন্য নয়—তাঁর দরদ বুঝি ইরান-তুরানের জন্য। পরবর্তী যুগে—পরবর্তী যুগে কেন, ঐ সময়েই, কবিকে যাঁরা ভালো করে চিনতেন, তাঁরাই জানতেন, ইরানী-সাকীর গলায় কবি যে বার বার শিউলির মালা পরিয়ে দিচ্ছেন তার কারণ সে সুন্দরী-ইরানের বিদ্রোহী কবিদের নর্ম-সহচরী ব'লে- ইরানের বিদ্রোহী-আত্মা কাব্যরূপে, মধুররূপে তার চরম প্রকাশ পেয়েছে সাকীর কল্পনায়।

ঐক্যের প্রতীক

দক্ষিণারঞ্জন বসু

১৯৩৮ সালের এক সঙ্গীতমুখর সান্ধ্য বৈঠকের কথা। 'অগ্নিবীণা'র কবি নজরুল তখন হরি ঘোষ স্ট্রীটের অধিবাসী। আমি তাঁর প্রতিবেশী। কর্নওয়ালিস স্ট্রীটের উপর এক মাসিক সাহিত্য-পত্রের কার্যালয়ে নজরুল একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন—গজল, ভাটিয়ালি, স্বদেশী ও শ্যামাসঙ্গীত। আমরা সব নির্বাক বিমুগ্ধ শ্রোতা, সেই প্রাণমাতানো মুক্তকণ্ঠ আজ স্তব্ধ।

তারও পনেরো-ষোল বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। আমরা তখন স্কুলের ছাত্র, উদ্বেলিত তরুণ সমাজ, কবি নজরুলের 'ধূমকেতু'র আকস্মিক আবির্ভাবে আমরা চমকিত। এক পয়সার সেই সাপ্তাহিকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এক আশীর্বাণীতে আহ্বান জানিয়েছেন বিদ্রোহী কবিকে। তাতে কবিগুরু লিখেছেন :

'অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক্ না লেখা
জাগিয়ে দে রে ধমক মেরে
আছে যারা অর্ধ-চেতন।'

দেশের সেই মূক অর্ধ-চেতন মানুষদের জাগিয়ে দেবার জন্য কবি নজরুল কতো কি না করেছেন! নিজের সমস্ত চেতনাকে বিলিয়ে দিয়েই কি তিনি আজ লুপ্তচেতনা? সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতার জন্য নজরুল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন সমাজের বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে, সমস্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। যা বিশ্বাস করতেন স্পষ্ট ভাষায় তা প্রকাশ করতে কখনও তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বিদ্রোহী কবি তাঁর সেই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের কথাই প্রকাশ করেছেন 'ধূমকেতু'র একটি প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, 'বিদ্রোহের

মতো বিদ্রোহ যদি করতে পারো, প্রলয় যদি আনতে পারো, তবে নিদ্রিত শিব জাগবে—কল্যাণ আসবেই।'

এমনি ভাষায় যাঁর লেখনী কথা বলে ইংরেজ শাসনে তাঁর পক্ষে কতোদিন আর বাইরে থাকা সম্ভব? 'ধূমকেতু'র প্রথম শারদীয় সংখ্যার একটি কবিতার সত্য ভাষণে ইংরেজ শাসনের বুনিয়াদ যেন নড়ে উঠলো, দশভুজা দুর্গার বন্দনায় কবি প্রশ্ন তুললেন:

'আর কতকাল রইবি বেটি
মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল?
স্বর্গকে আজ জয় করেছে
অত্যাচারী শক্তি-চাড়াল।
দেব-শিশুদের মারছে চাবুক,
বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা
আসবি কখন সর্বনাশী?'

এই বিদ্রোহের আহ্বানে প্রমাদ গুণলো ইংরেজ সরকার। 'ধূমকেতু'র সমস্ত শারদীয় সংখ্যা বাজেয়াপ্ত হলো। কবি নজরুল গ্রেপ্তার হলেন।

পরের বছর ৮ই জানুয়ারী ব্যাংকশাল কোর্টের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিদ্রোহী নজরুল উদাত্ত কণ্ঠে যে জবানবন্দী দিয়েছিলেন, সর্বদেশের সর্বকালের রাজনৈতিক মামলার ইতিহাসে তেমন নজীর খুব বেশী নেই। জবানবন্দীর এক স্থানে তিনি বলেছিলেন, '—আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি। আমি জানি এবং দেখেছি আজ এই আসামীর পিছনে স্বয়ং সত্য সুন্দর ভগবান দাঁড়িয়ে। যুগে যুগে তিনি এমনি নীরবে তাঁর রাজবন্দী সত্য-সৈনিকের পশ্চাতে এসে দণ্ডায়মান হন। রাজ-নিযুক্ত বিচারক সত্য-বিচারক হতে পারেন না। এমনি বিচার প্রহসন করে যেদিন খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো, গান্ধীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো, সেদিনও ভগবান

এমনি নীরবে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের পিছনে এসে। বিচারক কিন্তু তাঁকে দেখতে পাননি, তাঁর আর ভগবানের মধ্যে সম্রাট দাঁড়িয়ে ছিলেন। সম্রাটের ভয়ে বিচারকের বিবেক, দৃষ্টি অবাক হয়ে গেছলো।'

সেই জবানবন্দীরই আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন, 'আমার বাঁশী কেড়ে নিলেই বাঁশীর সুরের মৃত্যু হয় না। কেননা আমি আর এক বাঁশী নিয়ে বা তৈরী করে তাতে সেই সুর ফুঁ দিতে পারি। সুর আমার বাঁশীতে নয়, সুর আমার মনে এবং আমার বাঁশীর সৃষ্টির কৌশলে।...দোষ আমারও নয়—দোষ তাঁর, যিনি আমার কর্ণে বীণা বাজান। প্রধান রাজদ্রোহী সেই বীণাবাদক ভগবান। তাঁকে শাস্তি দেবার মতো রাজশক্তি বা দ্বিতীয় ভগবান নাই।'

সেই 'মহাবিদ্রোহী'ই আজ এমন 'রণক্লান্ত' যে, তাঁর মুখে আর কোনো ভাষা নেই। অথচ তিনিই বলেছিলেন ঃ

'আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে, রণিবে না—।'

আজও তো অত্যাচার অবিচারের অবসান ঘটেনি, আজও নজরুলের সাধের বাংলার উপর দিয়ে প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে চলেছে, তার বিরুদ্ধে কবি তো আর গর্জে ওঠে না, বাংলার এ দুর্দিনেও কী করে তিনি এমন শান্ত সমাহিত? এক এক সময় মনে হয়, এটাই বোধহয় স্বাভাবিক। কবি হয়তো তাঁর ভগবানের কাছে এ প্রার্থনাই করেছিলেন, বিদীর্ণ বাংলা, বিভক্ত বাঙালীর বেদনাবোধকে যেন কখনো তাঁকে অনুভব করতে না হয়। তাঁর সেই প্রার্থনা আমরা শুনতে পাইনি, বুঝতে পারিনি—তাঁর স্বপ্নের ঐক্যবদ্ধ সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের বাংলাকে আমরা খণ্ডিত করেছি, তাঁর সাধনার সমাধি ঘটিয়েছি। তাইতো কবি আজ বিস্ময়-স্তব্ধ।

দুই বাংলার ঐক্যের প্রতীক হিসাবে বিদ্রোহী কবি নজরুল শুধুমাত্র দেহ ধারণ করেই আমাদের মধ্যে আজও বর্তমান।

তখন নজরুল কাজ করতেন 'সওগাত' পত্রিকায়। ওখান থেকে মাসিক আয় ছিলো কম পক্ষে দুশো টাকা। তা ছাড়া বিভিন্ন রচনা আর বই লিখেও বেশ কিছু পেতেন। সুতরাং আর্থিক অবস্থা তখন সচ্ছল ছিলো বললেই চলে। দুর্দিনে তিনি যেমন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাতেন, সুদিনের স্পর্শ পেয়েও কিন্তু তিনি তাঁদের ভোলেন নি। বরং আরও ঘনিষ্ঠতর করে নিয়েছিলেন।

শুধু মাত্র বিদ্রোহী কবি, একনিষ্ঠ সাংবাদিক বা নির্ভীক দেশ-প্রেমিক হিসাবে নয়, একজন বিশিষ্ট ক্রীড়ামোদী হিসাবেও তিনি ছিলেন বিশেষ পরিচিত। খেলাধুলোর নামে ছিলেন পাগল। প্রতিদিনই অফিসের কাজ শেষ করে কবি বিকেলে বেরিয়ে পড়তেন খেলার মাঠে। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা। প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশরঞ্জন দাস, অরিন্দম বসু প্রভৃতি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সেদিন ছিলো একমাত্র বাঙালী দল মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে আর. ডি. সি. এল. আই. দলের ফুটবল প্রতিযোগিতা। বাঙালী খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি মাত্র দল মোহনবাগান। তাও আবার খেলবে বিদেশী খেলোয়াড়-দলের বিরুদ্ধে। তাই বেশ চাঞ্চল্য দেখা দিলো ঐ খেলা নিয়ে।

সবাই জানতো, ঐ আকর্ষণীয় খেলার টিকিট সংগ্রহ করা ভার হবে। তাই অনেক চেষ্টা করেও নজরুলের বন্ধু-বান্ধবেরা কোনো টিকিট সংগ্রহ করতে পারলেন না। ব্যর্থ মনোরথে তাঁরা এলেন কাজীর অফিসে। আগে থেকেই নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন ব্যাপারটা। তাই সংগ্রহ করে রেখেছিলেন বন্ধুদের জন্য টিকিট।

গেলেন তাঁরা খেলার মাঠে। শুরু হোলো খেলা। কাজীর পাশে সবাই দাঁড়ালেন হুঁশিয়ার হয়ে। কারণ, খেলা দেখতে গিয়ে বাহ্যিক জ্ঞান থাকতো না তাঁর। তিনি খেলার ভাবরাজ্যে ডুবে থাকতেন। জ্ঞানশূন্য কাজী নিজের অজান্তে পাশের লোককেই বল ভেবে হয়তো পদাঘাত করে বসতেন; উল্লাস প্রকাশ করতে যেতে হয়তো বা 'গোল-গোল' বলে লাফিয়ে উঠতেন। তাঁর আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখে মাঠের অন্যান্য দর্শকরাও হতো বিস্ময়-বিমুগ্ধ।

চললো খেলা। মোহনবাগান দল ৭-১ গোলে পরাজিত করলো বিদেশী দলকে (সম্ভবতঃ ১৯২৭ খৃঃ)। এবার কে আর দেখে নজরুলের আনন্দ! প্রকাশ্য মাঠে তিনি শুরু করলেন উল্লাস নৃত্য। তারপর বন্ধুদের নিয়ে ঢুকলেন খাবারের দোকানে। কিন্তু কে আর কতো খাবে? তাঁর পকেট যে ছিলো গরম। কারণ, ঐদিন পেয়েছিলেন তিনি 'সওগাত' অফিস থেকে কিছু টাকা। সেগুলোর তো সদ্ব্যবহার করা চাই! তাই তিনি প্রস্তাব করলেন সবাইকে নিয়ে চন্দননগর যাবেন। কে আর তাতে গররাজী হয়? সবাই একমত। কারোর বাড়ীতে কোনো খবর না দিয়ে ওখান থেকেই সবাই চললেন চন্দননগর। কিন্তু ওখানে যেয়েও যেন তাঁদের সাধ মিটলো না।

নজরুল সবাইকে বললেন, 'চলো ঢাকা থেকে ঘুরে আসা যাক।' অদ্ভুত খেয়াল। কোথায় চন্দননগর আর কোথায় বা ঢাকা। কিন্তু বাসনা যেখানে অতৃপ্ত, সাধ যেখানে দুরন্ত, সেখানে কি আর ভৌগোলিক দূরত্বের বাধা থাকে? এক জামা-কাপড়ে বাঁধনহারা নজরুলের নেতৃত্বে সবাই বেরিয়ে পড়লেন ঢাকার পথে। সেই রাত্রেই চন্দননগর থেকে হাজির হলেন তাঁরা শিয়ালদা স্টেশনে। টিকিট করতে গিয়ে খেয়াল হলো। হিসাব করে দেখলেন, নজরুলের পকেটে যা টাকা আছে, তাতে তো অতগুলো প্রাণীর ঢাকা ঘুরে আসা সম্ভব নয়। আর সবার পকেটই যে শূন্য। পড়লেন এবার

ভাবনায়। টাকার অভাবে কি এতবড়ো একটা আনন্দ-সূচী বাতিল করা যায়? তাই রসিক নজরুল আঁটলেন নতুন ফন্দী। বললেন, 'ঘাবড়াও মত্'। এগিয়ে গেলেন তিনি স্টেশনের প্রবেশদ্বারে। টিকিটপরীক্ষক তো তাঁকে দেখে অবাক। শ্রদ্ধাভরে নমস্কার জানালেন কবিকে:

গৈরিকবসন পরিহিত, সুদীর্ঘ কেশধারী, বলিষ্ঠ পুরুষ নজরুল তখনকার দিনে প্রায় সকলেরই ছিলেন পরিচিত। নজরুল প্রতি-নমস্কার জানিয়ে বললেন, 'আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা আছে। আমরা যাবো ঢাকা। কিন্তু টাকা যা আছে, তাতে হয়তো এতোগুলো লোকের খরচ কুলোবে না।' বলেই আবার বললেন, 'আমরা ভেণ্ডার গাড়ীতেই যেতে রাজী আছি।'

ব্যবস্থা হয়ে গেলো চেপে বসলেন তাঁরা ইস্টবেঙ্গল মেলে। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে গিয়ে পৌঁছলেন তাঁরা গোয়ালন্দ স্টেশনে।

স্থলপথ শেষ। বাকী পথ যেতে হবে জাহাজে। কিন্তু এতোগুলো লোকের জাহাজের টিকিট হবে কি দিয়ে? আর না হলেই বা চলবে কেন? এই দূরদেশে তো আর কেউ চিনবে না তাঁদের। তাই নজরুল পড়লেন ভারী মুস্কিলে! কিন্তু যেখানে মুস্কিল, সেখানেই তো তার আসান। নজরুল কী ভাবলেন কে জানে। খানিকক্ষণ পরে বন্ধুদের কী যেন নির্দেশ দিয়ে একখানা টিকিট আর একখানা মাদুর কিনে জাহাজে উঠে পড়লেন তিনি। জাহাজের পুরোভাগে 'ডেক'এ তিনি মাদুরখানা পেতে বসে পড়লেন। অন্যান্য বন্ধুরাও এরই মধ্যে এসে হাজির। অথচ টিকিট ছিলো না তাঁদের একজনেরও। নজরুল এবার হাঁটু-মুড়ে বসলেন মাদুরের উপর। আর ধরলেন 'গজল' গান। তাঁকে ঘিরে বসা বাকী বন্ধুরা কেউ মাথা নাড়িয়ে, কেউ বা হাততালি দিয়ে তালের সমতা রাখতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে ভীড় জমে গেলো। শুধু যাত্রীরাই নয়, নজরুলের ভরাট গলার গজল শুনে জাহাজের কর্মচারীরাও আকৃষ্ট হলেন।

ব্যাপার হলো গুরুতর। একপাশে বেশী ভীড় হওয়ায় একদিকে কাত হয়ে পড়লো জাহাজ। জাহাজ চালানো মুস্কিল হয়ে দাঁড়ালো। তাই জাহাজের কাপ্তেন রেগেমেগে নেমে এলেন। কিন্তু রাগ করবেন কার সাথে? তিনিও মজে গেলেন অতো সুন্দর গজল শুনে।

কাপ্তেন এবার নজরুল এবং তাঁর বন্ধুদের জাহাজের মাঝখানে বসে গজল গাইতে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন। জাহাজের টিকিট পরীক্ষকও গজল শুনে অভিভূত হলেন। ভুলে গেলেন তিনি যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করে দেখার কথা। নিজের হারমোনিয়াম আর তবলা নামিয়ে দিলেন নজরুলের বন্ধুদের, আর খোঁজ নিতে লাগলেন, তাঁদের কোনো অভাব-অভিযোগ আছে কিনা।

বন্ধুদল নিয়ে রসিক নজরুল এবারে পৌঁছলেন ঢাকা শহরে। কিন্তু মুস্কিল হলো তাঁদের থাকা-খাওয়া নিয়ে। এতোগুলো লোক নিয়ে তো আর যে কোনো একটা বাড়ীতে ওঠা সম্ভব নয়! তাই পড়লেন ভারী ভাবনায়। অনেক ভেবে তাঁরা বিভক্ত হলেন ক'টি দলে। তারপর ছোটো ছোটো দল নিয়ে কয়েকজন খুঁজতে বেরুলেন নিজ নিজ আত্মীয়-বাড়ী। নজরুল, বুদ্ধদেব বসু ও আর ক'জন মিলে হলেন এক দলের দলী। বুদ্ধদেববাবুর ভগ্নিপতি তখন ঢাকার একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তাই এ দলের ভার নিতে হলো তাঁকেই; কিন্তু যা একটু ভাবনায় পড়লেন নজরুলকে নিয়ে। কারণ, তখনকার দিনে আমাদের সমাজ আজকের মতো এতোটা অগ্রণী ছিলো না। ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথা আর ব্যর্থ কৌলিন্যের বড়াই সমাজে বর্তমান ছিলো। তাই নজরুলকে 'নজরুল' পরিচয়ে তো আর তাঁর আত্মীয়-বাড়ী নেওয়া সম্ভব নয়। ওখানে তাহলে হয়তো আর তাঁদেরও ঠাঁই মিলবে না।

ভাবলেন। সবাই ভাবলেন, কী করা যায়। অনেক ভেবে তাঁরা নজরুলের অস্থায়ী নাম রাখলেন স্বামী রামানন্দ। বেশ মানানসই হলো নামটি। কারণ আগেই বলেছি, নজরুল পরতেন

তখন গৈরিক বসন, বাউলের মতো ছিলো তাঁর সুদীর্ঘ কেশ। তাছাড়া তাঁর বলিষ্ঠ দেহ ও দৃপ্ত চোখে-মুখেও ছিলো এক অপূর্ব দীপ্তি। তাই স্বামী রামানন্দ না বলে, নজরুলকে 'নজরুল' বলে কার সাধ্য? কৌতুক-প্রিয় বন্ধুদের সাথে নজরুলকে নিয়ে বুদ্ধদেববাবু এবার হাজির হলেন তাঁর আত্মীয়-বাড়ী, সন্ন্যাসীবেশী নজরুলকে দেখে বাড়ীর লোক তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। বুদ্ধদেববাবু নজরুলকে বেলুড়মঠের 'রামানন্দ বাবাজী' বলে পরিচিত করালেন। মুহূর্তেই বাড়ীর মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেলো। সবাই হলেন মহাখুশী। লোকে যাঁকে ডেকে পায় না, তিনি কিনা অযাচিত অতিথি! সৌভাগ্যবান তো তাঁরা বটেই! সাধক পুরুষের পদধূলি পেয়ে বাড়ীর সবাই ধন্য হলেন। পাড়া-পড়শীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়লো 'বাবাজী'র নাম। সবাই তাঁর দর্শনলাভ করতে আসতে লাগলো। ভক্তি-প্রণাম জানিয়ে ছোটো-বড়ো হলো ধন্য! এবার আসতে লাগলো মিঠাই-মণ্ডা, ফলমূল, কতো রকম ভেট। রাজার হালে কাটতে লাগলো তাঁর 'বাবাজী-জীবন'।

নজরুলের প্রতিভা ছিলো বহুমুখী। গণক হিসাবেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিলো। হাত দেখে লোকের ভূত-ভবিষ্যৎ বলতে তিনি ছিলেন অব্যর্থ। তা ছাড়া বেদ-বেদান্ত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হিন্দু-ধর্ম-পুস্তকের উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ও হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে তাঁর অসামান্য পাণ্ডিত্য তো ছিলোই, শ্যামাসঙ্গীতেও ছিলেন তিনি পটু। তাই, তাঁর এই গুণাবলী 'বাবাজী-জীবনে' বেশ কাজে লেগেছিলো। মাঝে মাঝে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত গীতার শ্লোক, সারগর্ভ ধর্মালোচনা এবং সময়-সুযোগ মতো শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়ে সমাগত পুণ্যলোভী ভক্তবৃন্দকে অভিভূত করে তুলতেন। অনুরক্ত ভক্তবৃন্দও বেশ দু'বেলা আসতো 'বাবাজী'র দর্শনলাভ করতে, আর ধর্মালোচনা শুনতে

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নেই

চিত্তরঞ্জন দেব

বাংলা দেশের এক কবি। মানুষের চেয়ে বড়ো তাঁর কাছে আর কিছুই নেই। কোনো মানুষ তাঁর কাছে এসে হাত পাতলে তিনি পকেট ঝেড়ে সব দিয়ে দেন। সেজন্য তাঁর হাতে কোনোদিনই পয়সা থাকে না। নিত্যদিনের অভাব লেগে থাকে তাঁর। মাঝে মাঝে ওঠেন গিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে। সেখানেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঘুরে বেড়ান সারা দেশে। তাঁর কবিতা ও গান শোনবার জন্য দেশের সকল মানুষ ব্যাকুল হয়ে থাকে। মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের আনন্দ বিধান করাই তাঁর একমাত্র নেশা।

এক বন্ধুর বাড়ীতে আসর বসেছে গানের। একটি তিন বছরের মেয়ে এসেছে। এই শিশুটিকে আদর করতে করতে কবি বললেন, 'তোমাকে সমস্ত কলকাতাটা মোটরে করে ঘুরিয়ে দেখাবো একদিন, কেমন ?'

শিশুটি এসেছিলো গ্রাম থেকে। ফিরে যাবার সময় হলো তার। হঠাৎ যখন আবার কবিকে দেখতে পেলো, সে দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, 'তুমি যে বলেছিলে মোটরে করে কলকাতা দেখাবে ?'

শিশুর কথায় কবি যেন লজ্জা পেলেন। অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনই বেরিয়ে গিয়ে একটি ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এসে তাতে চড়ে বেরিয়ে পড়লেন কলকাতা প্রদক্ষিণে। যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, পরেশ-নাথের মন্দির, লাটসাহেবের বাড়ী এবং আরও যা যা দেখার আছে, সব দেখিয়ে নিয়ে শেষে মনে পড়লো দক্ষিণেশ্বরের কথা—গেলেন সেখানেও। ফিরে এসে যখন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে যাবেন, দেখেন যে, একটি পয়সা নেই পকেটে। আবার সেই ট্যাক্সিটা নিয়েই ছুটলেন পয়সার জন্য। এ-বন্ধু সে-বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে

ট্যাক্সিওয়ালাকে দিলেন প্রায় পঁচিশ টাকা। এমনি ছিলেন বেহিসাবী। কিন্তু এতে তাঁর কোনো দুঃখ ছিলো না। এর মূলে ছিলো মানুষকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসারই সুখ। পয়সা উপার্জন কম হয়নি তাঁর, কিন্তু দারিদ্র ছিলো তাঁর নিত্যসঙ্গী। দারিদ্রকে তিনি ভয় যে করতেন না, তার প্রমাণ আছে তাঁরই রচনায় :

'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছো মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খৃষ্টের সম্মান…'

তাঁর শিশু-প্রীতি আমাদের খৃষ্টের কথাই মনে করিয়ে দেয়। খৃষ্টের মানব-প্রীতির আদর্শ তিনি জীবনে স্বাভাবিকভাবেই পেয়েছিলেন। সেজন্য যেখানেই মানুষের প্রতি মানুষের দরদের অভাব লক্ষ্য করেছেন, সেখানেই তিনি সকল মানুষের স্রষ্টা পিতা ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

'তব মসজিদে, মন্দিরে, প্রভু নাই মানুষের দাবী—
মোল্লা, পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।'

আমাদের সমাজে যারা দীন, তুচ্ছ—সেই মজুর, মুটে কুলিদের কথাও ভগবানের কানে তুলেছেন এই কবি। বলেছেন :

'তোমারে সেবিতে যাহারা হইল
মজুর মুটে ও কুলি
তোমারে বহিতে যারা পবিত্র
অঙ্গে লাগালো ধূলি—
তারাই মানুষ তারাই দেবতা,
গাহি তাহাদের গান
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে
আসে নব উত্থান।'

মানুষের কবি বিদ্রোহী নজরুলের এই ভবিষ্যদ্বাণীর দিকে উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছি আমরা। তিনি আজ স্তব্ধ, জীবন্মৃত, কিন্তু তাঁর বাণীতে তিনি চিরমুখর, চিরচঞ্চল।

ফুলের জলসায়

বিশ্বনাথ দে

কলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চলে বিখ্যাত কে. বি. ক্লাব। বাংলা সাহিত্য-শিল্পের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ এর সর্বে-সর্বা। এই দলের মধ্যে ছিলেন হাসির গানের বিখ্যাত গায়ক শ্রীনলিনীকান্ত সরকার ও সারদা গুপ্ত, অভিনেতা স্বর্গীয় জহর গাঙ্গুলি, শ্রীবরদা গুপ্ত, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, স্বর্গীয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস, শ্রীপরিমল গোস্বামী প্রমুখ।

সব বারের মতো সেবারেও দোলের দিনে কে. বি. ক্লাবে সারারাত্রি ব্যাপী এক জলসার আয়োজন করা হয়েছে।

বাড়ীর উঠানের বিরাট নাটমঞ্চের উপর প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। অজস্র ফুলের সমারোহের মধ্যে দোলনায় দুলছে রাধা-কৃষ্ণ।

এই গানের জলসায় গান গাইবার জন্য বন্ধু নলিনীকান্ত নিয়ে এলেন কবি নজরুলকে। বসতে দেওয়া হলো কবিকে নাটমঞ্চের উপরে জলসার আসরে।

কবি সেখানে বসে তাঁর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-গল্পে মেতে উঠেছেন, এমন সময় ক্লাবের উদ্যোক্তাদের ডাক এলো বাড়ীর অন্দর-মহল থেকে।

সারদা গুপ্ত গেলেন ভিতরে। গিয়ে দেখেন সেখানে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে গেছে। ভীষণভাবে রেগে উঠেছেন বাড়ীর গৃহিণী।

সারদাবাবুকে দেখেই বলে উঠলেন, 'এ তোমরা কি শুরু করেছো কি?'

সারদাবাবু বিস্ময়ে হতবাক। বললেন, 'কেন, কি হয়েছে?'

'কি হয়েছে মানে? ঠাকুরের নাটমঞ্চের উপরে মুসলমানকে

তুলে বসিয়েছো, আবার জিজ্ঞেস করছো কি হয়েছে?—জানো না ওখানে পুজো হয়? তোমরা যে জাত-ধর্ম কিছুই রাখলে না!—হোক না যতো বড়োই কবি, তাই বলে ওখানে তুলে বসাবে একেবারে? যাও, নাবাও গে ওখান থেকে।'

বকুনি খেয়ে সারদাবাবু অপ্রস্তুত। ভীষণ চিন্তিত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এবার তাঁর হলো ত্রিশঙ্কু অবস্থা। কবিকে আর ওখানে বসে থাকতে বলতে পারেন না, আবার তাঁর প্রিয় কাজীদাকে ওখান থেকে উঠে আসতে বলাও তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

তাই কয়েকজন মিলে যুক্তি করে ঠিক করলেন, জলসার শুরুতে প্রথমেই গান গাইতে দেবেন কাজীদাকে। আর গান গাওয়া হয়ে গেলে কাজীদা নিশ্চয়ই চলে যাবেন। নিজেদের মুখে আর তাঁকে চলে যেতে বা ওখান থেকে নেমে যেতে বলতে হবে না।

এই ভেবে জলসার শুরুতেই কবিকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করা হলো।

কবি তখন নাটমঞ্চের দেবতার সামনে, দোলনায় দোলা রাধা-কৃষ্ণের ফুলের সমারোহের দিকে তাকিয়ে ভাব-বিভোর হয়ে গেছেন। উঠে দাঁড়িয়ে ভাবাবেগে অর্ধ-নিমিলিত চোখে গাইতে শুরু করেছেন:

'আমি শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে
জপি শ্যামা-মায়ের নাম।
শ্যামা হলেন মোর মন্ত্র-গুরু
আর ঠাকুর হলেন রাধার শ্যাম।'

ভাব-বিভোর কবির এই গান শুনে সকলেই হলেন স্তব্ধ। আশ্চর্য এক জ্যোতির্ময় আভায় কবির সারা মুখমণ্ডল যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। পরম যোগীর মতো আকুল আন্তরিকতা ফুটে উঠলো তাঁর গানে আর সুরে।

গান শেষ হতে বাড়ীর ভিতরের সেই গৃহিণী, যিনি কবিকে নাটমঞ্চে ওঠানোতে হৈ-চৈ বাধিয়েছিলেন, তিনিই সবার আগে কবিকে প্রণাম করবার জন্য বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলেন।

বাড়ীর ভেতর থেকে কবি-কণ্ঠের এই গান শুনে তিনি ক্রমেই এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁর মনে ছিলো না—বাড়ীর বাইরে এতো লোকের ভীড়ের মধ্যে যাওয়া তাঁর পক্ষে অশোভন হবে।

কবি নজরুলের ব্যক্তিত্ব ছিলো এমন যে, সব রকম পরিবেশের সমস্ত আঘাত-অপমান তিনি জয় করতে পারতেন। যে তাঁকে যতো আঘাত হানতো, তার থেকে অনেক বেশী শ্রদ্ধা-সম্মান-ভালোবাসা তিনি তার কাছে আদায় করে নিতে পারতেন।

জীবন-সায়াহ্নে কবি নজরুল

আজহারউদ্দিন খান

জীবন-সায়াহ্নের কবিকে আমি দেখতে গেছলুম। কবি তখন ছিলেন বাদুড়বাগান লেনে। কবিকে কিরূপ দেখেছিলুম তার পরিচয় নিয়ে আমার ডায়েরী থেকে তুলে দিলুম :

৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯। কলকাতায় গেছলুম জরুরী কাজে। ইচ্ছে হলো কবি নজরুলকে দেখবার। মনে ভয়ও ছিলো কেমন না জানি তাঁকে দেখবো ; তাড়াতাড়ি কাজ সেরে কবিকে দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখলুম কবির স্ত্রী একটি খাটে শায়িতা, তাঁর পালিতা মেয়েটি কাপড় সেলাই করছেন ও অনিরুদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটা পত্রিকা ওলটাচ্ছেন। আমাকে হঠাৎ দেখে একটু থমকিয়ে গেলেন ; আমি কেন এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন অনিরুদ্ধ ; আমার ইচ্ছে তাঁকে জানালুম। কবির স্ত্রীর সঙ্গে প্রথমে এমনি সাধারণ পরিচয়ের কথাবার্তা হলো ; কথাবার্তায় জানলুম—তিনি পাশ ফিরতেও পারেন না, নীচের অঙ্গ পক্ষাঘাতে একেবারে অচল, অতি কষ্টে চিঠি-পত্রের উত্তর দেন। কথাবার্তা হতে হতে হঠাৎ দেওয়ালে টাঙানো কবির ছবি দেখলুম। কি অপরূপ সুন্দর ছবিখানা। ছবিটি দেখে মনটা একটু গুমরিয়ে উঠলো—সেই উজ্জ্বল প্রোজ্জ্বল মহান্ মুখশ্রী, সেই তীক্ষ্ণ আরক্ত অপাঙ্গ চোখ, সেই উদার গম্ভীর স্বচ্ছ ললাট। আর কি দেখবো ? ছবি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলুম। মুখ নীচু করে বসে আছি। এমন সময় কবির পালিত কন্যা উঠে গিয়ে পাশের ঘরের কপাট খুললেন। কবি নজরুল বেরিয়ে এলেন। চমকে উঠলুম ; এ নজরুলকে দেখে চোখ কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, ইনিই বিদ্রোহী কবি নজরুল। পরনে একটি লুঙ্গি ও ধূসর বর্ণের হাফসার্ট। মুখে একটা উত্তেজনার ভাব ফুটে বেরুচ্ছে,

তাঁর সেই বিদ্রোহী প্রাণশক্তির ছাপ অস্তরাগের বিলীয়মান আভার মতো মুখে খেলা করছে। দরজার পাশেই আসন পাতা, চারিদিকে বিভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আসনে বসে পড়লেন তিনি; পাশেই পুরোনো মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি ছেঁড়া অবস্থায় গুটোনো রয়েছে। সেগুলি পাতার পর পাতা উলটিয়ে চলেছেন—পড়েন না। যখন সবগুলি ওলটানো শেষ হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে ফিরিয়ে গোছ করে আবার উলটিয়ে চলেছেন। কথাবার্তা বলেন না—মাঝে মাঝে কি একটা বলছেন তা জড়িয়ে যাচ্ছে—বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কবির স্ত্রী বললেন, 'কথাবার্তা তো বলেন না। যখন কপাট খুলে দেওয়া হয় বা কখনো নিজে কপাট খুলে ঐ জায়গাটিতে বসে ঐ বইগুলো ওলটাতে থাকেন; এই ওলটানোর ফলেই বইগুলোর অবস্থা এমন হয়েছে।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন কি?'

উত্তরে তিনি বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। আমরা সময়মতো খাইয়ে দি—যা দেওয়া হয় তাই খেয়ে নেন; দুপুরবেলা কোনোদিন একটু ঘুমোন নইলে ঘরের মধ্যে পাগলের মতো চলাফেরা করতে থাকেন বা চুপ করে বসে থাকেন আর ঐ বিড়বিড় করে বকে চলেন। রাত্রে তাঁর বেশ ঘুম হয়। স্মৃতিশক্তি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবই যেন তাঁর কাছে অন্ধকার। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের দেখলেও চিনতে পারেন না।

কবি মাঝে মাঝে আমার দিকে উদাসভাবে তাকাচ্ছেন আর ভিজে আঙুল দিয়ে পাতা উলটিয়ে চলেছেন, কি যেন একটা জরুরী জিনিস খুঁজছেন। একটি একটি করে পাতা ওলটান না। একসঙ্গে দশ-বারো পাতা ওলটানো হয়ে যাচ্ছে। পূর্বের পাঠাভ্যাস ছাড়তে পারছেন না যেন। আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বললেন। কবির

স্ত্রীকে এর অর্থ জিজ্ঞাসা করলুম। কবি-পত্নী বললেন, 'কিছু বুঝতে পারলুম না।'

আবার কবির টাঙানো ছবির দিকে দৃষ্টি পড়ে গেলো, শিউরিয়ে উঠলুম, যেন চিনতে পারছিনে। এ কবি আর ছবির কবি যেন এক নয়—ভিন্ন। যে কবি বলেছিলেন, 'আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির', তাঁর উন্নত শিরের ও ইন্দ্রিয়ের দরজাগুলো একে একে রুদ্ধ হয়ে আসছে। মুখ তাঁর শীর্ণ, আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়ে গেছে, কেশরের মতো যে কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা উঠে গেছে, সে সৌম্য মূর্তি আর নেই। তাঁর কবিতার বই রইলো, রইলো তাঁর বিচিত্র বহুকর্মান্বিত জীবনের উজ্জ্বল অবিনশ্বর ইতিহাস—কিন্তু সমস্ত কীর্তির অন্তরালে ছিলেন যে কবি নজরুল তিনি আর নেই—তাঁর স্থানে আছে রোগে জীর্ণ নজরুল।

কবির স্ত্রীকে তাঁদের সাংসারিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলুম। তিনি বললেন, 'পূর্বে যে অবস্থায় চলতো, সেই অবস্থা।'

কবির স্ত্রীকে অনুরোধ করলুম যে, আমার খাতায় কবি যেন তাঁর নামটি লিখে দেন। তখন অনিরুদ্ধ আমার খাতা আর ফাউন্টেন পেনটি নিয়ে কবিকে দিয়ে বললেন, 'লেখো তো বাবা, কা···জী··· নজ···রুল···ইস···লাম···।'

কবি নামটি লিখে দিলেন। কবি-পত্নী সেটা দেখে আমাকে বললেন, 'আপনার ভাগ্য দেখছি খুব ভালো, কেননা আজকাল উনি কোনো কিছু লিখতে চান না···যদিও লেখেন তাও দু'একটা অক্ষর লেখার পরই খাতা কলম ছুঁড়ে ফেলে দেন কিংবা একটা আঁকাবাঁকা লাইন টেনে দেন।

কবি এখনো আনমনে বইয়ের পাতা উলটিয়ে চলেছেন; বেলাও বেশ হয়েছে। কবির স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে আর নির্মম দেহবন্ধনে জর্জরিত কবিকে অন্তরেই আমার শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

কবিকে যেমন দেখেছি

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রকুমার রায়

খুব ছোটোবেলার কথা মনে পড়ে। গ্রামের বিদ্যালয়ে পাঠ আরম্ভ করেছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলন গ্রামের মধ্যে চলছে। ছাপা কিছু পেলেই হাতের কাছে টেনে নিই। বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের গান কবিতা স্কুলের ছেলেরা তখন নিয়মিত অভ্যাস করা শুরু করে দিয়েছে। শুনতে খুব ভালো লাগতো। আব্দার ধরলাম কবির বইয়ের জন্য। তখনকার দিনে হাটে বই বিক্রি হতো। কাকা বই আনতে দিলেন হাটে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকলাম, বই আসবে- কখন বইটি হাতে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখবো, কখন নিজ ঘরে বসে আবৃত্তি অভ্যাস করবো? গ্রামের হাটে নজরুলের বই পাওয়া গেলো না। এর বহুদিন পরে একের পর এক বিদ্রোহী কবির রচনাগুলি পড়তে পড়তে এক অনাবিল আনন্দে মন ভরে উঠতো—সে আজ বহুদিন আগেকার কথা।

নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে যেতে পারবো, আমি কি কোনোদিন ভেবেছিলাম? কিন্তু সত্যিই সে সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আজ বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালিত হচ্ছে দেশে-বিদেশে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রথম কবিকে সংবর্ধনা জানালেন রবীন্দ্রসদনে।

রবীন্দ্রসদনের উৎসবে কবির সঙ্গে যাবার জন্য আমার ডাক পড়েছিলো। আমিই কবির ব্যক্তিগত চিকিৎসক গত চার বছর ধরে। কবি-পুত্র সব্যসাচী আমাকে উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে অনুরোধ করে রেখেছেন কবির সঙ্গে উৎসবে যাবার জন্য। আমার সঙ্গে কবির পরিবারের সম্পর্ক ঠিক আপন লোকের মতো। ঠিক চার বৎসর আগে কবির জন্মদিনে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন, কবির জ্যেষ্ঠ

পুত্র কাজী সব্যসাচী কবির চিকিৎসার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারপর থেকে কবির চিকিৎসার দায়িত্ব আমার হাতেই ন্যস্ত করেন।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি ছোটো ছোটো ঘটনা আমি যা দেখেছি পাঠকদের আনন্দ ও আগ্রহ নিরসনের জন্যই সংক্ষেপে লিখছি। কবি একটি ছোটো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরে থাকেন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে যখন বসেন তখন দেখলে কিন্তু একটুও মনে হয় না আমাদের প্রিয় কবি অসুস্থ। ছোটো বালকের মতো তাঁর পুত্রবধূ উমা দেবীর কথা শুনে চলেন। প্রথম প্রথম কবিকে চিকিৎসার প্রয়োজনে পরীক্ষা করতে নিয়ে গেলে অসুবিধায় পড়তাম, অনেক চেষ্টায় অনেক সময় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে একটু একটু করে পরীক্ষা করতে পারতাম। এইভাবে দিনের পর দিন কেটেছে, ক্রমে ক্রমে আমিও যেন ঘরের লোক হয়ে গেছি। এখন কবির ঘরে গেলে কবি খুশী হয়ে হাত বাড়িয়ে দেন। মনে হয় যেন আপন জন কাছে এসেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বসতে বলছেন।

পুত্রবধূ উমা দেবী ব্লাড প্রেসার নেওয়ার জন্য কবিকে শুয়ে পড়তে অনুরোধ করলে কবি শুয়ে পড়েন। এই সমস্ত ছোটোখাটো ঘটনা থেকে মনে হয় এখনও কবির অনুভূতি-শক্তি বর্তমান। সময়ে সময়ে যখন কবির শারীরিক অবস্থা ভালো থাকে না তখন কিন্তু কোনো কথাই শোনেন না। কবির শারীরিক অবস্থা মোটামুটি ভালো, হাঁটতে পারেন। চোখের দিকে চাইলে এক অপূর্ব জ্যোতি চাহনিতে প্রকাশ পায়।

কবির শারীরিক সুস্থতার মূলে কিন্তু দু'জনের কথা মনে আসে। একজন পুত্রবধূ উমা দেবী এবং অপরজন পুত্র কাজী সব্যসাচী। ঐ সঙ্গে মনে পড়ে কাজী অনিরুদ্ধ ও কল্যাণী কাজীকেও। তাঁরাও পিতার অক্লান্ত সেবা করছেন। তাঁদের অক্লান্ত দরদপূর্ণ সেবা কবিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কতো সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষার ফলে

সাতাশ বৎসরের দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত কবি আজও আমাদের জন্য রয়েছেন। ডাক্তার হিসাবে আমি এই সেবার কথা উল্লেখ করলাম।

কবি কি রোগে ভুগছেন, এই প্রশ্ন জনসাধারণের মনে স্বভাবতই জাগে। কবির ব্রেনের সামনের অংশ নষ্ট হয়েছে, সে সম্বন্ধে কোনো দ্বিমত নেই।...তিনি এক অসাধারণ রোগে ভুগছেন, তার কারণ Medical Science-এ আজও বের হয়নি।

একদিন কবির ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু হাসলেন। তা দেখে আমার কি যে আনন্দ হয়েছিলো তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

গত জন্মদিনের আগের কয়েকদিন তাঁর একটু উত্তেজনা ভাব দেখা দেয়, ব্লাড প্রেসার নিয়ে দেখি, প্রেসার বেড়েছে। কবি তাঁর হাত দিয়ে আমায় পরীক্ষা কাজ চালাতে নিষেধ করেন এবং শব্দ করে বিরক্ত ভাব প্রকাশ করেন। কাজী সব্যসাচী কবির ভাব দেখে বলেন, 'কবি কয়েকদিন থেকে একটু অন্য রকম, তাঁকে কি জন্মদিনে বাড়ীর বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে?'

একদিকে অগণিত জনসাধারণ কবিকে একবার দেখার জন্য অসীম আগ্রহে অপেক্ষা করবেন, অন্যদিকে কবির মানসিক অবস্থা ভালো নয়, অনুষ্ঠান থেকে বের হলে কবির অসুস্থতা বেড়েও যেতে পারে। এই সব কথা চিন্তা করে উপযুক্ত চিকিৎসায় উত্তেজনা কমিয়ে দিয়ে জন্মদিনে তাঁকে রবীন্দ্রসদনে যাবার জন্য বের করি। আপনজন হিসাবে আমি কবির সঙ্গে সর্বক্ষণ ছিলাম, কবিও বেশ কিছুটা ভালো বোধ করছিলেম। ৭০তম জন্মদিনের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এতো সুন্দরভাবে করেছিলেন যে, কবির পক্ষে কোনো প্রকার ক্ষতি বা উত্তেজনার কারণ হয়নি।

বহুদিন থেকে কবি অসুস্থ। কবির বয়স বাড়ছে, কবি যাতে বাকী জীবন শান্তিতে এবং সুখে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থায় প্রয়াসী হওয়া দরকার জনসাধারণের। সরকার এই বিষয়ে অগ্রণী হয়ে দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

—দে গরুর গা ধুইয়ে!

আমি একেবারে সর্বাঙ্গে চমকে উঠলুম। প্রচণ্ড হুংকার দিয়ে কবি গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকালেন। তারপর বিরক্তি মেশানো গলায় বললেন, 'একি—এতো মালা-টালা দিয়ে এমন জবরজং করে সাজিয়েছে কেন আমায়? কালীঘাটে নিয়ে গিয়ে আমায় বলি দেবে নাকি? এতো বেলা হলো, চা-টাও দেয়নি, ক্ষিদে পেয়ে গেছে। কালী কুল দে মা, নুন দিয়ে খাই। ওরে, চা-টা দিবি নাকি?'

আমার তখন আনন্দ-বিস্ময়ে চূড়ান্ত অবস্থা।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম এইমাত্র জ্ঞান ফিরে সুস্থ হয়ে উঠলেন, আমারই চোখের সামনে। তাঁর চোখে মুখে আগেকার সেই বিখ্যাত তেজ ও উজ্জ্বলতা। সারা দেশের লোককে এ সুসংবাদ আমিই প্রথম জানাবো, এই আনন্দে আমারই তখন উন্মাদ হয়ে যাবার মতন অবস্থা।

কবির জ্ঞান ফিরে আসবার পর প্রথম ইন্টারভিউ ছাপাবার কৃতিত্বও আমার।

কবি এখন হাসিমুখে গলা থেকে ফুলের মালাগুলো খুলে ফেলেছেন এবং গুন্ গুন্ করে গান করছেন—বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল!—সেই ভরাট প্রাণবন্ত কণ্ঠস্বর। আমি পকেট থেকে খাতা পেন্সিল বার করছিলুম, তিনি আমাকে এই প্রথম লক্ষ্য করে ধমকে বললেন, 'এই ছোঁড়া, তুমি এখানে কী করছো? অ্যাঁ?'

আমি থতমত খেয়ে বললুম, 'কিছু না, মানে, আপনার

একটা অটোগ্রাফ নিতে এসেছি, আর যদি দু'লাইন কবিতা লিখে দেন।'

'—এখন হবে না, যাও ভাগো! অটোগ্রাফ দিতে দিতে হাত ব্যথা হয়ে গেলো, আবার কবিতা···হবে না, অটোগ্রাফ নেবে তো মেয়েরা, তোমার দরকার কি হে? এখন সময় নেই।'

আমি তবু চুপ করে বসে রইলুম। নজরুল আপন মনেই বললেন, 'ইস, এতো দেরী হয়ে গেলো! নেপেনকে নিয়ে পণ্ডিচেরী যাবার কথা ছিলো, শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দেখা করবো—'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের কথা বলছেন?'

'—হ্যাঁ। চেনো নাকি?'

'—আজ্ঞে, চিনি। কিন্তু তিনি বেঁচে নেই। শ্রীঅরবিন্দও—'

'—অ্যাঁ, নৃপেন বেঁচে নেই? কী বলো? কবে মরলো? আমি তখন কোথায় ছিলাম?'

কবির গলায় অসহায় আর্তনাদ ফুটে উঠলো। মানুষকে দুঃখের খবর শোনাবার অভ্যেস আমারও নেই। আমিও খানিকটা অসহায় বোধ করতে লাগলুম। তবু মৃদুস্বরে বললুম, 'আপনি একটানা অনেকদিন ঘুমিয়েছিলেন। অ-নে-ক দিন। এর মধ্যে অনেক কিছু বদলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে—'

'—হয়েছে? গেছে সাহেব ব্যাটারা? কারার ঐ লৌহকপাট ভেঙেছে? সত্যি? তাহলে তো ফুর্তি করতে হয় একটু আজ। পণ্ডিচেরী থাক্, তাহলে আজ অচিন্ত্য আর প্রেমেনকে ডেকে একবার ঢাকা ঘুরে আসি। ওখানে বুদ্ধদেব আছে—'

আমি বললাম, 'বুদ্ধদেব বসু ঢাকা ছেড়েছেন বহুদিন। তা ছাড়া, পাকিস্তান—'

'—পাকিস্তান? হক্ সাহেবের সেই পাকিস্তান? হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ। জিন্না-গান্ধীজীর ঝগড়া আজও মেটেনি?'

'ঝগড়া মিটেছে কিনা জানি না, তবে ওঁরা কেউই আর ইহলোকে নেই।'

'—নেই? তবে পাকিস্তান কী জন্যে?'

'—পাকিস্তান ওঁরা বেঁচে থাকতেই হয়ে গেছে। পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব আর সিন্ধু নিয়ে পাকিস্তান হয়েছে অনেকদিন আগে। গত বছর ওদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধও হয়ে গেলো।'

'—যুদ্ধ হয়ে গেলো মানে? পূর্ব বাংলার সঙ্গে পশ্চিম বাংলা যুদ্ধ করবে? চালাকি পেয়েছো? তুমি কে হে ছোক্‌রা? সত্যি করে বলো তো, বৃটিশের স্পাই নও তো?'

আমি বিষণ্ণ হেসে বললুম, 'পূর্ব বাংলার সঙ্গে আমাদের হাতাহাতি যুদ্ধ হয়নি বটে, কিন্তু এটা এখন একটা আলাদা দেশ। ওখানকার সঙ্গে এখানকার যাতায়াত বন্ধ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ, এমন কি বই-পত্রের বিনিময়ও বন্ধ। এখানকার বই ওরা পড়তে পায় না, ওদের বইও আমরা পাই না।'

'—এরা আর ওরা? তুমি এখান থেকে ভাগো তো। যতো সব মিথ্যে কথা শোনাতে এসেছো। আমি আজকের ট্রেনেই ঢাকা যাবো, দেখি কে আমায় আটকায়। আমি, জসিমউদ্দিন, গোলাম মুস্তাফা, প্রেমেন, শৈলজাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো, ওখান থেকে অজিত, পরিমল, মোহিতলালকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবো, দেখি কে কী করে? তুমি এখন সরে পড়ো।'

আমি বললুম, 'আপনি আমার ওপর অকারণে রাগ করছেন, কিন্তু কথাগুলো সত্যি। আপনি যে ট্রেনে চাপবেন, সে-রকম সরাসরি কোনো ট্রেনই চলে না আজকাল আর। ওদেশের সঙ্গে আমাদের দেশের যোগাযোগ সত্যিই একেবারে বন্ধ। আর যাঁদের নাম করছেন, তাঁরা অনেকেই দেশ বদলেছেন। অবশ্য আপনি যদি যেতে চান, তাহলে দুই সরকারের মধ্যে লেখালেখি করে আপনার জন্যে একটা কোনো বন্দোবস্ত......'

কবি এবার খানিকটা হতাশ চোখে তাকালেন। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এতোদিন সত্যিই ঘুমিয়েছিলুম। তুমি শুধু আমায় খারাপ খবর শোনাচ্ছো। ভালো খবর কিছু নেই?'

আমি চিন্তিতভাবে বললুম, 'ভালো খবর? হ্যাঁ, মানে, এই তো দুর্গাপুরে বিরাট ইস্পাত কারখানা হয়েছে, কলকাতায় অনেক বড়ো বড়ো বাড়ি উঠেছে—'

তাকিয়ে দেখি কবি আবার অবসন্নভাবে হেলান দিয়েছেন। কী সব বিড়বিড় করতে করতে হাত দিয়ে মালার ফুলগুলো ছিঁড়ছেন।

রাজ-ভিখারী নজরুল

হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলাম শুধু একজন কবি নন—একটি মহনীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ তিনি। সত্যিকারের বিরাট সাহিত্য স্রষ্টা ও সংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অগ্রদূত হিসাবে নজরুলের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই রাজনীতিকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। কাজীর প্রতিভা অভ্রভেদী, গিরিশৃঙ্গে তার স্থিতি, গগনচারী বর্ণাঢ্য লঘুপক্ষ মেঘকে যেমন তার সদা আমন্ত্রণ, ভয়াল বক্রগর্ভ মেঘের আবির্ভাবেও তেমনি তার শৈলচূড়ায় এনে দেয় বাক্যালাপের আনন্দ সমারোহ।

বিপ্লবী বাংলা চরম দুর্যোগের রাতে কবির বাণীতে তার আত্মার মর্মধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো। নব জাগ্রত বাংলার বুকে তখন নবতম স্পন্দন, নজরুলের প্রেরণায় বাংলার চৈতন্যে এক নবজীবনের দীপ্তি ফুটে উঠেছে। কাজীর কণ্ঠে তখন সহস্র কণ্ঠের ঐক্যতান, সহস্র ধ্বনির ঝঙ্কার ও অনুরণন। নানা রং, রস, নানা মূর্ছনার এ যেন বিচিত্র যাদুপুরী—ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈভব থেকে অগ্নিগিরির লাভা প্রবাহ, সব কিছু এই অপরূপ সৃষ্টিকর যেন রচনা করে যাচ্ছেন। নজরুলের প্রতিভার এক জ্বালাময়ী সর্ব-ব্যাপক, সর্ব পরিপ্লাবী রূপে চোখ যেন ঝলসে যায়।

নজরুল তাঁর জীবদ্দশাতেই ইতিহাসের মর্যাদা কেড়ে নিতে পেরেছেন, ভবিষ্যৎ কালের পটে তাঁর নাম ইতিমধ্যেই অঙ্কিত হয়ে গেছে। নবাগত বংশধরের দল এ বিদ্রোহী কবিকে স্মরণ করে রাখবে প্রতিভার এক বিস্ময়কর কীর্তিরূপে এবং তুলনা করবে তাঁকে এক বজ্রধারী টাইটানের সঙ্গে, যে তার প্রলয়ঙ্কর অস্ত্র ক্ষেপণ করে জড়তা ও মৃত্যু থেকে তার মাতৃভূমিকে বাঁচিয়েছিলো। আগামী দিনকে যারা ভালোবাসবে তারা নিজেদের প্রিয়তম ও ঘনিষ্ঠতম করে

তুলবে কাজীর যাদুস্পর্শী কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে। এ সঙ্গীতে বিরহ ও মিলন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংস্কৃতি, সুফীবাদ আর বেদান্ত সব কিছুরই প্রশস্তি ও বন্দনা গাওয়া হয়েছে।

সত্যিকারের মানব-দরদী হিসাবে নজরুল তাঁর বুকে জমাট করে রেখেছেন প্রপ্রীড়িত মানবতার দুঃখ-বেদনার গান। এ মরমী সঙ্গীত যে হৃদয়ে ঝংকৃত হয়েছিলো, তা আকাশেরই মতো উদার, প্রশান্ত সাগরের মতো প্রমত্ত, দুর্বার। কাজীর জীবনে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির মিলন শতদল—অপরূপ সৌগন্ধে ও মাধুরিমায়। কাজী একাধারে এক ভিখারী ও সম্রাট। কাজী এক মহিমময় রাজ-ভিখারী।

কবি নজরুল প্রসঙ্গে

মজহারুল ইসলাম

তখন আমি বিদ্যালয়ের ছাত্র। একটি কবিতা তখন বার বার বলে বেড়াতাম বুক ফুলিয়ে:

'কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল্ কররে লোপাট্…!'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুনতাম গান:

'শূন্য এ বুকে ডানা মেলে
পাখি মোর আয় ফিরে আয়…।'

কিংবা

'একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।'

আমার মতো স্কুলে পড়া ছেলেটি তখন জানতো না ঐ কবিতা কে লিখেছেন, ঐ গানই বা কে লিখেছেন।

আশ্চর্য, হঠাৎ একদিন সেই কবিকেই চোখে দেখলাম। আমার মতো ছাত্রটির মনে সে কী উৎসাহ, যে কবির কবিতা বার বার আবৃত্তি করেছি, যাঁর গান বার বার শুনেছি—তাঁর জন্মদিনে কোনো এক সূত্রে কবির তখনকার বাসভবন দীনেন্দ্র স্ট্রীটের সেই বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেদিনই প্রথম আবিষ্কার করলাম যে, আমার পিতৃদেব ডাঃ আবুল আহ্সান এখানে বহুবার এসেছেন কবি এবং কবি-পত্নীর চিকিৎসার জন্য। আর একজন লেখকের কথা সেদিন জানলাম—তিনি পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি কবির বন্ধু সেই সঙ্গে আমার পিতৃদেবেরও বন্ধু।

তার বেশ কিছুদিন পর কবির বন্ধুরা গঠন করলেন কবি নজরুল ইসলামকে সারিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'নিরাময় কমিটি'।

তখন আমি পরিচিত হলাম কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের সঙ্গে। আমার মতো ছোট্ট ছেলেটির উৎসাহ দেখে তিনি তো অবাক। উৎসাহ থাকবে নাইবা কেন? আমার প্রিয় কবিকে সারিয়ে তোলা হবে, দেশের জন্য যিনি সব দিয়েছেন, চেষ্টা করলে দশে মিলে তাঁর জন্য কিছু করতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে। আমি যাঁদের কাছে অর্থের জন্য হাত পেতেছি, আমার উৎসাহ দেখে তাঁরা কেউ আমাকে নিরাশ করেন নি। কিন্তু একটা কথা এখানে বলে রাখি, আমি কবির জন্য কারো আছে সাহায্য চাইনি। যাঁদের কাছে গিয়েছি, তাঁদের অকপটে বলেছি—কবি নজরুলকে সারিয়ে তোলার জন্য আপনাদের কাছে সাহায্য চাইতে আসিনি, আপনারা যে দায়িত্ব ও কর্তব্য ভুলে গেছেন—আমি তা স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি।

দেশ এখন স্বাধীন। অতএব কবি নজরুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া বোধহয় উপায় ছিলো না। অথচ পরাধীনতার যুগে সমস্ত অত্যাচার কবিকেই সইতে হয়েছে। লোকেরা বাহবা দিয়েছে—অবাক হয়েছে। তারপর এক দশক যেতে না যেতেই স্বাধীনতামুগ্ধ দেশবাসী কবি সম্পর্কে হয়ে গেছেন নির্বিকার। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রমের পুরোভাগে ছিলেন নজরুল পাঠাগার। যতদূর মনে পড়ে একমাত্র নজরুল পাঠাগারই তখন নিয়মিতভাবে প্রতি বছর কবির জন্ম উৎসব পালন করতেন একান্ত ঘরোয়াভাবে। তার বিশেষ প্রচার বা আড়ম্বর ছিলো না, ছিলো আন্তরিকতা। যাই হোক, সেই অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমি নিয়মিতই যেতাম। দেখতাম কবির সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁদের কী অনুপম উৎসাহ।

দেশের স্বাধীনতার জন্য যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন, স্বাধীন দেশে তিনি অসুস্থ অবস্থায় প্রাণ দেবেন—স্বাধীন দেশের কোনো নাগরিকই তা মেনে নিতে পারেন না। স্বাধীন সরকারের সাহায্যের ঔদাসীন্য সত্ত্বেও ভারত ও পাকিস্তানের অগণিত নজরুল দরদীর সহযোগিতায় বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে বে-সরকারী উদ্যোগে

কোনো ক্রমে কবিকে পাঠানো হলো ভিয়েনায়, এই আশা নিয়ে যে, হয়তো কবি রোগমুক্ত হয়ে ফিরে আসবেন আবার আমাদের মাঝে। পথভ্রষ্ট সমাজকে আবার দেখাবেন নূতন করে আলোর পথ।

আমরা হাওড়া স্টেশনে কবিকে পৌঁছে দিতে গেলাম। 'বিদ্রোহী কবি আবার ফিরে এসো' এই ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠলো আকাশ বাতাস। প্রতি উত্তরে কবি চেয়ে রইলেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে, আর তাঁর নির্বাক ঠোঁট দুটি বার বার কেঁপে উঠতে লাগলো।

সবাই জানেন, ভিয়েনায় কবিকে সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি। কবি যেদিন ফিরলেন, আমার সেদিনের বেদনাভরা মনের কথা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সেই বেদনা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো—যখন দেখা গেলো, দেশবাসীও ধীরে ধীরে কবিকে ভুলতে বসেছেন তাঁর কবিত্বের সাময়িক ঠুনকো মর্যাদা দিয়ে। এই অবস্থার মধ্যে আমরা হারালাম কবি-পত্নী প্রমীলা দেবীকে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে এমন একজনকে হারালাম, যিনি আমাকে পুত্রসুলভ স্নেহে আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। কবির আত্মীয়-পরিজনদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা থাকায় সে সময় আমিও গিয়েছিলাম কবির জন্মভূমি চুরুলিয়ায়, যেখানে কবি-পত্নী আজ চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। কবি ক্রমেই লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতে লাগলেন। কবির রচিত গানগুলি হারিয়ে যেতে লাগলো। আরো আশ্চর্য, কবির গানের ডিস্কেও মর্চে ধরতে শুরু করলো। তিন হাজার সঙ্গীত স্রষ্টার কপালে এই দশা দেখে কার না দুঃখ হয়!

এমন সময় শুরু হলো চীন-ভারতের বিবাদ। হঠাৎ চারিদিকে শুনি কবির গান, কবিতা। আবার অনুভব করলাম, দেশের মানুষকে দেশ-প্রেমে উদ্দীপ্ত করার জন্য কবি নজরুলের বুঝি জুড়ি নেই।

এই সুযোগে কবিকে আবার জনজীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা গঠন করলাম 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি'।

এই কমিটি পরে মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। তার পরিবর্তিত নাম হয়েছে 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি'। কবির সাহিত্য ও সঙ্গীত যাতে আরো বেশি প্রচার ও প্রসার লাভ করে, তার চেষ্টা করার জন্য জন্ম হয়েছে এই একাডেমির। আমাদের সে উদ্দেশ্য আজ বহুলাংশে সার্থক হয়েছে।

নজরুল একাডেমির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের শহর-গ্রাম-গঞ্জের নানা জায়গায় তখন শুরু হয়েছে কবির জন্মদিনের উৎসবের আয়োজন। দেখতে দেখতে আবার বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠলো কবির গানে আর কবিতায়।

কবি তাঁর অসুস্থতার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে সাহায্য পাচ্ছিলেন সাড়ে ছ'শো টাকা। নজরুল একাডেমির প্রচেষ্টায় তা বেড়ে হলো মোট সাত শো টাকা। কবির চিকিৎসাদির ব্যবস্থাও বিনামূল্যে সরকারী উদ্যোগ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির অনুপ্রেরণায় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার রবীন্দ্রসদনে বিদ্রোহী কবির জন্মদিন পালনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে শ্রদ্ধেয় জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ সাহেব উপস্থিত হয়ে কবি সম্পর্কে যেসব অবশ্যকরণীয় কাজের কথা বলেছেন, আশা করি অবিলম্বে সরকার সেগুলি কার্যকরী করবেন।

আমি কবির একান্ত ভক্ত ও অনুরাগী। কবি যতদিন বেঁচে আছেন, একটু ভালোভাবে তাঁকে রাখা হোক, এই আমার কামনা। আর আমি যেন কবির বিদ্রোহী সত্তার সার্থক উত্তরাধিকারী হতে পারি—এই আমার কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা।

কিশোর-আচার্য নজরুল

ইন্দ্রজিৎ রায়

কাজী নজরুল ইসলামের পিতা মুন্সী ফকির আহমদ সাহেব ছিলেন ধর্মভীরু, দানশীল, সরলচিত্ত আর আপন-ভোলা মানুষ।

ফলে, তাঁর চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের সুযোগটুকু পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে, আত্মীয়-স্বজনেরা ফকির সাহেবের যেটুকু বিষয়-সম্পত্তি জমি-জিরেৎ ছিলো সব নিয়ে নেয়, শেষ পর্যন্ত তাঁকে সত্যসত্যই 'ফকির' করে ছেড়ে দিলো তারা।

ফকির আহমদ সাহেবের কিন্তু বিশেষ কোনও চিত্ত-বৈকল্য ঘটলো না তাতে। বরং সংসারের প্রতি আরও ঘোরতরভাবে উদাসীন হয়ে পড়লেন তিনি। ধর্ম-কর্মের দিকে ঝুঁকে পড়লেন প্রবলভাবে। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কাটাতেন স্থানীয় মসজিদে আর পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের দরগাহে।

দরগাহে খাদেমগিরি (সেবাইৎ) করে, মসজিদে ইমামতী (আচার্য) করে আর ভক্তজনের বাড়ীতে বাড়ীতে মিলাদ্‌ শরীফ পাঠ করে সামান্য যা কিছু পেতেন, তাই দিয়েই স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক কন্যার ভরণ-পোষণ চালাতেন কায়ক্লেশে। তাছাড়া বাংলা ও উর্দু ভাষার উপর ফকির আহমদ সাহেবের রীতিমতো দখল থাকায়—হাতের লেখাও সুন্দর ঝরঝরে মুক্তোর মতো হওয়ার ফলে চুরুলিয়া এবং তার আশপাশের গ্রামাঞ্চলের অনেকের দলিল দস্তাবেজ লিখে দিয়ে আরো বাড়তি কিছু রোজগার করতেন তিনি।

নজরুল ইসলামও ওয়ারিশানসূত্রে পিতার এই গুণগুলি কম-বেশী পরিমাণে পেয়েছিলেন নিজের চরিত্রে। পেয়েছিলেন পিতার মতো স্বাস্থ্য-সুন্দর দেহ···কোমল অন্তঃকরণ···দরাজ দিল···আর তাঁর মতো শিল্পী ধাঁচের সুন্দর সুস্পষ্ট হস্তাক্ষর। সেই সঙ্গে পেয়েছিলেন

কঠোর দারিদ্র—যে দারিদ্র ছিলো তাঁর পিতার নিত্যসঙ্গী। কিন্তু এর জন্য নজরুলের মনে ছিলো না কোনো ক্ষোভ, কোনো অভিযোগ। বরং তিনি সমুচ্চ কণ্ঠে বলেছেন :

'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছো মহান
তুমি মোরে দানিয়াছো খৃষ্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছো তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস ;
উদ্ধত উলঙ্গ দৃষ্টি ; বাণী ক্ষুরধার
বীণা মোর শাপে তব হলো তরবার।'

নজরুলের বয়স যখন আট, সেই সময়ে ফকির আহমদ সাহেবের জীবনাবসান ঘটে। অভাবের সংসার এইবার একেবারেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়লো। তিন নাবালক পুত্র আর এক শিশু কন্যা নিয়ে তাঁদের মা জাহিদা-খাতুন ঘোর দুর্দশায় পড়লেন।

পিতার দারিদ্রতা হেতু জ্যেষ্ঠ পুত্র কাজী সাহেবজান উচ্চ শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ পান নি। তিনি যখন লোকান্তরিত হলেন তখন আর তাঁর কতই বা বয়স? কিশোর বললেই হয়। তবু, সেই বয়সেই বেঁচে থাকার আর মা-ভাই-বোনদের বাঁচিয়ে রাখার স্বাভাবিক প্রেরণায় আসানসোলের কোনোও এক কোলিয়ারীতে বহু কষ্টে একটা চাকরি যোগাড় করেছিলেন।

তাঁর মতো স্বল্পশিক্ষিত, অনভিজ্ঞ আর অপরিণত বয়স্ক কিশোরের কাজই বা কি আর মাইনেই বা কতো! তবু অনটনের সংসারে সেই 'মুষ্টিভিক্ষা'ও কিছুটা উপকার করেছিলো। একেবারে অনশনে দিন না কাটিয়ে অর্ধাশন তো জুটেছিলো সকলের।

এতো অভাব, এতো কষ্ট—তবু নজরুলের পড়াশোনা বন্ধ হতে দেন নি জাহিদাবিবি। তিনি যে কিভাবে ছেলেকে তখনও গ্রামের মক্তবে পড়িয়ে চলেছিলেন, সেটাই আশ্চর্যের।

নজরুলের লেখাপড়ার প্রথম ধাপ শুরু হয় তাঁর বাবার কাছে।

বাবাই ছিলেন তাঁর সর্বপ্রথম শিক্ষাগুরু। তারপর অক্ষর পরিচয় শেষ হলে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হলো পাঠশালায়।

পাঠশালার গুরু ছিলেন মৌলভী কাজী ফজলে আহমদ সাহেব। আরবী, ফার্সী, উর্দু আর বাংলা ভাষায় তাঁর প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি ছিলো। বাংলা বানান শেখানোর সাথে সাথে নজরুলকে তিনি আরবীও শেখাচ্ছিলেন সযত্নে। কারণ তখনকার দিনের রেওয়াজ অনুযায়ী শরীফখানদানের মুসলমান ছেলেদের পক্ষে কিছুটা আরবী শিক্ষা করা অপরিহার্য ছিলো।

খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন নজরুল ইসলাম। মক্তবের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগেই তিনি বেশ সাবলীলভাবে আর নির্ভুল উচ্চারণে 'কোরাণ শরীফ' পাঠ করতে পারতেন। তাঁর আরবী, উর্দু—বিশেষ করে আরবী উচ্চারণ আর সঠিক কোরাণ পাঠ শুনে একবার এক জবরদস্ত মৌলানা বালক নজরুলের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

ছাত্র হিসাবে নজরুল ছিলেন বুদ্ধিমান ও মেধাবী। ছাত্র-গুরু নির্বিশেষে সকলের ছিলেন তিনি প্রিয় পাত্র। তাই শিক্ষকের পরলোক-গমনের পর—শত দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগের ভিতর দিয়ে, বছর দুই পরে নজরুল ইসলাম যখন এক শুভদিনে গ্রামের মক্তব থেকে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন, তখন সারা গ্রাম ধন্য ধন্য করে উঠলো তাঁর নামে।

কিন্তু ছেলেকে হাইস্কুলে পড়াবার যে দুর্বার বাসনা ছিলো জননী জাহিদাবিবির অন্তরে—যে দুরন্ত অভিলাষ ছিলো ছোট্ট নজরুলের ততোধিক ছোট্ট মনের ভিতর সংগুপ্ত হয়ে, সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেলো দারিদ্র্যের জন্য।

এই কাজী পরিবারের প্রতি সহানুভূতি-সংবেদক আর শ্রদ্ধাশীল শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিরা মাতা-পুত্রের এই স্বপ্নকে সম্ভব করে তুলতে না পারলেও তাঁদের দারিদ্র্য মোচনের একটা উপায় অবশেষে করে

দিলেন সকলে মিলে। যে মক্তবে নজরুল নিজে পাশ করে বেরিয়েছেন হালফিল, সেই ছোট্ট মক্তবের ততোধিক ছোট্ট মৌলভীর পদে সাদরে বরণ করে নিলেন তাঁকে।

মাইনে যেমন উল্লেখযোগ্য নয়, তেমনি নিয়মিতও নয়। তবে নিয়মিত পাবার আশা করা যায় ছাত্রদের বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দেওয়া 'সিধে'টা—অর্থাৎ কিছু চাল-ডাল-কলা-মূলো-বেগুন-কাঁচকলার ডালি। আর ভাগ্য যদি খুবই সুপ্রসন্ন থাকে, তবে নৈবেদ্যর চূড়ায় সন্দেশের মতো—দু'একটা হাঁস বা মুরগীর ডিমও অধিকন্তু জুটে যেতে পারে বরাতে। সিধের পরিমাণ অবশ্য বেশী হবার কথা নয়—কারণ ছাত্রসংখ্যা তো নগণ্য, তার উপর সকলের অবস্থা বা রুজি-রোজগারও সমান নয়।

তবু মন্দের ভালো হিসাবেই জাহিদাবিবি ব্যবস্থাটাকে তখনকার মতন মেনে নিলেন।

শুধু পাঠশালার গুরুগিরিই নয়, সেইসঙ্গে আরো একটি সম্মানের কাজও জুটে গেলো নজরুলের কপালে। কাজটি হলো, স্থানীয় মসজিদের ইমাম (আচার্য) আর মোয়াজ্জীনের (আজান-দাতা) পদ। যে কাজটি তাঁর মরহুম (স্বর্গীয়) আব্বাজানই করে গেছেন শেষ জীবনে। পদটি যতো গুরুতর—পদাবৃত লোকটি কিন্তু ততো হালকা। কারণ নবীন ইমাম আর মোয়াজ্জীনের বয়স তখন সবে মাত্র এগারো বছর। চুরুলিয়া গ্রামের ইতিহাসে—সম্ভবতঃ সারা মুসলিম জাহানের ইতিহাসেই কোনোও মসজিদের এতো তরুণ ইমাম এই প্রথম।

কাজও যেমন বাড়লো, সংসারে আয়ও তেমনি বাড়লো। জাহিদা-বিবির চোখের সামনে অনবরত ঝুলে থাকা কৃষ্ণ-যবনিকার স্থানে স্থানে রীতিমতো ফাটল দেখা দিলো যেন।

নজরুলের পিতা মুন্সী ফকির আহমদ জীবনের শেষ পর্যায়ে পীর হাজী পাহ্‌লোয়ানের দরগাহের খাদেমী আর মসজিদের ইমামী

করে গেছেন। ফকির আহমদ সাহেব ঐ দরগাহে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সাঁঝ-ঝাড় দিতেন। সেখানে নিরালা নির্জনে বসে ঈশ্বরের আরাধনা করতেন একাসনে—বালক নজরুল তাঁর আব্বাজানের সেই ধ্যান-সমাহিত মূর্তি দেখেছেন বহুদিন বহুভাবে। মসজিদে গিয়ে পিতার সঙ্গে নমাজ পড়তেন, সাজ্‌দা (আভূমি নত হয়ে প্রণাম) করতেন অভিজ্ঞ নমাজকারীর মতো, সময়ে রোজাও রাখতেন। সেই যে ধর্মভাব স্ফুরিত হয়েছিলো ধার্মিক পিতার সান্নিধ্যে থেকে—এবার নিজে ইমাম নিযুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বর্ধিত হলো।

কিন্তু যোগ্যতা এক জিনিস এবং ধর্মভাব আর এক জিনিস। মসজিদের ইমামতী করতে হলে যে যোগ্যতা বা উপযুক্ততার প্রয়োজন হয়, নজরুল ইসলামের তা খুব অল্পই ছিলো। প্রথম অভাব ছিলো অভিজ্ঞতার, দ্বিতীয় অভাব ছিলো বয়সের। তবু পিছু হটলেন না তিনি। দুঃসাহসে ভর করে এগিয়ে এলেন ইমামতীর কাজে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য-পরামর্শ বিধি-বিধান আর উৎসাহ দিয়েছিলেন নজরুলের দূর সম্পর্কের এক কাকা মুন্সী বজ্‌লে করিম।

মুন্সীচাচার কাছে ইসলামের ধর্মীয় ভাষায় 'সবক' (পাঠ) নিতে গিয়ে নজরুল প্রথম সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিলেন যে, চাচাজী বাংলা গান ও উর্দু গজল লেখেন। শুধু লেখেনই না, তাতে সুর দিয়ে গুন্ গুন্ করে গেয়েও থাকেন। এই সুরের ঝংকার তাঁর অন্তরে সংগোপনে থাকা সেই স্পর্শকাতর স্থানটিতে হঠাৎ ধাক্কা দিলো। নজরুলের ঘুমিয়ে থাকা কবি প্রতিভার কমল-কোরক এইবার জেগে উঠে তার পাপ্‌ড়ি মেলা শুরু করলো। মনের পাপিয়া-বুলবুল আর দোয়েল-শ্যামারা চঞ্চল হয়ে উঠলো সেই ছন্দোময় আঘাতে।

• নজরুলের ঘুমন্ত কবি সত্তার জেগে ওঠার আরো একটা কারণ হলো গ্রামবাংলার হিন্দু বা মুসলিম ধর্মানুষ্ঠানে পুঁথি-পড়ার রেওয়াজ।

এই সমস্ত পুঁথি হিন্দুদের লেখা হতো পয়ার ছন্দ আর গানে কীর্তনেঃ মুসলমানদের লেখা থাকতো—উর্দু-ফার্সী এবং বাংলার সংমিশ্রণে গজলের আকারে। এই সব দেখে-শুনে ও পড়ে, নজরুল সেই কিশোর কালেই নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গীত ও গজল লিখতে আরম্ভ করে দিলেন। অবশ্য তাঁর ঐ সময়কার সমস্ত গানই ধর্মভাব-পূর্ণ ও মোল্লা প্রভাবিত শরীয়তী আদর্শে রচিত। কারণ—কিশোর-আচার্য নজরুলের সে জীবন তখন মোল্লা-প্রভাবান্বিত জীবন। বয়সে নবীন—একেবারে নেহাৎই কচি ও কাঁচা হলেও তাঁর উপর যে কাজের ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তা কচি-কাঁচাদের উপযুক্ত নয়। মসজিদের মাননীয় ইমাম তিনি; তাঁর অধীনে বহু লোক নমাজ পড়েন, 'খোত্‌বা' (ধর্ম উপদেশ) শোনেন; আসরে আসরে দুলে দুলে সুর করে তাঁকে মীলাদ শরীফ পাঠ করতে হয়। কাজেই তরুণ নওল-কিশোর নজরুল যতো গীত-গজলই লিখুন না কেন, ধর্মভাব-পূর্ণ গান না লিখে অন্য চটুল ধরনের কোনো কিছু লেখা তাঁর পক্ষে বেমানান নিশ্চয়।

নজরুলের সে সময়কার লেখা গজলের নমুনা এই রকম—

নমাজ পড়ো মিঞা ওগো নমাজ পড়ো মিঞা,
সবার সাথে জমায়েতে মসজিদেতে গিয়া,
তাতে যে নেকী পাবে বেশী
পর সে হবে খেশী
থাকবে নাকো কীনা, প্রেমে পূর্ণ হবে হিয়া॥

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় আর একটি হলো—আরবী-ফার্সী শব্দের বাহুল্য। এই বাহুল্য কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সের রচনার ভিতরেও বর্তমান। বিভিন্ন ভাষার শব্দ চয়ন, এবং তার উপযুক্ত প্রয়োগও যে মুন্সীয়ানার পরিচায়ক—নজরুল ইসলাম বহুবার তার পরিচয় দিয়েছেন।

যাই হোক, কিশোর নজরুলের জীবনে এই মোল্লাগিরির প্রভাব বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। তিনি মক্তবের মৌলভী…দরগাহে খাদেমী আর মসজিদে ইমামতী করেও, সংসারের উপর চেপে বসে থাকা পাষাণভার দারিদ্রের চাপ একটুও হালকা করে তুলতে পারলেন না। বরাতে যে অর্ধাশন—সেই অর্ধাশনই বজায় রইলো। খিদের জ্বালায় ছোটো ভাই আলী হোসেন আর কচি বোন কুলসম যখন অবুঝের মতো কাঁদতো, তখন মায়ের সেই কাতর-করুণ ও অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইতো নজরুলের। নিজেও সময়ে সময়ে দিশাহারা হয়ে পড়তেন কর্তব্য কি বুঝতে না পেরে।

ক্ষুধার্ত ভাই-বোনের কাতরানি…অসহায় মায়ের চোখের জল… নিজের অক্ষমতা—এ সব ভেবে মন তাঁর অশান্ত ও চঞ্চল হয়ে উঠলো। নমাজে আর মন বসে না; খোত্‌বা শোনাতে গিয়ে কি মিলাদ শরীফ পড়তে বসে আগেকার সেই আন্তরিকতার সুর যেন তিনি আর ফিরে পান না। ধর্ম মানুষের জীবনে মঙ্গলময় নিঃসন্দেহে। কিন্তু অন্তহীন দারিদ্রের সঙ্গে যাদের সব সময়ে লড়তে হচ্ছে… মাসের ভিতর কুড়িটা দিন যাদের আধ-পেটা খেয়ে থাকতে হচ্ছে, তাদের পক্ষে খালি পেটে ধর্মকর্মে মন দেওয়া একটু কঠিন বৈকি! তা ছাড়া—হুজ্জত তো অনেক। শরীয়তী আইনে ইসলামধর্মের বিধি-বিধানও আবার অনেক, আর বিচ্ছিরি রকমের কড়া। পয়সার অভাবেও ঈশ্বরকে কায়মনোবাক্যে ডাকতে গেলে মনের যে স্থিরতা আর চিত্তের যে প্রশান্তির প্রয়োজন—নিত্য অভাব অভিযোগের তাড়নায় নজরুলের তা অনেক আগেই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। তা ছাড়া বাসাটাও ঐ স্থিরতা প্রশান্তি সমাধিস্থতার পক্ষে অনুকূল ছিলো না। তবু কিশোর আচার্যটি যে উপবাসী থেকে, বাড়ীর সমস্ত অভাব অনটনের অশান্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনে, দিনের পর দিন মসজিদের মিনারে উঠে সুরেলা কণ্ঠে আজান দিতে

পেরেছিলেন, খোত্‌বা শুনিয়ে, মিলাদ পাঠ করে আর নির্ভুল উচ্চারণে নমাজের 'কেরাত্‌' পাঠ করতে পেরেছিলেন, নর-নারী বালক-বৃদ্ধ-যুবা সবাইকে দীর্ঘদিন ধরে নিজের স্বল্প কিন্তু সংহত ক্ষমতার পাশে আবদ্ধ করে রাখতে পেরেছিলেন ঐ অভুক্ত অবস্থায়—কাউকে এতোটুকু বুঝতে দেননি, জানতে দেননি নিজের অনশনের কথা, ইমামী বা খাদেমিতে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা ভাব-বৈষম্য, এটাই আশ্চর্যের। নজরুলের চারিত্রিক দৃঢ়তার এও একটা প্রমাণ।

'অভাবে স্বভাব নষ্ট'—বাংলা প্রবাদেই আছে। সুতরাং আর থাকতে না পেরে, ক্ষুধার তাড়না আর সইতে না পেরে, নজরুল যদি ধর্মের বেড়া-বাঁধন কেটে, শরীয়তী গণ্ডী পেরিয়ে জীবনের মুক্ত খোলা অঙ্গনে আসবার জন্য শেষ পর্যন্ত আকুল হয়ে ওঠেন, তবে তাঁকে নাস্তিক বা পাতকী বলে অভিযুক্ত করা যায় কি? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো বটেই।

নজরুল ইসলাম যদি ঐ ধর্মীয় বেড়া-বন্ধন আর গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে পারতেন কোনো রকমে, তবে গ্রাম্য মুসলমানদের কাছে তিনি হয়তো একদিন একজন বিরাট মোল্লা কিংবা ছোটোখাটো পীর সাহেব হতে পারতেন—কিন্তু ভবিষ্যতে সুবে বাংলার 'কবি বুলবুল' কিংবা 'বিদ্রোহী কবি' হতে পারতেন না কোনোদিনই। সে সম্ভাবনা তাঁর কচি মোল্লার জীবন-বেদীতেই বলিদান হয়ে যেতো।

ভাগ্যিস সে সময়ে চুরুলিয়া গ্রামাঞ্চলে লেটো-গানের প্রভাব বেড়ে চলেছিলো, ফলে ধীরে ধীরে ঐ লেটো-গানওয়ালাদের আনন্দ-স্ফূর্তি আর স্বচ্ছন্দ বিহার দেখে তাঁর মনও ঝুঁকে পড়েছে তাঁরই লেখা একটি গানে—

> সে নমাজ আর বন্দেগীতে নাই ফল ভাই রে,
> যাতে দেহের সাথে দিলের যোগ নাই রে।

মন আছে ক্ষেতে ভুঁইয়ে
তন্ আছে মজিদ ছুঁইয়ে
দেহ আর দেল দূরে দূরে দুই ঠাঁই রে।
তার চেয়ে গান গাওয়া ভালো, তারে-নারে নাইরে॥

লেটো-গানের দলে যোগ দিয়ে পেটের ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষিতভাবে মিটলো না সত্য, তবে মনের ক্ষুধা পরিপূর্ণভাবেই মিটলো। তাঁর শুকিয়ে আসা প্রাণ-তরু আর মূর্ছানো কবিত্ব কুসুম আবার রঙে-রসে-গন্ধে আর রূপে সজীব হয়ে উঠলো। কিছুদিনের মধ্যেই নজরুল ইসলাম আবার প্রাণবন্ত কিশোর হয়ে উঠলেন। মুখে দেখা দিলো হাসি। প্রাণে জেগে উঠলো কবিতা – সে কবিতা গান হয়ে ঝরে ঝরে পড়লো তাঁর সুধাকণ্ঠ থেকে। তিনি বুলবুল হয়ে মাতিয়ে তুললেন কবিতার গুলবাগিচা।

এক কিশোর-আচার্যের সমাধিতে জেগে উঠলো এক কিশোর কবির টলটলে চারা। তাতে দেখা দিলো আগামী দিনের কুসুমিত মাসের কোরক কিশলয় আর হিল্লোল।

নজরুল-স্মৃতি

পঞ্চানন ঘোষাল

সুদূর বিগত দিনের স্মৃতিচারণ করলে প্রথম নজরুল-দর্শনের বিষয় মনে পড়ে। আমি ও আমার ভ্রাতা ডঃ হিরণ্ময় ঘোষাল তখন স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র। সেই সময় আমরা নজরুলের অগ্নিবীণা পড়ে মুগ্ধ হই। আমাদের অভিভাবক রায় সাহেব কালিসদয় ঘোষাল তখন কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের জনৈক উচ্চপদস্থ অফিসার। ঐ বইখানি সরকার বাহাদুরের নির্দেশে রিভিউ করার জন্য কোয়ার্টারে এনেছিলেন। এর পরে তাঁর আরও একখানা বই আমরা পড়েছিলাম। এই বইখানার নাম ছিলো—'রিক্তের বেদন'। আমরা দূর হতে দেখলাম উনি অনুবাদ করলেন 'প্যাঙ্গস্ অফ দি ডেসটিটিউড' (Fangs of the Destitude)। এর পর আমরা তাঁর আরও একখানি বই পড়ে মুগ্ধ হই। ঐ বইখানির নাম ছিলো 'বিষের বাঁশী'। আমাদের কিশোর মনকে এ তিনখানি বই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। অসহযোগ আন্দোলনের সময় একদিন স্কুল ত্যাগ করে দেশবন্ধুর বক্তৃতা শুনতেও বেরুই। কিন্তু পরদিন হতে আবার আমরা শান্তশিষ্ট ও অভিভাবকদের অতিবাধ্য হই। কিন্তু কাজী নজরুল ইসলামের দর্শনলাভের জন্য অতি ব্যগ্র হয়ে উঠি।

আমাদের তদানীন্তন পারিবারিক গ্রামীণ বাড়ী রায়বাহাদুরস লজ হতে বার হয়ে নৌকোযোগে আমরা গঙ্গা পার হলাম। আমাদের জমিদারীর নায়েব কাজী নজরুলের হুগলীর ঠিকানাটা সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আমাদের অভিভাবক এবং বহু আত্মীয়স্বজন তখন উচ্চপদস্থ পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী কর্মী। তাঁদের মুখে শুনেছিলাম নজরুলের সঙ্গে দেখা করলে আর কখনও আমরা তাঁদের মতো

আই. সি. এস. কিংবা আই. পি. এস. প্রভৃতি চাকুরে হতে পাবো না। কাজী নজরুলের বাড়ীতে গোয়েন্দা বিভাগ হতে ওয়াচ বসানো আছে। তাঁর বাড়ীতে কেউ গেলে তাদের সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর কর্তৃপক্ষের কাছে চলে আসবে। তাই গোপনে তাঁর হুগলীর বাসায় গিয়ে আমরা দেখা করলাম। আমাদের প্রতি তাঁর সুন্দর ব্যবহার আমার আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। বিদায়কালে বড়ো-রাস্তা পর্যন্ত আমাদেরকে পৌঁছিয়েও দিয়েছিলেন তিনি নিজে।

কিন্তু কলকাতায় ফেরার দু'দিন পরে আমাদের অভিভাবকদের কলকাতার পুলিশ কমিশনার ডেকে পাঠালেন। তাঁর কাছ হতে ফিরে এসে আমাদের অভিভাবক আমাদের দুই ভাইকে ডেকে পাঠিয়ে চীৎকার করে বললেন—'তোমরা কাজী নজরুলের বাড়ীতে কেন গিয়েছিলে?' আমরা অবাক হয়ে সেদিন ভেবেছিলাম—বাপরে! কোথায় হুগলী আর কোথায় কলকাতা। তাহলে কেউ কি এতখানি পথ আমাদেরকে 'ফলো' করেছে? পুলিশের বড়োকর্তা আমাদের ঐ অভিভাবকের মুখে একটা শুভ সংবাদও শুনলাম। আমাদের ঐ অভিভাবক স্যার চার্লস টেগার্টকে বলেছিলেন যে, উনি আমাদেরকে আর কখনও আমাদের দেশের বাড়ীতে যেতে দেবেন না; এবং সর্বদা আমাদেরকে তাঁর চোখে চোখে রেখে দেবেন। এতে স্যার চার্লস টেগার্ট উত্তরে তাঁকে বলেছিলেন, 'উঁহুঁ। এতে সমস্যার সমাধান হবে না। Put them in the Police—ওদের কলকাতা পুলিশেতে ভর্তি করে নিতে হবে।' সেই যুগে ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের চাইতে কলকাতা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টরদের বেতন অধিক ছিলো। অধিকন্তু ঐ চাকরিতে দেশ-দেশান্তরে না ঘুরে এই শহরেতেই থাকার সুবিধা ছিলো। তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের পুত্র-পৌত্রদের পক্ষে এটি ছিলো এক প্রকার লোভনীয় চাকরী। ঐ সময় কোনোও ভারতীয়কে ডেপুটি পুলিশ কমিশনাররূপে পর্যন্ত নিয়োগ করার রীতি ছিলো না। এমন কি থানাগুলিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মীদের

প্রায় অধিকাংশ ছিলো য়ুরোপীয় বা এ্যাঙলো ইণ্ডিয়ান। যাক, বুঝলাম যে, কাজী নজরুল ইসলামের পরোক্ষ দয়াতে আমাদের একটি করে চাকরীর বন্দোবস্ত হয়ে গেলো। তবে হ্যাঁ, আমাদের এজন্য গ্র্যাজুয়েট হওয়া চাই এবং কাজী নজরুলের মতো রাজদ্রোহীদের ত্রিসীমানাতে যেন আর আমাদের দেখা না মেলে। এর পর আমরা কাজী সাহেবের কাব্য ও গীতের অধিকতর ভক্ত হয়ে পড়ি বটে, কিন্তু ছাত্রাবস্থাতে আর কোনোও দিনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সাহসী হই নি। আশ্চর্যের বিষয়, ১৯৩০-৩১ সনে কলকাতা ত্যাগের কিছুকাল পূর্বে স্যার চার্লস টেগার্ট আমাদের অভিভাবককে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—'ইওর বয়েজ আর নাউ গ্রাজুয়েট?—কলকাতা পুলিশে অফিসার পদের জন্য ওদের দরখাস্ত করতে বলো। এই বার কার ব্যাচেতে ওদের আমি ভর্তি করে নেবো।' সত্যই—আশ্চর্য ছিলো ঐ ইংরেজ ভদ্রলোকের কথার মূল্য ও স্মরণ-শক্তি। কিন্তু আমার ভ্রাতা হিরণ্ময়ের মন তখনও শাসককুলের প্রতি অতীব বিরূপ। এই বিপাক এড়াতে হিরণ্ময় যথা সত্বর পড়াশুনার অজুহাতে য়ুরোপে পাড়ি দিলো। সেই বছর হতে আজও পর্যন্ত সে ঐ দেশেতেই আছে। কিন্তু আমাকে স্যার চার্লসের সঙ্গে দেখা করতে হলো এবং তাঁর সিলেকশন বোর্ডেও আমাকে উপস্থিত হতে হলো। স্যার চার্লস টেগার্ট আমাকে, আমাদের উক্ত অভিভাবক রায়সাহেব কালিসদয় ঘোষাল এবং আমাদের পিতামহ রায়বাহাদুর কমলাপতি ঘোষালের মতো নামী সরকারী কর্মচারী হওয়ার জন্ত উপদেশ দিলেন এবং সাদরে এই কলকাতা মহানগরীর পুলিশী কর্ম-কৃত্যে ভর্তি করে নিলেন।

এর পরের বছরে জোড়াসাঁকো থানাতে আমি অফিসাররূপে নিযুক্ত হলাম। একদিন রাত্রে রাত্রিকালীন রোঁদে বার হয়েছি। কাজী নজরুল ইসলাম গ্রামোফোন কোম্পানী হতে প্রত্যহ অধিক রাত্রে নির্মীয়মান সেনট্রাল এ্যাভেনিউর পথেতে পদব্রজে বাড়ী ফিরতেন।

একদিন বেশী রাত্রে ঐ পথে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। উনি আমাকে চিনলেন। সমাদর জানালেন। শেষে আমাকে পুলিশ হতে হলো—আমি তাঁকে দুঃখ জানালাম। এতে তিনি আমাকে মৃদু ভর্ৎসনা জানিয়ে বললেন—'ওরকম কথা আমাকে বলো না। এটা তোমার মনের গভীরতম প্রদেশের কথা নিশ্চয়ই নয়। সেবাপরায়ণ মন নিয়ে পুলিশে থাকলে মিশনারীদের চাইতে জনগণের সেবা করার সুযোগ তুমি বেশী পাবে। এরপর আমার উপন্যাস ও কবিতা লেখার প্রচেষ্টা এবং সেগুলির প্রকাশনের বিষয় তাঁকে আমি বলেছিলাম। শুনে তিনি আমাকে সেদিন বলেছিলেন—'উঁহু। ওসব পথে যেয়ো না। ওতে সফল হবে না। বরং অপরাধীদের জীবনী পর্যালোচন করো, ওদের অবস্থা সম্বন্ধে দেশবাসীদের জানাও। এই সুযোগ তোমাদের প্রচুর। ঐ সব বিষয়ে লেখো।'

পরবর্তীকালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হেমেন্দ্রকুমার রায়ও এই উপদেশ আমাকে দিয়েছিলেন।

তারপর অধিক রাত্রে প্রায়ই আমাদের ঐ একই স্থানে দেখা হতো। ঐ পথে উনি রাত্রে গ্রামোফোন কোম্পানী হতে ফিরতেন এবং ঐ পথে রাত্রিকালীন রোঁদে আমিও বার হতাম। ফাঁপা ড্রেন পাইপ নির্মীয়মান সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউর পাশে জমা করা ছিলো। দু'এক সময় ঐ পাইপগুলির একটির উপর বসে পা দুলিয়ে আমরা কিছুক্ষণ গল্পও করেছি। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এতো রাত্রে ওঁর সাথে আমাকে কোনোও সরকারী কর্মচারী কিংবা তাদের কোনোও সংবাদদাতা দেখতে পাবে না। কারণ অন্যদের মতো প্রমশনাদিতে বিঘ্ন হওয়ার ভয় আমারও ছিলো। কিন্তু পৃথিবীতে কোনোও সংবাদই অজ্ঞাত থাকে না। একদিন হঠাৎই স্পেশাল ব্রাঞ্চের একজন কর্মকর্তা আমাকে সকলের অজ্ঞাতে ডেকে পাঠালেন ও বললেন—'ওহে, কাজী সাহেবের সঙ্গে তোমার রাউণ্ডের সময় দেখা হয় বুঝি? ঠিক আছে। ওঁর সঙ্গে ভাব রেখো। ভয় নেই। ওঁর বাড়ীতেও

যেতে পারো। তুমি হলে তো আমাদের লোক। ওঁদের দলের তো কেউ নও; পরে একদিন এসো। তোমাকে আমি কিছু বলবো।' আমি ঐদিন সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সারমর্ম বুঝতে পেরে মনে মনে একটু হেসেছিলাম। নানা কথাবার্তার মধ্যে কাজী সাহেব আমাকে একদিন বলেছিলেন—'যদি দেশের জন্যে মন কাঁদে তো চাকরি ছেড়ে দিয়ো। কিন্তু পুলিশে থেকে নিয়োগকর্তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কদাচ নয়। বিশ্বাসঘাতক সর্বদা ঘৃণ্য ও বধ্য।' এই কথাটা বিদ্যুৎ গতিতে আমার সেদিন মনে পড়ে গিয়েছিলো। এরও কিছুকাল পরে আমাকে তদানীন্তন জনৈক বাঙালী উর্ধ্বতন অফিসারের দু'জন সঙ্গীতজ্ঞ ভাইঝি আমাকে ধরে পড়লো। কাজী সাহেবকে এক রাত্রে আমাদের পুলিশ কোয়ার্টারে আনতে হবে। তাদের উদ্দেশ্য—কাজী সাহেবের কাছে সুর শিখে গ্রামোফোন রেকর্ড করানো। তাদের অনুরোধে আমি কাজী সাহেবকে অনুরোধ করলাম ও প্রস্তাব করলাম—থানা-বাড়ীর পিছনের গেট দিয়ে রাত্রে তাঁকে আমাদের ওপরের কোয়ার্টারে নিয়ে যাবো। কারণ—আমার এই উর্ধ্বতন অফিসার এইভাবে কবিকে তাঁদের ওখানে নিয়ে যেতে বলেছেন। অফিসারের এই গোপন প্রস্তাবে কাজী নজরুল ইসলাম হো হো করে অট্টহাসি হেসে বললেন—'আমি যেখানে যাই সম্মুখ দিয়ে রাজপথের ওপর দিয়ে যাই স্ব-ইচ্ছাতে। তোদের ওখানে ওভাবে তো যাবো না। তবে যদি কখনও এদেশ স্বাধীন হয় তাহলে স্ব-ইচ্ছাতেই সগৌরবে এই থানা-বাড়ীতে ঢুকবো। অবশ্য ততোদিন জীবিত থাকবো কিনা জানি না। যাক, তুমি আমাদের বাড়ীতে আগে তো একদিন এসো।'

আমি জানতাম ওঁর বাড়ীতে বিনা কারণে যাওয়া বিপদ। কিন্তু তা সত্ত্বেও একদিন অবাঞ্ছিত সুযোগ এসে গেলো। সে সুযোগ আমার জীবনে না এলেই ভালো হতো। রাত্রি দশটার সময় আমাদের থানাতে সংক্ষেপে একটি টেলিফোন মেসেজ এলো—'কিপ্ রেডি।

ওয়ান অফিসার ওয়ান হেড্ কনস্টেবল ফর এ সার্চ ইন ইওর এরিয়া এ্যাট ফোর এ. এম.।' বলা বাহুল্য কাজী নজরুল ইসলাম তখন আমাদের থানার এলাকাতে থাকতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় ঐ দিনে থানা অভিসাররূপে আমাকেই নির্ধারিত করা হলো। ভোর রাত্রি চারটের সময় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা এলেন। আমরা থানা হতে কেবল তাঁদের রক্ষকরূপে একসঙ্গে চলেছি। তাঁদের কাছে আদালতের তল্লাসী পরোয়ানা। আমরা কি জন্য কোথায় যাচ্ছি তা তখনও জানি না। পুলিশ দল তাদের নির্দেশে মোড় ঘুরে পাশের একটি পথে ঢুকে কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। তাঁদের অনুরোধে আমি গতিবান পুলিশ ক'টিকে হুকুম দিলাম—'হল্ট্'। ওঁরা তাড়াতাড়ি বাড়ীটা সকলকে নিয়ে ঘিরে ফেললেন। কড়া নাড়াতেই কাজী সাহেব বার হয়ে এলেন। ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠলো। ভোরও হয়ে এলো। পুলিশের দল সদর্পে ঐ বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। কোনোও দিক হতে কোনোও বাধা নেই। ইতিমধ্যে দিনের আলোও ফুটে উঠেছে। তা সত্ত্বেও বিজলী বাতিগুলোও পূর্বের মতো জ্বলছে। ওগুলো নেভানোর চিন্তা কোনো পক্ষেরই নেই। আমি এবং শ্রদ্ধেয় কাজী সাদেব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উভয়ে উভয়ের দিকে চেয়ে দেখছি। কিন্তু বাক্যের আদান-প্রদান নেই। যেন কেউ কাউকে চিনি না। কোনোও দিনই যেন কেউ কাউকে দেখিনি। উপস্থিত গোয়েন্দা অফিসারদেরও তাই ধারণা। এঁদের একজন কাজী সাহেবকে দেখিয়ে আমাকে বললেন, 'এঁকে চেনেন? নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। উনি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম'। আমি নির্বাক হয়ে একটু অধোবদন হলাম, কাজী সাহেবও মৃদু হাসি হাসলেন। এতক্ষণ কাজী সাহেবও তাঁর গৃহের অন্যান্য প্রতিটি কক্ষের প্রতিটি বাক্স খুলতে ও দেখতে বরং সাহায্য করছিলেন। অবশ্য সত্য কথা বলতে হলে বলবো কোনোও বাধা দিচ্ছিলেন না। কিন্তু একটি বাক্স গোয়েন্দা

অফিসার খুলবার উপক্রম করা মাত্র কাজী সাহেব সেখানে ছুটে এসে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন—'না না, ওটাতে হাত দেবেন না।' তাঁকে এইভাবে হঠাৎ বিচলিত হতে দেখে পুলিশের সন্দেহ আরো বেড়ে গেলো। ঐ বাক্স খুলে উপুড় করা মাত্র কাজী সাহেবের চোখ হতে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো। আমরা এযাবৎ কাল তাঁর চোখে শুধু আগুন ঝরতে দেখেছি। ওরকম শক্ত একজন মানুষের চোখে জল দেখে সকলেই অবাক হলাম। ঐ বাক্সে কিছু শিশুর খেলনা ও শিশুর ব্যবহার্য দ্রব্যাদি ছিলো। এগুলি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম পুত্র স্বর্গত বুলবুলের ব্যবহৃত সামগ্রী। যাতে এতোদিন অন্য কেউ হাত দিতে সাহস করেনি তাতে আজ এই পুলিশ প্রথম হাতের স্পর্শ দিয়েছে। আমি তখন ঐ বিভাগে নবাগত এক তরুণ পুলিশ অফিসার, তাই ইচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন সেই বাক্সটি খোলার ও সেটি উপুড় করার ব্যাপারে কোনো বাধা দিতে পারিনি। বরং নিষ্ফল ও নিষ্পন্দভাবে ঐ সব কাজ ক্ষুণ্ণ মনে দেখেছি।

জীবনে বহু জায়গায় বহু পরিবেশে বহু মানুষের ঘর-বাড়ী সার্চ করতে হয়েছে, কিন্তু কবি নজরুলের বাড়ী সার্চ করবার সেই বেদনাঘন স্মৃতি আমি জীবনে ভুলবো না।

কবিগৃহে একদিন

বিশ্বনাথ দে

[একটি জন্মদিনের বিবরণ]

১১ই জ্যৈষ্ঠ। বাঙালীর প্রাণপুরুষ সুরের রাজা গানের রাজা নজরুলের জন্মদিন আজ। একদিন যাঁর কবিতায় বাঙালী প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠতে পেরেছিলো, সেই কবি নজরুলই তো আজকের দিনে, ক্যালেণ্ডারের এই তারিখে চুরুলিয়া গ্রামের এক কুঁড়েঘরে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সে আজ একাত্তর বছর আগের কথা।

তাই তো আজ কবি নজরুলের একাত্তরতম জন্মদিন পালন করা হচ্ছে।

খুব সকালবেলা টিপ টিপ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এণ্টালী ক্রিষ্টোফার রোডের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ওখানেই তো কবি তাঁর বড়ছেলে কাজী সব্যসাচীর কাছে থাকেন।

সকাল সাতটা। যাবার পথে কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে একবার নামলাম বাস থেকে। একটা মালা চাই। একটা মালা নেবো কবির জন্যে, যার ফুলের সমস্ত সুরভির সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভালবাসা প্রণাম।

রাস্তা পেরুতে গিয়ে থামতে হলো। পরিচিত কণ্ঠস্বরে নিজের নাম শুনে তাকালাম ফিরে।

—কি, যাবে না?

আওয়াজ শুনে চেয়ে দেখি ট্যাক্সির মধ্যে কবি নজরুলের কনিষ্ঠ পুত্র কাজী অনিরুদ্ধ। পাশে তাঁর স্ত্রী কল্যাণী কাজী আর ছোট ছেলেমেয়েরা।

একমুখ হাসি নিয়ে অনিরুদ্ধ আমাকে আহ্বান জানালেন—এসো, এসো, উঠে পড়ো।

বুঝলাম ওঁরাও চলেছেন আজ পিতার জন্মদিনে, বড় ভাইয়ের আবাসে।

কবি-গৃহে যাবার পথে ক্রিস্টোফার রোডের মুখেই একটি প্রকাণ্ড তোরণ। লাল সালু কাপড়ে মোড়া, তোরণটি যেন আগেভাগেই ঘোষণা করছে কবির জন্মদিনের কথা।

তোরণ পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম।

ছপ্ ছপ্ ছির্‌র্‌র্—

বৃষ্টি এদিকে কতোটা হয়েছে জানি না, কিন্তু বেশ জল জমেছে পথে।

রেল পুলের সামনে, সি. আই. টি. স্কিমের বাড়ীগুলির পাশে গাড়ী এসে থামলো। দেখলাম, এখানেও আর একটি তোরণ তৈরী করা হয়েছে।

কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন এই তোরণ আর কবি-গৃহের সামনের চৌকো জায়গাটিতে একটি প্রকাণ্ড মঞ্চ।

দু' পাশে সারি সারি সি. আই. টি. স্কিমের ফ্ল্যাটবাড়ী। মধ্যের ফাঁকা জায়গাটিতে মঞ্চ। মঞ্চের সামনে জল জমা হয়ে থৈ থৈ করছে। সেই জলভেজা জায়গার ওপরেই ক্রিস্টোফার রোড নজরুল জন্মোৎসব কমিটির তরুণ স্বেচ্ছাসেবকরা চেয়ার পাতছেন। সকলেই খুব তৎপর। এখুনি যে কবির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হবে।

সকাল আটটা। পাকিস্তান-হাই কমিশনার এসে পড়েছেন এর মধ্যে। চেয়ার বিছোনো অল্প পরিসর পথ পেরিয়ে উঠলেন দু'তলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকের ছোট ফ্ল্যাটটি কাজী সব্যসাচীর, আজ যেটি বাঙালীর তীর্থভূমি।

দু'কামরার ছোট ফ্ল্যাট। ডান দিকে কিচেন। এ পাশে বাথরুম। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনের ঘরে পরিপাটি করে বিছানা পাতা হয়েছে। চারপাশে সুন্দর আলপনা। যেন কোনো দেবতার জন্য শ্রদ্ধাভরে পাতা হয়েছে আসন। কবিকে বসানো হলো সেই বিছানায়।

সৌম্য শান্ত সুন্দর মূর্তি কাজী নজরুলের। পরনে গরদের পাঞ্জাবি আর কালো-পাড় ধুতি। মনে হলো দুরারোগ্য ব্যাধি যেন মহাবিদ্রোহী কবি-সত্তাকে ক্লান্ত করেনি, ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ করেছে মাত্র। কবি যেন তাঁর আয়ত চোখের নীরব ভাষা দিয়ে সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ঢেলে দিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ উমা কাজী কবিকে সন্দেশ খাওয়ালেন। ছোট ছেলেকে, অবোধ ছেলেকে মা যেমন করে ধরে-বেঁধে জলের গ্লাস মুখে ধরে, তেমনি করে খাওয়ালেন জল। মুখটিও তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দিতে হলো।

বিছানায় বসে কবি তাঁর ডানদিকের জানলার পাশে তাকালেন একবার। ছোট গোল টেবিলের ওপর ও কে? ও কার ছবি?

কবির আজ চেনারও কোনো সাধ্য নেই ও ছবি কার।

যুঁই ফুলের মালা দেওয়া ঐ ছবিটি লোকান্তরিতা কবি-পত্নী প্রমীলা দেবীর। যিনি আমৃত্যু সব সময় কবির পাশে পাশে থেকে-ছিলেন।

কবি সে ছবির দিকে নির্বিকার ভাবে একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন আমাদের দিকে।

পাক-হাই কমিশনার কবিকে প্রাণের প্রণতি জানালেন। অজস্র সুগন্ধি পুষ্পস্তবক আর মালায় মালায় অল্পক্ষণের মধ্যেই ছেয়ে গেলো কবির দুই পাশ।

নিচের মঞ্চে তখন শুরু হয়েছে কবির জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি থেমে গেছে ইতিমধ্যে। জলজমা পথে পা রেখে প্রচুর মানুষ কখন এসে বসেছে চেয়ারগুলি দখল করে। স্থান নেই আর। নেই তো কি হবে? দাঁড়াতে বাধা কোথায়?

উদ্বোধন সঙ্গীতে কবি নজরুলেরই গান গাইলেন কবি-পুত্রবধূ কল্যাণী কাজী আর ডঃ অঞ্জলী মুখোপাধ্যায়।

গান শেষ হলে পাক-হাই কমিশনার বললেন, 'কবি নজরুল আমাদের জীবনের, প্রাণের স্পন্দন। আজ এখানে, এপার বাঙলায়

যেমন আমরা তাঁর জন্মোৎসব করছি, তেমনি ওপার বাঙলাতেও হচ্ছে তাঁর জন্মদিনের উৎসব। তিনি তো শুধু এখানকার নন, উভয় বাঙলারই প্রাণপুরুষ।'

অল্প কটি কথা। কিন্তু এতেই মেশানো আছে আন্তরিকতার পরশ।

বক্তৃতার শেষে গান। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধীরেন বসু গাইলেন নজরুল-গীতি। গান শুনতে শুনতেই প্রকাণ্ড জনতার লাইন এগিয়ে চলেছে ঐ হলুদ রঙের বাড়ীটির দিকে। সিঁড়ি পেরিয়ে ঐ লাইনের প্রতিটি মানুষ ওপরে উঠবে। তবেই তো আকাঙ্ক্ষার শেষ সোপান। কবি-দর্শন।

ছোট শিশুর মতো দু'চোখে অবোধ দৃষ্টি নিয়ে শান্ত হয়ে বসে আছেন অতীত দিনের দামাল দুরন্ত মানুষ কবি নজরুল।

নিচের মঞ্চে তখন আমাদের মেয়র শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সুর এসে পড়েছেন। কে যেন দিলো এসে সে খবর।

মেয়র পরম শ্রদ্ধাভরে মানপত্র পড়ে শোনালেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের। কবিকে নীচে নামানো গেলো না, শরীর তাঁর অসুস্থ হয়ে ওঠে বেশী টানা-পোড়েন করলে। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র তাই উঠলেন ওপরে। কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানালেন তাঁকে সংবর্ধনা। গরদের ধুতি, মানপত্র আর পুষ্পস্তবক দিলেন উপহার।

একটু পরে কবিবন্ধু নাট্যকার মন্মথ রায় ঢুকলেন কবির ঘরে। বসলেন কবির সামনে। কবির কাছাকাছি এগিয়ে এসে বললেন পরম আন্তরিকতায়, আমায় চিনতে পারছো, আমি মন্মথ?

কাকে বললেন, কে শুনলেন? আর শুনলেন তো বুঝলেন কি?

না, কিছুই না। কবি একটি সাদা পদ্মফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়ছেন তখন নিবিষ্ট মনে।

রবীন্দ্র সদনের ফটোগ্রাফার বিশু নন্দী কবির ফটো তুললেন দুটি।

ফ্ল্যাস্ বাল্বের সামনে কবিকে একটু চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখলাম। আচমকা এই জোরালো আলো সহ্য হয় না তাঁর।

ফিল্ম ডিভিসনের নরসিংহ রাও এসেছিলেন নিউজ রিল ছবি তুলতে। মুভি ক্যামেরায় তিনিও কিছুক্ষণ ছবি তুললেন। কবির ছবি, কবিকে দেখতে আসা উন্মুখ শ্রদ্ধানত জনতার ছবি, নীচের লাইনের ছবি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডান পাশে প্রতিবেশী-ফ্ল্যাটের বাইরের ঘরটিও ওঁরা আজ ব্যবহার করতে দিয়েছেন কবি-পুত্রদের। ওখানে আকাশবাণী কলকাতার মিস্টার তরফদার টেপ রেকর্ডার নিয়ে বসে আছেন। একটি গোল টেবিলের ওপর রেকর্ডার। সামনের সোফায় পুরোনো দিনের বিখ্যাত অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবী আর পরিচালক-অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সহধর্মিনী যমুনা বড়ুয়া ওরাও এসেছেন কবিকে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানাতে।

ওঁদের ইণ্টারভিউ নিলেন মিস্টার তরফদার। চন্দ্রাবতী বললেন, ‘কত কালের কথা, কিন্তু মনে হয় যেন সেদিনের। সেদিন কাজীদার কাছে আমরা গান শিখতাম। তাঁরই লেখা গানে সুর দিয়ে শেখাতেন তিনি। একটি গান মনে আছে। ‘কারাগার’ নাটকের গান ‘এতো জল ও কাজল চোখে, পাষাণী আনলো বলো কে—’। তখন আমরা বুঝিনি, উপলব্ধি করতে পারিনি উনি কতো বড় মানুষ।’

‘নিজেকে কোনদিন বড় মানুষ করে আমাদের সামনে আসেননি কাজীদা। ছোট বোনের স্নেহই পেয়েছিলাম তাঁর কাছে।’ বললেন যমুনা দেবী।

দেখতে দেখতে সময় কেটে চলেছে। দর্শনার্থী মানুষের বিরাম নেই। সমস্ত ফ্ল্যাটটি যেন ফুলের গন্ধে আমোদিত। ছু’কামরার এই ছোট ফ্ল্যাটটি যেন আজ সকলের জন্য অবারিত। আসলে যাঁরা এখানকার বাসিন্দা তাঁরাই যেন কেউ না!

কবির জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ উমা বৌদি বললেন, কি, চা খাবেন নাকি? তাহলে এ ঘরে আসুন।

চা খেতে খেতে লক্ষ্য করতে লাগলাম দর্শনার্থী মানুষজনের শ্রদ্ধানত চোখগুলির দিকে।

বেলা বারোটা বাজতে আর বিশেষ দেরী নেই। এখুনি শেষ হবে এখনকার মতো দর্শনার্থীদের আসার পালা।

বাথরুমের ওখানে ছোট একটি পাঁচিল ঘেরা বারান্দার মতো। ওরই লাগোয়া কয়লা রাখার চৌবাচ্চা। প্রৌঢ় গৃহ-ভৃত্য কাঠিয়া সেই চৌবাচ্চার ওপর বসে জনতার ভিড় নিরীক্ষণ করছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটু হাসলো। কাছে সরে গিয়ে বললাম, কি গো, এখানে বসে?

—কি করি বলুন, এখানে একটু ভিড় কম।

সত্যি, ওরই মধ্যে জায়গাটা সামান্য নিরিবিলি।

কবি-পুত্র সব্যসাচী জানলার ওপর রাখা টেলিফোনের কাছে সরে গিয়ে ফোনে কথা বলছিলেন কার সঙ্গে। কানে এলো—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। না না, কিচ্ছু দরকার নেই লোক পাঠাবার, আমি ছ'টার মধ্যেই যাবো। হ্যাঁ, নিনিকেও বলে দিচ্ছি।—সে নীচে গেছে।

ফোন নামিয়েই আমার সঙ্গে চোখাচোখি। বললাম, কি ব্যাপার?

—আর বলিস কেন, বিকেলে রবীন্দ্র সদনে যেতে হবে তাই আর কি। নিনিকে দেখেছিস?

বললাম, এই তো ছিলেন এখানেই।

নিনি, কাজী অনিরুদ্ধর ডাক নাম। বুঝলাম, আজ বিকালে যে রবীন্দ্র সদনে নজরুল জয়ন্তীর উৎসব হচ্ছে, ওখানে কবি-পুত্রদ্বয় অংশ গ্রহণ করতে যাবেন, তারই তাগিদ দেওয়া হলো ফোনে। সব্যসাচী কবিতা আবৃত্তি করবেন আর অনিরুদ্ধ বাজাবেন ইলেকট্রিক গিটার।

সব্যসাচী বললেন, এখুনি চলে যাবি নাকি?

—না, আছি।

—হ্যাঁ, এদিকটা একটু ছাখ্। কিছু খাবি? তোর বৌদির কাছে যা' না।

বলেই ব্যস্ত পায়ে নীচে নেমে গেলেন।

ভিড়, ভিড়, ভিড়। অসহ্য অসম্ভব ভিড়। দর্শনার্থী জনতার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ আর মহল্লা কমিটির স্বেচ্ছাসেবকরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে বেলা বারোটা বাজলো। শেষ হলো কবির দর্শনার্থীদের ওপরে ওঠার পালা। আবার বিকেল তিনটায় আসবেন তাঁরা। তোরণের পাশে ফুলের দোকান বসেছে একটি। সেটি কিন্তু ফুলে ফুলে ভরা।

—এঁ্যা, কখন খুলবে, সেই বেলা তিনটেয়? আমি যে বজবজ থেকে এসেছি। কি হবে?—বললেন একজন দর্শনার্থী প্রৌঢ় মানুষ।

সরল মানুষ। নিতান্তই একজন কবির ভক্ত।

মৃদু হেসে বললাম, কবিকে এখন খাওয়ানো হবে, বিশ্রামও তো তাঁর দরকার। বিকেলে আসুন না, আপনাকে লাইন দিতে হবে না, আমি নিয়ে যাবো সঙ্গে করে।

কি ভাবলেন ভদ্রলোক। তারপর বললেন, আচ্ছা। কিন্তু ফুলের মালাটা শুকিয়ে যাবে যে!

সত্যি, হাতে তাঁর একটি রজনীগন্ধার মালা।

হঠাৎ বললেন, এখানে ভাতের হোটেল কোথায় আছে বলুন তো?

বললাম, ওদিকে।

—ও, আচ্ছা।—ভদ্রলোক চলে গেলেন।

আস্তে আস্তে ভিড় ফাঁকা হচ্ছে নীচের। আবার দলে দলে ছেলে-মেয়ে, যুবক-বৃদ্ধ আসছেন। দেখা পাবার সময় জেনে নিয়ে চলে যাচ্ছেন। দূরের দর্শনার্থী কেউ কেউ ওরই মধ্যে একটু ছায়াঘেরা জায়গায় বসে মেলে ধরেছেন কবির জন্মদিনে বিক্রি হওয়া কাগজ 'কবি কণ্ঠ'। বিশেষ নজরুল-সংখ্যা।

তিনটে থেকে আবার সেই ভীড়। টানা রাত এগারোটা পর্যন্ত। এরই মধ্যে রাত আটটা নাগাদ রাজ্যপালের পক্ষ থেকে তাঁর এডিকং এসে কবিকে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়ে গেলেন। কবিকে দেখতে দেওয়া হলো রাত দশটা পর্যন্ত। তারপর বন্ধ হলো ফ্ল্যাটের দরজা। নীচের লোহার গেট।

পুলিশ আর স্বেচ্ছাসেবকরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

নিরাশ হয়ে তাহলে ফেরেনি কেউ। শেষ দর্শকটি পর্যন্ত উঠেছিলো ওপরে। দেখেছিলো নীরব কবির ধ্যানগম্ভীর মূর্তি।

সন্ধ্যার ভিড়ের অবকাশে ফ্ল্যাটের ভেতরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে দুটি জিনিস আমি দেখেছি আর অবাক হয়েছি। ফুলের ঘরে ফুলের সুগন্ধ ভরা ফুলের জলসায় কবির পুরোনো দিনের গানের ছাত্রী যূথিকা রায় যখন 'ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি' গাইছিলেন তখন কবি আপন মনে কোলের ওপর হাত চাপড়ে তাল দিচ্ছিলেন সুন্দরভাবে। এই দৃশ্য দেখে কে বলবে কবি নজরুল সম্বিতহারা হয়ে আছেন আজ সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর! আর একটি হলো, কবির পায়ে মাথা ঠেকিয়ে নীচু হয়ে যাঁরা প্রণাম করছিলেন, তাঁদের মাথায় তিনি হাত চাপড়ে দিচ্ছিলেন আশীর্বাদ করার ভঙ্গীতে। তবে এ চাপড়ানো শিশুর মতো চাপড়ানো। সবে হাত-পা নাড়তে শেখা শিশু যেমন করে হাত চাপড়ায় এ যেন তেমনি ভঙ্গী।

দর্শনার্থীদের দেখতে দেওয়ার পালা শেষ হলো রাত দশটায়। এবার কবিকে ওপাশের ঘরে তাঁর নিজের জায়গাটিতে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো।

ঐ ঘরেই বসে ছিলেন পুরোনো দিনের বিখ্যাত গায়িকা আঙুরবালা দেবী। হেসে হেসে ঘরোয়াভাবে কথা বলছিলেন তিনি কবি-পুত্রবধূদ্বয়ের সঙ্গে। ঘিরে ছিলো তাঁদের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা, আর আমরা ক'জন।

কবি এ-ঘরে আসতেই যেন একটা প্রচণ্ড ছন্দপতন ঘটে গেলো।

উদাস দৃষ্টিতে কবির দিকে, হারানো দিনের কাজীদার দিকে তাকালেন আঙুরবালা দেবী। ত্রিশ-বত্রিশ বছর সময়ের ব্যবধান পেরিয়ে তিনি যেন হাজির হলেন গিয়ে সুদূর অতীতে। চিৎপুরের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি স্কুলের সামনের বিষ্ণু ভবনে, যেখানে ছিলো গ্রামোফোন ক্লাবের রিহার্সাল রুম গানের ট্রেনার-কম্পোজার তাঁর কাজীদা। কাজীদার লেখা গানে, কাজীদার তৈরী সুরে, কাজীদার মোটা ভরাট গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইছেন বসে 'তোমার বুকের ফুলদানিতে ফুল হবো বঁধু আমি'।

সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনের স্মৃতি যেন ভেসে উঠলো আঙুরবালা দেবীর মানসপটে।

আমার মনে পড়লো, মাস ছয়েক আগে একদিন তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'এখনকার কাজীদার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার মন চায় না। যে মানুষকে একদিন এতো হৈ-চৈ-এর মধ্যে, হাসি-আনন্দের মধ্যে দেখেছি, আজ তিনি স্তব্ধ। এর চেয়ে বেশি দুঃখ আর কি আছে বলো?'

তবু আজ উনি এসেছেন কবিপুত্রদের অনুরোধে।

এসেছেন আর দুঃখ পেয়েছেন অনুক্ষণ।

আর ওরই মধ্যে নীচের অনুষ্ঠানে রাত এগারোটার সময় গানও গেয়েছেন দু'খানা। কবি নজরুলের যে সব গান গেয়ে বাঙালী শ্রোতাদের মনে শ্রদ্ধার আসন করে দিয়েছিলেন তিনি—তার থেকেই দুটি গান।

বিকেলের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিলো সন্ধ্যা ছটায়। কবির আবাল্য বন্ধু কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সভাপতি। প্রধান অতিথি ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।

শৈলজানন্দ বললেন, 'নজরুল আমার বন্ধু। একসঙ্গে একই গ্রামে থেকে খেলাধুলো করে আমরা মানুষ হয়েছি। আমার সেই ছোট-বেলার বন্ধুর সামনে গিয়ে দাঁড়ালে আজ সে আমায় চিনতে পর্যন্ত

পারে না—এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ আমার কাছে আর কিছু নেই।' এই বলে তিনি তাঁদের ছেলেবেলার গল্প, আন্তরিক বন্ধুত্বের কাহিনী শোনালেন উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের

বিশিষ্ট অতিথি হয়ে উপস্থিত ছিলেন যুগান্তরের বার্তা সম্পাদক দক্ষিণারঞ্জন বসু। তিনি শোনালেন নজরুলের খেয়াল-খুশির কাহিনী। তারপর নজরুল-গীতির আসরে আরো অনেক শিল্পীর সঙ্গে একে একে গান গাইলেন সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইলা বসু, জপমালা ঘোষ, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অঞ্জলি মুখোপাধ্যায়, কল্যাণী কাজী, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আঙুরবালা দেবী।

রাত তখন এগারোটা বেজে গেছে।

সেদিকে আমার খেয়াল নেই।

আঙুরবালা দেবীর গান শেষ হতে একবার ওপরে গেলাম।

—কি এখনো যাওনি তুমি?—কবিপুত্র কাজী অনিরুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন।

—কি রে, থেকে যা আজ।—কাজী সব্যসাচী বললেন।

বললাম, না, এবার যাচ্ছি, তাই বলতে এলাম।

—গাড়ী পাবি তো?—সব্যসাচীর প্রশ্ন।

—দেখি।—বলে নীচে নামলাম আমি।

অনুষ্ঠান চলছে। কে একজন গান গাইছেন—নদীর নাম সই অঞ্জনা, নাচে তীরে খঞ্জনা, পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি!

দাঁড়ালাম একবার। আব্বাসউদ্দিনের গাওয়া বিখ্যাত গান এটি।

একটু পরেই চমক ভাঙলো। না, আর দাঁড়ালে বাস পাওয়া যাবে না।

কবি নজরুলকে আর একবার মনে মনে প্রণাম জানিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলাম আলোক-উজ্জ্বল তোরণ দুটি পেরিয়ে।

১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭। রাত ২টা।